ISBN 81-7215-191-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত ।

কৃষ্ণা ও সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়কে

রাকা

রাকা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে, সে খুব সুন্দর। যে-কোনো কথাই বার বার, হাজার-দু'হাজার বার শুনলে একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। কিন্তু, তুমি কী সুন্দর, এই বাক্যটি কখনো মলিন হয় না। এই কথা শুনলে স্নায়ুতে খানিকটা পুলক সঞ্চার হয় না, এমন মানুষ দুর্লভ। অন্যের চোখে সুন্দর হওয়া, বিশেষ হওয়ার একটা গুপ্ত প্রয়াস মানুষের সারাজীবনই থেকে যায়। রাকা যখন বেশ ছোট, পাঁচ-ছ' বছর বয়েস, তখন তাদের বাড়িতে বাইরের যে-কোনো লোক এসে রাকার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতো, তারপর তার মাখনের মতন গাল টিপে কিংবা নরম রেশমের মতন চুলে হাত বুলিয়ে বলতো, বাঃ কী সুন্দর মেয়েটি। ঠিক পুতুলের মতন। একদিন তা নিয়ে একটা কাণ্ড হয়েছিল।

সে দিনটির কথা রাকার বেশ মনে আছে। সারাদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল, আকাশ নবঘনশ্যাম বর্ণ, বাতাস মৃদু, বর্ষণ শুরু হয়নি। রাকাদের বাড়ির সামনে ও ডান পাশে বাগান, সেখানে একটি দোলনা, একটি খড়ের ছাউনি দেওয়া দেওয়ালহীন ছোট্ট ঘর, সদ্য খড় বদল করা হয়েছে বলে সেটিকে সোনালি দেখায়, তার মাঝখানে একটি সিমেন্টের টেবিল ও গোল করে বাঁধানো বসবার জায়গা। শীতকালে ঐ ঘরটিতে ভালো আড্ডা হয়, কিন্তু বৈশাখে রোদের ঝাঁঝে শেষ বিকেলের আগে সেখানে ঢোকাই যায় না। কিন্তু সেই শুক্রবারটি ছিল মনোরম ছায়া ছায়া দিন, গেটের পাশে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটিতে রঙের হিল্লোল, চাঁপা গাছটায় ফুল এসেছে, দূর থেকেও ঘ্রাণের ঝাপটা লাগে।

রাকার বাবা সোমনাথ সেদিন ঐ বাগান-ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন বিকেলবেলা। সম্ভবত ছুটির দিন, তাই সোমনাথ সে সময়ে বাড়িতে কিংবা হয়তো ছুটি নিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুর জন্য, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বার বার তাকাচ্ছিলেন রাস্তার দিকে। চারটে পঁচিশের ট্রেনে সোমনাথের বন্ধু চন্দ্রমৌলির আসবার কথা।

সেই দিনটি রাকার মনে আছে আরও একটি কারণে। ট্রেন লেট ছিল,

ধীরেন আর তৃণীর একটা গাড়ি জোগাড় করে চন্দ্রমৌলিকে আনতে গেছে স্টেশান থেকে, তারা আসছে না, আসছেই না, রাস্তা দিয়ে অন্য কোনো গাড়ি, এমন কী সাইকেল রিক্সা গেলেও কয়েক জোড়া অধীর আগ্রহী চোখ বাগান-ঘর থেকে দেখছে সেদিকে। এক সময় আকাশ শব্দ করে উঠলো।

সারা দিন ধরে যে জমাট গাম্ভীর্য ছিল, তাতে যুক্ত হলো স্বর, একটা বিদ্যুতের ফলা চিরে গেল দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। এর পর ঝড়টা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, দমকা হাওয়া দূতের মতন এসে যেন জানিয়ে গেল এ বছরের প্রথম বর্ষণের কথা।

ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যবর্তী কয়েক মিনিট আকাশ থেকে পড়তে লাগলো জল-পাথর। বাবা-মা আর দুই দিদির সঙ্গে বাগান-ঘরে বসে খুব সুস্বাদু পুডিং একটু একটু করে খাচ্ছিল রাকা, দিদিদের সঙ্গে সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। বড় বড় ঢিলের মতন মাথায় পড়ছে শিল, ঘাসের ওপর থেকে তুলে নিচ্ছে রাকা, তার কচি, নরম হাতের তালুতে গলছে, পুরো গলে যাবার আগেই সে টপ করে মুখে পুরে দিচ্ছে।

এ কী বিস্ময়, এ কী আনন্দ!

সোমনাথ ঘর থেকে বলছেন, এই খুকি, খুকি, মুখে দিস না, নোংরা, প্রথম বৃষ্টিতে ধুলো থাকে।

রাকার মা সেবন্তী শুধু অচঞ্চল, স্থির, আকাশের এই পরিবর্তনেও তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি ঝড় কিংবা শিলাবৃষ্টি দেখছেন না, তাঁর মেয়েরা যে মাটি থেকে বরফ কুড়িয়ে মুখে দিচ্ছে তাও দেখছেন না, তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেস বুনছেন, তাঁর চোখ শুধু নিজের দু-আঙুলের দিকে, এক এক সময় তিনি এরকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যান।

রাকার দুই দিদি, দেবিকা ও সুরেখা শাড়ি কিংবা সালোয়ার কামিজের বয়েসে সদ্য পৌঁছে গেছে, ওদের চুলে খোঁপা হয়, যদিও বাঁধে না। ওরা চোখের ইঙ্গিতে নীরব কথা বলতে শিখেছে, মানুষের জন্ম রহস্য কিছুটা উন্মোচিত হয়েছে ওদের কাছে, কিন্তু মৃত্যুর কথা জানে না, ওরা কোমরে রুমাল গোঁজে, ওরা মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে। দেবিকা ও সুরেখা আগে বেশ কয়েকবার শিল পড়া দেখেছে, তবু ওরা এই সময় হঠাৎ কিশোরী থেকে বালিকা হয়, কে কটা কুড়োচ্ছে জোরে জোরে সেই কথা বলে।

রাকার জীবনে সেই প্রথম শিলা বর্ষণের অভিজ্ঞতা। পাঁচ বছর সাত মাস বয়েস। সে তখন একটা হালকা আর ছোট্ট মানুষ, তার দৌড়োবার ছন্দ ঠিক

ঐ বয়েসেরই ছন্দ, পরে সব মানুষই এই ছন্দটা ভুলে যায়। একটা তুঁতে রঙের ফ্রক পরা, তার তলায় সাদা জাঙ্গিয়া, তার ইলাস্টিক কিছুটা আঁট, মাথায় রুপোলি রিবন বাঁধা। প্রি-র‍্যাফেলাইট যুগের শিল্পীরা মূল দেব-দেবীর পাশে যেসব উড়ন্ত বালিকা পরী আঁকতেন, রাকাকে সেইরকম দেখায়।

গায়ে-মাথায় শিল পড়লে একটু একটু লাগে, তবু আমোদ হয়, আকাশ থেকে এরকম টুকরো বরফ পড়ার বিস্ময় রাকার ছোট্ট হৃদয়টাকে ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু ওদের কুকুরটা ভয় পায়, সারা বাগানে ছুটতে ছুটতে সে প্রতিবাদের সুরে গজরায়, একটু পরেই বারান্দার নীচে চলে গিয়ে পা আঁচড়ায় শুকনো ভূমিতে।

তারপর বৃষ্টি নামলো বেশ ঝমঝমিয়ে। দেবিকা ও সুরেখা দু'জনে রাকার দু'হাত ধরে উড়িয়ে নিয়ে এলো বাগান-ঘরে। রাকা যেন জলের পোকা, ওকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেলে কিছুতেই উঠতে চায় না, বাথরুমে কলের নীচে প্রায় এক ঘণ্টা জল নিয়ে খেলা করে, বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালোবাসে। এর মধ্যেই সে অনেকটা ভিজেছে।

সেবন্তী এখনো এক মনে কুরুশ বুনে যাচ্ছেন, দেবিকা ও সুরেখা অস্বস্তিতে তাঁর দিকে ঘন ঘন তাকায়। সেবন্তী ওদের বকুনি দিচ্ছেন না, গ্রাহ্য করছেন না, তাঁর ঠোঁটে স্মিত হাসি, তিনি এখানে নেই।

সোমনাথ বললেন, ওঃ, একবার ধানবাদে, এই এত বড় বড় শিলা...এই, খুকির মাথাটা মুছিয়ে দে।

রাকা ঝলমলে মুখে বললো, বাবা, আমি এগারোটা পেয়েছি।

সুরেখা বললো, আমি অনেক বেশি, এই দ্যাখ।

সুরেখা শিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রুমালে পুঁটুলি করেছে, তার থেকে দুটো তুলে নিয়ে দু'চোখের পাতায় চেপে ধরে বললো, আঃ!

রাকাও দিদির কাছ থেকে তিন চারটে তুলে নিল, সব ভালো জিনিসই সে মাকে আগে দেখায়, মায়ের মুখের কাছে মুঠো করা হাতটা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি নেবে?

সেবন্তী উত্তর দিলেন না, মুখ তুলে তাকালেনও না।

সোমনাথ রাকাকে কাছে টেনে নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, মামণি, আমায় দিবি না? দে, আমার মুখের মধ্যে একটা দে।

ঠাণ্ডায় শিরশির করছে রাকার আঙুল, বাবা যে-রকমভাবে কখনো তার মুখে

চকোলেটের টুকরো ভরে দেন, সে ঠিক সেইভাবে বাবার মুখে তুলে দিল বরফ। বালকের মতন সেই বরফ চুষতে চুষতে সোমনাথ বললেন, ওরা এখনো স্টেশান থেকে ফিরলো না?

সারাদিন ধরেই প্রতীক্ষা সেই অনাগত অতিথির জন্য। রাকা এই মৌলিকাকুকে কখনো দেখেনি, কিন্তু কত গল্প শুনেছে। মৌলিকাকু বাবার মতন নয়, ধীরু কাকার মতন নয়, দাদার মতন নয়, এই মৌলিকাকু থাকেন রূপকথা আর গল্পের বইয়ের জগতে। একদিন মা একটা ছবির বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতে শোনাতে বলেছিলেন, তোদের মৌলিকাকুকে নিয়ে এর চেয়ে অনেক ভালো গল্প লেখা যায়। একবার নাহারকাটিয়ার জঙ্গলে সন্ধেবেলা মৌলিকাকুকে পাঁচজন ডাকাত ঘিরে ধরেছিল। ঐসব জায়গায় ডাকাতদের কী রকম চেহারা হয় জানিস তো, দুর্গা ঠাকুরের পায়ের তলায় যে-রকম অসুর থাকে, ভাঁটার মতন চোখ, অ্যালসেশিয়ানের লেজের মতন গোঁফ। দু'জনের হাতে খাঁড়া আর তিনজনের হাতে বন্দুক, তবু কিচ্ছু করতে পারলো না, মৌলিকাকু সেই পাঁচজনের হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে এলেন থানায়, তাও চোদ্দ মাইল দূরে, হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে। বান্ধবগড়ে আর একবার একটা চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন খালি হাতে, দেখবি ডান দিকের গলার কাছে সেই বাঘের থাবার দাগ এখনো আছে...

আজ সেই মৌলিকাকু আসছেন, অথচ মা একবারও তাঁর সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

সোমনাথ মৃদু স্বরে সেবন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, টুনা, আর একটু চা খাবে?

সেবন্তী এবারও কোনো উত্তর দিলেন না।

সোমনাথ দেবিকাকে বললেন, আর এক পট চা করতে বল না, মা। এর মধ্যে যদি মৌলি এসে পড়ে—

যেদিন সেবন্তী কোনো কথা বলেন না, সেদিন বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। এক একদিন সেবন্তীর মনটা কোথায় হারিয়ে যায়। তিনি তখন আর কারুর স্ত্রী কিংবা কারুর মা থাকেন না। একটা হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে আছেন সেবন্তী, হাতে একগাদা সোনার চুড়ি, কোনো আঙুলে আংটি নেই, তাঁর ধারালো মুখখানিতে কখনো কৌতুক, কখনো বেদনা খেলা করছে।

বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ সোমনাথ দৌড়ে বাগান পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। ফিরে এলেন ছাতা মাথায় দিয়ে। সিমেন্টের টেবিলে একটা জলের জাগ রাখা ছিল, গেলাসে খানিকটা জল নিয়ে তিনি সেবন্তীকে বললেন, তোমার

এ-বেলার ওষুধ খাওয়া হয়নি। খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।

সেবন্তী যেন শুনতেই পেলেন না।

সেই বয়েসে একমাত্র রাকাই তার মায়ের গাম্ভীর্যকে ভয় পেত না। তার অভিমান হতো। মা কেন তার সঙ্গে কথা বলবে না। সে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, তার ছোট্ট হাত-ভরা মনের জোর নিয়ে সে মায়ের লেস-বোনা থামিয়ে দিল। তারপর বললো, মা, তোমার কী হয়েছে?

সেবন্তী এবার মুখ তুললেন। মেয়েকে এক বাহুতে জড়িয়ে বললেন, আমার সোনা...।

দেবিকা ও সুরেখা তাদের কোমল বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সোমনাথ রাকাকে বললেন, মামণি, মাকে ওষুধটা খাইয়ে দাও।

ঠিক তখনই গেটের সামনে থামলো গাড়ি।

সোমনাথ এতক্ষণ বন্ধুর জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকলেও সেদিকে তাকালেন না। মুখ নিচু করে ফিসফিসিয়ে আন্তরিক অনুনয়ের সুরে স্ত্রীকে বললেন, মৌলি এসে গেছে, ওর সঙ্গে দু'একটা অন্তত কথা বলো, প্লিজ, ও যেন না ভাবে...

গাড়ি থেকে নামলেন চন্দ্রমৌলি। সত্যিই এক অসাধারণ পুরুষ, হাজার মানুষের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন চেহারা, দীর্ঘকায়, বলশালী, মাথা ভর্তি কাঁচাপাকা চুল, অনেকখানি জুলপি, ঈগল নাশা, উজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয় ভরা চোখ, তাঁর বয়েস বোঝা যায় না। একটি জলপাই রঙের শার্ট পরে আছেন, তার চারটে পকেট, দু' কাঁধে ফ্ল্যাপ, শার্টটা নস্যি রঙের কর্ডের প্যান্টে গোঁজা, পায়ের জুতো প্যান্টের ওপর দিয়ে খানিকটা উঠে এসেছে, আধা গাম বুটের মতন।

ধীরেন গাড়ি থেকে নেমে ছাতা মেলতে গেল, কিন্তু চন্দ্রমৌলি সেটা নিলেন না, বৃষ্টির মধ্যেই দ্রুত পা ফেলে আসতে আসতে বললেন, সমু, এসে গেছি। ওঃ, তোমাদের এদিককার ট্রেনগুলো কী বিশ্রী লেট করে, আমার ধৈর্য থাকছিল না—

বাগান-ঘরের মধ্যে এসে তিনি ধুপ করে দু' বার জুতোর ময়লা ঝাড়লেন, সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি প্রথম সেবন্তীকেই জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো তোমরা সবাই!

সারা দুপুর-বিকেলের মধ্যে সেবন্তী এই প্রথম একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন। মুখ তুলে শান্ত গলায় বললেন, এবার আপনি অনেক দিন পর এলেন।

চন্দ্রমৌলি বললেন, হ্যাঁ, আসাই হয় না, প্রায় ছ' বছর, নাকি আর একটু বেশি।

স্পষ্টতই এবার স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন সোমনাথ। তাঁর মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি ছোট মেয়ের দিকে একবার কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি দিয়েই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, বসো, বসো, মৌলি, নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, ওরে দ্যাখ না, নিমকিগুলো ভাজা হয়েছে কিনা, চা নিয়ে আয়।

চন্দ্রমৌলি বসলেন না। সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে টেনে পকেট থেকে বার করলেন একটা সিগারেটের প্যাকেট, এক হাতেই ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তার থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলেন ঠোঁট দিয়ে, আর এক হাতে একটা পাতা-দেশলাই, যার কাঠি ছিঁড়ে নিতে হয়, সেটা জ্বালার সময় চটাস করে শব্দ হয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, বাগানের এই ঘরটা আগে ছিল না। চাঁপা গাছটা অনেক বড় হয়েছে।

ধীরেন ও তূণীর ছাড়া গাড়ি থেকে নেমেছে আর একটি কিশোর, দেবিকা-সুরেখাদের প্রায় সমান, কিংবা একটু ছোট, খাঁকি রঙের প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা, সে দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে।

সোমনাথ তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কে? ও-ও-ও-, তোমার ছেলে?

চন্দ্রমৌলি বললেন, হ্যাঁ, আমার ছেলে সুকান্ত। ওকে নিয়ে এলাম এবার। ওদিকে পড়াশুনো কিছু হচ্ছিল না। এখানে ভর্তি করে দেবো। কলকাতায় না, কলকাতায় আমি পড়াতে চাই না, বুদ্ধি পাকবার আগেই পলিটিক্স শিখবে তাহলে। ওকে ভর্তি করে দিচ্ছি ইটাচুনা হাইস্কুলে। ওখানেই কলেজ আছে, ভালো কলেজ, আমাদের সময় বলা হতো, ইটাচুনা কলেজ হচ্ছে এদিককার প্রেসিডেন্সি, আমাদের হীরেন এখন ওখানকার প্রিন্সিপাল।

দেবিকা ও সুরেখার চিবুক ছুঁয়ে আদর করে চন্দ্রমৌলি বললেন, তোরা তো অনেক দেখেছিস সুকান্তকে, অনেক ছোট ছিল, তোরাও অবশ্য তখন এক ফোঁটা ফোঁটা।

দেবিকা বললো, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।

সুকান্ত সবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। এই বয়েসের মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের লাজুকতা যেন বেশি, তারা আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, বাবা-কাকাদের সম্পূর্ণ বশ্যতা মেনে চলতেও রাজি নয়।

দেবিকা আর সুরেখা প্রণাম করবার জন্য ঝুঁকতেই চন্দ্রমৌলি তাদের হাত

ধরে ফেলে বললেন, আরে না, না, জুতোয় পা ঢাকা, ওসব দরকার নেই। কই, চা কোথায় ? খাসা বৃষ্টিটা নেমেছে।

ছোট্ট মানুষ রাকাকে লক্ষ্যই করেননি চন্দ্রমৌলি। রাকা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকেই শুধু দেখছে। বাবা-মায়ের কাছ থেকে যেমন গল্প শুনেছে, তার থেকেও যে রহস্যময় এই মানুষটি। সে এ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছে, তার চেয়ে অনেক বড় মাপের, এঁর হাবভাবও অন্যরকম। দৈত্য কিংবা দেবতা ? দৈত্য কী করে হবে, দৈত্যের মতন চেহারার ডাকাতদের সঙ্গে ইনি লড়েছেন, মনে হয় যেন দেবতাদেরই দিকের।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে চন্দ্রমৌলি এক সময় সেবন্তীর গা-ঘেঁষা রাকাকে দেখতে পেয়ে বললেন, এই চাঁদের টুকরোটা কোথা থেকে এলো ?

সোমনাথ বললেন, আমার ছোট মেয়ে, ও, তুমি তো ওকে জন্মাতেই দেখোনি, তুমি সেবার যে চলে গেলে...

কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলেন চন্দ্রমৌলি। সাত বছর আগেকার কথা বোধহয় চকিতে মনে পড়লো।

তারপরই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, তাই ! এ বাড়িতে নতুন একজন। ইয়ংগেস্ট মেম্বার অফ দা ক্ল্যান।

দু' হাতে তিনি শূন্যে তুলে নিলেন রাকাকে। নিজের মুখের সামনে ধরে বললেন, বাঃ, কী ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। ঠিক যেন একটা পুতুল।

অমনি রাকা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো।

চন্দ্রমৌলি একটু চমকে গিয়েও হা-হা করে হেসে উঠলেন। রাকাকে আরও শূন্যে তুলে আবার লুফে নিয়ে বললেন, এ কী, এমন পুতুলের মতন সুন্দর মেয়ে কাঁদে কেন ? কাঁদতে নেই, কাঁদতে নেই, কাঁদতে নেই। আমাকে চিনিস না তুই, আমি যে তোর একটা কাকা হই, জঙ্গলে থাকি, আমি একটা জংলি কাকা।

রাকার কান্না আরও সপ্তগ্রামে চড়ে গেল।

আর সামলাতে না পেরে চন্দ্রমৌলি রাকাকে নামিয়ে দিলেন মাটিতে। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, এ বাড়িতে একটা ছিঁচকাদুনে মেয়ে এলো কী করে ? আমি আদর করতে গেছি, অমনি ভয় পেয়ে গেল ? দেবিকা, তুই যখন ছোট ছিলি, তোকে আমি এরকম লোফালুফি করিনি ?

দেবিকা বললো, রাকা ভয় পায়নি। ওকে কেউ পুতুল বললে রেগে যায়।

হাতের উল্টোপিঠে চোখ ঢাকা দিয়ে রাকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার

খুব অভিমান হয়েছে। যে-মানুষটিকে সে দেবতার মতন ভাবছিল, সেই মানুষটিও আর সব সাধারণ মানুষের মতন তাকে সুন্দর পুতুল বলবে কেন ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, ও তাই বুঝি ? আচ্ছা, আচ্ছা, অন্য কথা বলবো, আও বেটে, মেরে পাশ আও—

রাকা আর চন্দ্রমৌলির হাতে ধরা দিল না। সে ছুটে চলে গেল বাগানের মধ্যে। বৃষ্টির জলে কান্না ধুয়ে দিল।

এই দিনটার কথা পরে অনেকবার মনে পড়েছে রাকার। ঐ রকম ছোট্ট বয়েসে বাবা কিংবা বাবার মতন মানুষদের মনে হতো অনেক বড়, অনেক বয়েস। পরে সে হিসেব করে দেখেছে, ঐ সময়টায় সোমনাথ আর চন্দ্রমৌলির বয়েস ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। রাকার নিজের তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়েস হবার পর বুঝেছিল, চল্লিশ বছর বয়েসটা তো কিছুই না, পুরুষরা তখন পূর্ণ যুবক, তার মা ছিলেন আটত্রিশ বছরের যুবতী।

আগেকার দিনের মা-মাসিরা বাচ্চা বয়েসে পুতুলের সংসার সাজাতো। রাকার অনেক পুতুল ছিল, কিন্তু মা-মাসিদের মতন পুতুল খেলেনি। পুতুলের বিয়ে, পুতুলের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, এসব তার মনেও আসতো না। দুটো মেম পুতুলকে সে মাঝে মাঝে কাপড়-টাপড় পরিয়ে সাজাতো, কিন্তু রাকা নিজে কখনো পুতুল হতে চায়নি।

আর একবার একজন এস.ডি.ও. সাহেব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে যেই রাকার গাল টিপে বলেছে, কী সুন্দর। পুতুলের মতন...অমনি রাকা ঘ্যাঁচ করে তার হাতে কামড়ে দিয়েছিল।

দশ বছর বয়েসে, রাকার সামনে যখন অনেকগুলো পর্দা দুলছে, মাঝে মাঝে সেই পর্দাগুলো সরে গিয়ে আড়ালের অনেক রোমাঞ্চকর ব্যাপারের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তখন রাকার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, সুন্দর মানে কী ?

কাকে জিজ্ঞেস করবে, ভেবে পায় না। দুই দিদি, দেবিকা আর সুরেখার সঙ্গে রাকার তেমন অন্তরঙ্গতা হয়নি কখনো, বয়েসের অনেকটা তফাতের জন্য ওরা তাকে সব সময় ছোট ছোট মনে করতো। ওরা তখন দ্রুত বড়দের জগতে চলে যাচ্ছে। সুরেখার বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে প্রায়, সুরেখা তার আপন দিদি নয়। মাসতুতো দিদি, সেই মাসি অনেকদিন নেই। সোমনাথ তাই সুরেখার বিয়ের বন্দোবস্ত আগে করতে চেয়েছিলেন। অন্য লোকেরা কী বলবে, এটাই ছিল সোমনাথের সব সময়ের প্রধান চিন্তা। মাতৃহীনা সুরেখার বিয়ের আগেই দেবিকার বিয়ের তোড়জোড় করলে অন্য লোকেরা নিশ্চয়ই বলতো যে সোমনাথ

পক্ষপাতিত্ব করছেন।

দেবিকা-সুরেখা বড়দের জগতে ঢুকে পড়ে এখন আর রাকার দিকে মনোযোগই দেয় না। রাকাকে তারা বড় বেশি বাচ্চা মনে করে। রাকার দাদা তূণীর দেবিকার চেয়ে দু' বছরের ছোট, সে ও পেয়ে গেছে বাইরের জগৎ, ফুটবল খেলা নিয়ে একেবারে পাগল! কিন্তু অল্প বয়েস থেকেই তূণীরকে চশমা নিতে হয়েছে, একবার জেলা চাম্পিয়ানশিপে খেলতে গিয়ে বিপক্ষের গোলকিপারের শট লাগে তার মুখে, চশমার কাচ ভেঙে একটা টুকরো গেঁথে গিয়েছিল তার বাঁ ভুরুতে, সেই দাগ থেকে যায় সারা জীবন, চোখটা বেঁচে গিয়েছিল একটুর জন্য। খেলার প্রতিভা থাকলেও তূণীর ফুটবল খেলোয়াড় হবার অযোগ্য, পরবর্তীকালে সে শুধু দেশ-বিদেশের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের জীবনী মুখস্ত করেছে, বিশ্বকাপের যে-কোনো বছরের স্কোর সে বলে দিতে পারে চোখ বুজে।

মা-ই ছিল তখন রাকার একমাত্র বন্ধু। স্কুলের জনাতিনেক সহপাঠিনীর বাড়ি ছাড়া রাকা বাইরের জগৎ বিশেষ কিছু দেখেনি। রাকার মনে হতো, তার মা অন্য কোনো মায়েদের মতন নয়। তাপসী কিংবা শুক্লা কিংবা বীথিদের বাড়িতে গিয়ে রাকা দেখেছে, সেই সব বাড়ির কোথায় কী জিনিস আছে, সব ওদের মায়েদের নখদর্পণে। অন্দরমহলটাকে যদি একটা রাজত্ব মনে করা যায়, তা হলে সেখানে রাজার ভূমিকা গৌণ, রানীই সর্বময় কর্ত্রী। কিন্তু সেবন্তী নিজের সংসারের এক একটা জিনিস দেখে হঠাৎ হঠাৎ অবাক হয়ে যান, অন্যদের জিজ্ঞেস করেন, এটা এলো কোত্থেকে রে? দেবিকার জন্মদিনে একজোড়া পান্নার দুল দিয়েছিলেন দিদিমা, ছ' সাত মাসের পুরোনো হয়ে যাবার পর এক বিকেলে সেবন্তী তাঁর মেয়ের দু' কানে সবুজ বিন্দু দুটির দিকে তাকিয়ে গভীর বিস্ময়ে বলেছিলেন, ওমা, স্কুল থেকে অন্য কার দুল পরে এসেছিস?

একটা দিনের কথা রাকা কোনোদিন ভুলবে না। সেবার বর্ধমান শহরে রথের মেলায় রাকা গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে। বাগানের জন্য অনেক গাছের চারা কেনা হলো, একটা কাঠের টিপয় আর দুটো পোরসিলিনের ফুলদানি, রাকার জন্য ভেঁপু আর পাঁপড়ভাজা। মেলার শেষদিকে কয়েকটা পুরোনো জিনিসপত্রের দোকান। সেখানে একটা দেওয়াল ঘড়ি খুব পছন্দ হয়েছিল সেবন্তীর। একটা বেশ বড় ঘড়ি, মাঝখানটা মনে হয় যেন শ্বেতপাথরের, সত্যিকারের পাথর নয় অবশ্য, অন্য কিছু, কিন্তু ঘণ্টার ঘরগুলিতে রঙিন পুঁথি বসানো। বেশ জমকালো ব্যাপার, মনে হয় যেন হীরে-জহরতের তৈরি।

ঘড়িটার চারপাশের কাঠেও অনেক কারুকার্য। হয়তো রাজা-মহারাজাদের ঘড়ি, কিংবা আগেকার কোনো সাহেববাড়ির ' পুরোনো হলেও ঘড়িটা চালু, প্রতি সেকেন্ডের ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক শব্দ শোনা যায়। বাড়িতে ঘড়ির অভাব নেই, তবু সেবন্তী ওটা কিনতে চাইলেন। দাম লেখা আছে দেড় হাজার টাকা। অত টাকা সোমনাথের সঙ্গে নেই, তাছাড়া এরকম অপব্যয় করতে সোমনাথ রাজিও নন। অতি চালু দোকানদারটি সেবন্তীর দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাঁর হাতে জোর করে ঘড়িটা তুলে দিয়ে বলল, নিন না, এরকম আর পাবেন না, আচ্ছা চোদ্দোশো দিন, তেরশো, বারোশো, এর কম আর হবে না, কেনা দাম...।

সেবন্তী সোমনাথের দিকে তাকালেন, সোমনাথ মাথা নেড়ে বললেন, রেখে দাও, দরকার নেই।

তারপর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে সেবন্তী দু' তিনবার বললেন, ঘড়িটা বড় সুন্দর ছিল, ওরকম আমি আগে কখনো দেখিনি।

সোমনাথ বললেন, ওসব ঘড়ি একবার খারাপ হয়ে গেলে আর সারানো যাবে না। ভেতরের পার্টস আর পাওয়াই যাবে না এদেশে!

মেলা থেকে ফেরার সময় সাইকেল রিকশায় উঠতে গিয়ে সেবন্তী আবার মন-খারাপ গলায় বলেছিলেন, ঘড়িটা আমার এত পছন্দ, তুমি আমায় কিনে দেবে না?

সোমনাথ পারতপক্ষে স্ত্রীর কোনো বাসনায় বাদ সাধেন না। মাত্র কয়েক মুহূর্ত তাঁর চোখের পলক স্থির হয়ে রইলো, তারপর খানিকটা অসহায়ভাবে বললেন, সঙ্গে যে অত টাকা নিয়ে আসিনি!

সেবন্তী বললেন, ওরা বাড়ি থেকে টাকা নিতে পারে না? আমারও কিছু জমানো....ঘড়িটা পেয়ে সেবন্তীর খুশির উচ্ছ্বাস দেখে সোমনাথের মনে হচ্ছিল এর তুলনায় বারোশো টাকা তুচ্ছ। ঘড়িটা যেন জড়পদার্থ নয়, জীবন্ত প্রাণী। প্রতি ঘণ্টার টুং টুং ধ্বনি শোনার জন্য সেবন্তী অন্য জায়গা থেকে ছুটে আসেন। রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলেন, খুকি, বারোটা বাজতে আর ক' মিনিট বাকি? আমি একবারও বারোটা শুনিনি।

ঘড়িটা টাঙানো হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষের ডানদিকের দেওয়ালে, বেশ উঁচুতে। পুরোনো আমলের বাড়ি, শিলিং খুব উঁচু উঁচু। ঘড়িটার জন্য ঘরখানার চেহারা খুলে গেছে। দোকানদার বলে দেয়নি, এখানে আবিষ্কৃত হলো, যে অন্ধকারেও ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা দুটি জ্বলজ্বল করে। বাড়িতে নতুন যারাই আসে, তাদের কাছে ঘড়িটা প্রথম ও প্রধান দ্রষ্টব্য। রথের মেলায় কী

করে এমন একটা দুর্লভ জিনিস পাওয়া গেল, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করে অনেকে।

এ বাড়িতে ঘড়িটার বয়েস যখন মাত্র পাঁচদিন, অভিনবত্বের সবটুকু চাকচিক্য অম্লান, মাকে চিঠি লিখতে বসে সেবন্তী আধপাতা জুড়ে লিখলেন শুধু ঘড়িটারই কথা, সেই বিকেলে সোমনাথ আদালত থেকে ফিরে ওই ঘরে বসেই চা খাচ্ছেন। বিকেলের চা-পান এ বাড়িতে একটা বিশেষ পর্ব। ছেলেমেয়েরা সবাই একসঙ্গে বসে, সোমনাথ চায়ের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে, কলকাতা থেকে প্রতি মাসে দামি চা আনান, নিজের হাতে বানাচ্ছেন সেই চা। রাকা চায়ের অধিকারিণী হয়নি, তার জন্য কোকো মেশানো দুধ। জলতরঙ্গের মতন ঝঙ্কার তুলে ঘড়িটাতে ছ'টা বাজলো, সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেবন্তী বললেন, কোন্ ইংরিজি সিনেমায় এ রকম একটা ঘড়ি দেখেছি বলো তো ? কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এ কী, ঘড়িটা বেঁকে গেল কী করে ?

অন্য কেউ লক্ষ করেনি, এবার সবাই তাকিয়ে দেখলো, ঘড়িটা সত্যিই সামান্য বেঁকে আছে, দু' তিন চুল পরিমাণ হবে হয়তো।

সোমনাথ উঠে দাঁড়ালেন, দেবিকা বলল, আমি ঠিক করে দিচ্ছি, সুরেখা বলল, আমি, আমি !

সোমনাথেরও হাত যাবে না, চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াতে হবে, একটা ভারী চেয়ার টেনে নিয়ে সুরেখাই আগে উঠে পড়ল। তারপর বলল, দোকানের লোকটা যখন টাঙিয়ে দিয়ে গেল, তখনই আমার মনে হয়েছিল, লোকটা ট্যারা।

ঘড়িটার নীচের দিকে সুরেখার দু' হাত। সোমনাথ বললেন, একটু বাঁদিকে, না, না বেশি হয়ে গেল, আবার ডানদিকে, আর একটু, ওখানে একটা পেন্সিলের দাগ দিয়ে দিতে হবে...

কী করে যে ঘড়িটা পড়ে গেল, তা বোঝাই গেল না। দেওয়ালের পেরেকটা শক্ত ছিল, ঘড়ির পেছনের আংটাও মজবুত, তবু ঘড়িটা যেন নিজের ইচ্ছেতেই সামনে ঝুঁকে এলো হঠাৎ, সুরেখা দু' হাত দিয়ে ধরেও ভারসাম্য রাখতে পারল না, সেটা খুব হাল্কা নয়, সশব্দে পড়ে গেল মেঝেতে। এমনই শৌখিন জিনিস যে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকরো হয়ে গেল, ফেটে গেল পাথরোপম ডায়াল, ছিটকে গেল রঙিন পুঁতিগুলো, পেছনের স্প্রিং, ছোট ছোট কলকব্জা ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে।

সেবন্তী ছাড়া আর সবাই গভীর শ্বাস টানার শব্দ করে উঠল। সুরেখা মুখ

ফিরিয়ে নিঃসাড় হয়ে গেছে, যেন একটা সিরিঞ্জ দিয়ে এইমাত্র টেনে নেওয়া হয়েছে তার মুখের সব রক্ত, দু' চোখের মণি স্থির, যেন সে একটা প্রেত দেখেছে, আয়নায় ।

কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত, তারপর সেবন্তীই প্রথম, অন্যদের আরও বিহ্বল করে দিয়ে, হেসে উঠলেন । হাল্কা ফুরফুরে গলায় বললেন, যাক, গেছে ভালোই হয়েছে । তুই নেমে আয়, মণি । আমি ওটাকে নিয়ে বেশি বেশি আদিখ্যেতা করছিলাম । আসলে ওটা এখানে একদম মানাচ্ছিল না, এ রকম বাড়িতে মানায় না । জিনিসটাও ঝুটো—

সেই বাচ্চা বয়েসেই রাকার মনে হয়েছিল, পৃথিবীর আর কোনো মা কি এই রকম সময়ে ঠিক এই কথাগুলো বলতে পারবেন ?

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুলঝাড়ু এনে সেবন্তী ভাঙা টুকরোগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিতে লাগলেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে । এ ঘড়ি আবার সারানো যায় কিনা, সে চিন্তাও তাঁর মাথায় এলো না ।

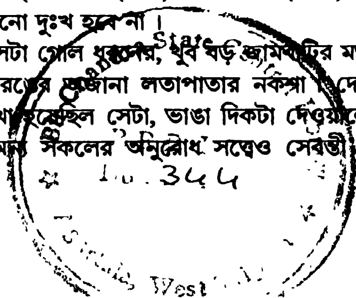
ঐর পরেও আর কোনোদিন, একবারের জন্যও সেবন্তীকে ঐ ঘড়ির জন্য বিন্দুমাত্র আফসোস করতে শোনা যায়নি । অপরাধবোধ থেকে সুরেখা কয়েকবার বলতে গেলেও সেবন্তী সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা বলেছেন ।

পরের বছর রথের মেলা থেকে সেবন্তী কিনলেন একটা পুরোনো ফ্লাওয়ার ভাস । খুব সম্ভবত বর্ধমান রাজবাড়ির পরিত্যক্ত । জিনিসটা পোরসিলিনের, অবশ্যই খুব সুদৃশ্য, চীনের মিং ডাইনেস্টির শিল্পকর্মের বিলিতি অনুকরণ, কিন্তু একটা পাশ ভাঙা । ভাঙা বলেই দাম অনেক শস্তা, মাত্র একশো পঁচিশ টাকা, কিন্তু একেবারে অব্যবহার্য নয়, ভাঙা পাশটা দেওয়ালের দিকে রেখে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলে কিছু বোঝবার উপায় নেই ।

সেবন্তীর পছন্দ দেখে সোমনাথ আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, এটা নিয়ে কী করবে ? দেখাই যাচ্ছে ভাঙা, এটা কি কেউ কেনে ?

সেবন্তী মৃদু হেসে বলেছিলেন, ভাঙা বলেই তো, এটা যদি কখনো পুরো ভেঙে যায়, কোনো দুঃখ হবে না ।

ফ্লাওয়ার ভাসটা গোল ধরনের, খুব বড় জামবাটির মতন, হাল্কা নীলাভ, তার ওপর রুপোলি রঙের অজানা লতাপাতার নকশা । দোতলার বারান্দায় একটি টুলের ওপর রাখা হয়েছিল সেটা, ভাঙা দিকটা দেওয়ালের দিকে নয়, সামনের দিকে, বাড়ির অন্য সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও সেবন্তী কিছুতেই সেটা ঘুরিয়ে



দেননি । বাইরের লোকদের কাছে সেবন্তী ভাঙা দিকটা গোপন করার কথা যেন কল্পনাই করতে পারেন না ।

বছরের পর বছর ফ্লাওয়ার ভাসটা সেখানেই রয়ে গেল, আর বিক্ষত হলো না । অনেক বছর পর রাকা হঠাৎ একদিন উপলব্ধি করেছিল মায়ের রুচিবোধ, ভাঙা দিকটার জন্যই ফ্লাওয়ার ভাসটার রূপ বেশি খুলে ছিল, সব সময় ঐ দিকে চোখ চলে যেত, ঐ জন্যই সেটার কথা মনে আছে ।

সেবন্তী কুরুশ বুনতেন প্রায়ই । সাদা টেবিল ক্লথের ওপর আগে পেন্সিল দিয়ে চারকোণে নানা রকম ছবি এঁকে নিতেন । বেশ আঁকার হাত তাঁর, বই দেখে ডিজাইন খুঁজতে হয় না । কিন্তু রঙিন সুতো দিয়ে সেলাইয়ে সেই ছবিগুলো ফুটিয়ে তুলতে তুলতে তাঁর ধৈর্য ফুরিয়ে যেত, সেটা অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে কিছুদিন পর আর একটা ধরতেন । সেবন্তীর এ রকম অসমাপ্ত শিল্পকীর্তি ছড়িয়ে থাকতো সারা বাড়িতে ।

দেবিকা, তৃণীর আর সুরেখা যেন একটু একটু ভয় পেত সেবন্তীকে । অথচ সেবন্তী কোনোদিন কারুকে একটুও বকুনি দেননি । ভয় আসলে দুর্বোধ্যতাকে । সেবন্তীর মাঝে মাঝে কথা-না-বলা, চুপ করে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা, এই সব দেখেই ওরা অস্বস্তিবোধ করতো । কিন্তু সেই সাড়ে দশ বছর বয়েসে রাকার কাছে পৃথিবী ও জীবনের অনেক কিছুই দুর্বোধ্য মনে হতো, সেই তুলনায় মা ছিল স্বাভাবিক । মায়ের গা-ঘেঁষে বসার উষ্ণতা ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় ।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় বড় উদ্বেল ছিল রাকার বাচ্চা শরীরের মধ্যে হৃদয়খানি । তার সহপাঠিনী, তার প্রাণের বন্ধু তাপসী একটা কঠিন কথা বলেছিল তাকে । সেই দিনটা ছিল মেঘলা, বাড়ি ফেরার পথে তার চোখ দুটিও যেন আকাশের মতন আসন্ন বৃষ্টি ভরা । দুই দিদি এতদিনে কলেজে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, রাকা স্কুল থেকে ফেরে মাসিক ভাড়া করা সাইকেল রিক্সায় একা, প্রায়ই তার ইচ্ছে করছিল, বই-খাতা ফেলে রেখে লাফিয়ে নেমে পড়ে সে কোথাও হারিয়ে যায় । ফেরার পথে একটা অনেক চওড়া মাঠ পড়ে, তার অন্য পাশে ঝাঁক ঝাঁক সোনাঝুরি গাছ, যেন একটা বন, সেই বন পেরিয়ে যায়নি কখনো রাকা, তার মনে হয়, ঐ বনের ওপারেই নিরুদ্দেশ ।

বাড়িতে ফিরেই রাকা মায়ের খোঁজ করেছিল ।

সেবন্তী যেমন সংসারী নন, তেমন খুব মা-মা-ও নন । এক একদিন তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য নিজের হাতে নানা রকম খাবার তৈরি করেন, নিজে

সামনে বসে খাওয়ান, কেউ একজন বেশি খেতে না চাইলে ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করেন, খুব খারাপ হয়েছে বুঝি রে, মুখে দেওয়া যায় না ? এ মা— । আবার কোনো কোনোদিন ছেলেমেয়েরা কী খেল বা খেল না, তা তিনি খেয়ালও করেন না ।

প্রতিদিন তা দেখার জন্য আছেন বুড়িমা । তিনি সত্যিই বুড়ি এবং শিশুকালেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল বুড়ি । তিনি সোমনাথের পিসিমা, কোন্ আদ্দিকালে তিনি বিধবা হয়েছিলেন, তা কারুর মনে নেই, কিন্তু এখনো তিনি বেশ শক্তসমর্থ, একতলা-দোতলার সিঁড়ি ভাঙায় ক্লান্তি নেই । এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর চোখের সামনে জন্মাচ্ছে, তাঁর কোলে-পিঠে চড়ে আদর খেয়ে বড় হচ্ছে, তারপর দূরে সরে যাচ্ছে । যেন ছায়াছবির সংসার ।

বাড়িতে এসেই রাকা বুড়িমাকে জিজ্ঞেস করল, মা কোথায় ?

বুড়িমা বললেন, দেখলাম তো বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে, তুই আগে হাত-মুখ ধুয়ে দুধ খেয়ে নে !

বুড়িমা'র কথায় অবাধ্য হলেও চলে । বুড়িমা'র ওপর নির্ভরতা সদ্য কেটে যাচ্ছে রাকার । গত বছর পর্যন্ত সে আট আনা, এক টাকা কখনো পেলে বুড়িমার কাছে জমা রাখত, এখন তার নিজস্ব একটা পিগি ব্যাঙ্ক হয়েছে ।

একতলায় জুতো খুলে, গোলাপি রঙের ফ্রকে ঘূর্ণি উড়িয়ে একটা হাল্কা পাখির মতন রাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতলায় । একদম কোণের ঘরটাই প্রধান ঘর । আর সিঁড়ির পাশের ঘরটায় দেবিকা ও সুরেখা ফিরে এসেছে, কলস্বরে কোনো একটা বিষয় নিয়ে পরস্পরকে প্রতিবাদ করছে ।

বারান্দার শেষ ঘরটায় ভেজানো দরজা আলতো করে ঠেললো রাকা ।

শুধু এই ঘরেই আছে একটিমাত্র তিনপুরুষের পুরোনো পালঙ্ক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটা মোটা পায়া, কারুকার্য করা বাজু একটু উঁচু শয্যাধার, আর একটু ছোট বয়েসে রাকা বাবা-মায়ের বিছানায় নিজে নিজে উঠতে পারতো না, একটা টুল টেনে আনতো ।

সেই খাটের একদিকে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন সেবন্তী । একটা নীল কল্কা পাড় বিস্কুট রঙের শাড়ি পরা, মাথার চুল খোলা । জানলা দিয়ে বিকেলের গাঢ় আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখের একপাশে, তাঁর পাতলা মুখ, তাঁর নাক, চোখ, ওষ্ঠ সবই যেন জলরঙের ছবির মতন, ঠিক বাস্তব ঘেঁষা নয়, স্টাইলাইজ্‌ড, ছবির নারীদের ছাড়া এমন সুদূর দৃষ্টি সহসা জীবন্ত দেখা যায় না । কোলের ওপর বইখানি অমনোযোগের সঙ্গে খোলা, তিনটি সন্তানের জন্ম

দিলেও সেবন্তীর কোমরে মেদের ভাঁজ নেই।

বই খাতার ব্যাগটা নামিয়ে রেখে রাকা বিছানায় উঠে গিয়ে কোনো কথা না বলে মায়ের ডান বাহুতে গলাটা ঠেকিয়ে বসল। অভিমানে তার গলায় বাষ্প জমে আছে।

সংসার ছেড়ে মাঝে মাঝে উদাসীনতার একটা মেঘ-রাজ্যে সময় কাটাতে ভালোবাসেন সেবন্তী। গল্পের বই হচ্ছে সেই মেঘ-রাজ্যের সোপান। দু' চার পাতা পড়বার পরই তিনি নিজের কল্পজগতে চলে যান। তখন নিত্যপ্রয়োজনের শব্দও তাঁর কানে আসে না। অন্য দিকে মেয়েদের কথাও মনে থাকে না, দেবিকা বা সুরেখা বা তৃণীর এসে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর পায় না, কিন্তু এই কনিষ্ঠা কন্যাটির নরম হাত কিংবা টলটলে দৃষ্টি তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে বাস্তবে টেনে আনে।

রাকার দিকে ফিরে তিনি যেন মেয়েকে নয়, নিজের বালিকা বয়েসটাকে দেখলেন। নির্নিমেষে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, ওষ্ঠে মাধুর্য মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, আজ কিছু দুষ্টুমি করেছিস বুঝি ?

রাকা শুধু বলল, মা—। তারপর থেমে গেল।

স্বরের সেই কাতরতা সেবন্তীকে স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিপূর্ণ সচকিত হয়ে, মেয়ের চিবুক ছুঁয়ে জানতে চাইলেন, কী হয়েছে, মামণি ? কী হয়েছে বল তো ?

রাকা বলল, মা, সুন্দর মানে কী ? কেন আমাকে ওরা সুন্দর বলে ?

যে চক্ষু দুটি সুদূর ছিল, তা চলে এল খুব কাছে, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল বাজপাখির মতন। অস্বাভাবিক কণ্ঠে, তারসপ্তকে সেবন্তী চিৎকার করে বললেন, কী ? কে বলেছে ? সুন্দর, সুন্দর ! কে আমার মেয়েকে,....কে তোকে জ্বালাতন করেছে বল তো ? কোন্ বদমাইস ? কোন্...

এরপর সেবন্তী যে শব্দটি বললেন, তা অত্যন্ত খারাপ কথা। দু' হাতে কান চাপা দেবার মতন। সেবন্তীর মুখ থেকে এ রকম শব্দ উচ্চারিত হবে, তা একেবারে অবিশ্বাস্য !

এ বাড়ির সহবৎ মৃদুস্বরে কথা বলা। কোনো রকম গালাগালি কিংবা শপথ বাক্য কেউ বলে না। সোমনাথকে একবার একটি ফেরিওয়ালা খুব ঠকিয়ে ছিল, তিনি তাকে জোচ্চোর বলতে গিয়েও সামলে নিয়ে বলেছিলেন, তুমি অতি অসৎ ! একটি বাচ্চা চাকর ছিল এক সময়, সে কথায় কথায় মা কালীর দিব্যি বলত বলে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সোমনাথদের পরিবার ব্রাহ্ম ঘেষা,

তাঁর এক কাকা দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেবন্তী পড়াশুনো করেছেন শান্তিনিকেতনে। এ বাড়ির ব্যবহার ও ভাষা-রুচি ঠিক করে দিয়েছেন সেবন্তী নিজেই, অথচ তাঁর মুখেই আজ এরকম অনুচিত শব্দ !

সেবন্তীর উচ্চ চিৎকারে সারা বাড়ি ঝনঝন করে উঠল। এবং একবার বলেই তিনি থামলেন না। বার বার বলতে লাগলেন, কে আমার মেয়েকে জ্বালাতন করেছে ? কোন্ বদমাসটা ? কোন্...

রাকা দারুণ ভয় পেয়ে দু' হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল, মা, মা—

ছুটে এলো দেবিকা আর সুরেখা। দুধের গেলাস নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন বুড়িমা।

যেমন আকস্মিকভাবে শুরু করেছিলেন, তেমনই হঠাৎ থেমে গিয়ে সেবন্তী বললেন, কী হলো ?

রাকা মায়ের আঁচলে চোখ মুছতে লাগল।

সেবন্তী বড় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো রে ? আমি হঠাৎ খুব চেঁচিয়ে উঠলাম ?

সবাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কেউ শব্দ করল না।

সেবন্তী আবার অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো, বল না ? আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম কেন ? মাথাটা গরম হয়ে গেল।

বুড়িমা এবার বললেন, বউমা, তুমি নেমে এসো, বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দাও।

দেবিকা-সুরেখা হতবাক হয়ে গেলেও ছটি দশক ধরে জীবন দেখা অভিজ্ঞতায় বুড়িমা যেন তেমন বিস্মিত হননি। এদের সকলের চেয়ে তিনি সেবন্তীকে ভালো চেনেন।

বাধ্য মেয়ের মতন সেবন্তী নেমে এলেন পালঙ্ক থেকে। শাড়ি ঠিকঠাক করে দু'পা এগিয়েও থমকে দাঁড়ালেন। সাঁতার যে জানে না, সে বুক জলে নামার পর তার চোখ যে-রকম হয়, সেই দৃষ্টিতে তিনি সকলের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, কেন এমন মাথা গরম হলো, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ?

একটু সরে গিয়ে, পালঙ্ক থেকে নামতে উদ্যত রাকাকে জড়িয়ে ধরে বুকভাঙা আর্তনাদে বলে উঠলেন, আমাকে পাগল হতে দিস না, আমাকে ধরে রাখিস, আমাকে তোরা চলে যেতে দিস না, না, না...

॥২॥

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। রাকা তার মায়ের এরকম রূপ আর একবার দেখেছিল, যখন সে আরও ছোট, যেবারে সুকান্তকে নিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রমৌলি। চন্দ্রমৌলি এর মধ্যে আরও দু' তিনবার এসেছেন, সুকান্তও কাছেই থাকে। কিন্তু রাকা সেবারে চন্দ্রমৌলিকে প্রথম দেখে, সেই দিনগুলির কথা তার খুবই মনে আছে।

এই ছিমছাম, গুছনো, অতি ভদ্র পরিবারে চন্দ্রমৌলি যেন এক ঝড়ো হাওয়া। তাঁর চেহারাখানি যেমন, চন্দ্রমৌলির সব কিছুই সাধারণ মানুষের মাপের চেয়ে অনেকখানি বড়। প্রথমদিন, সেই যে বৃষ্টির বিকেলে তিনি এলেন, সেদিন তিনি জেগেছিলেন রাত্রি আড়াইটে পর্যন্ত এবং বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। পরদিন তিনি সোমনাথের সমস্ত রকম নিষেধ উপেক্ষা করে বাজারে গেলেন এবং কিনে আনলেন একটি আট কেজি ওজনের কাতলা মাছ। সেটাকে নিজের হাতে ঝুলিয়ে সগর্বে ফিরেছিলেন বাড়িতে। অথচ চন্দ্রমৌলি ভোজনবিলাসী নন, দু টুকরোর বেশি মাছ কিছুতেই খেলেন না, অত বড় মাছের আধখানা মুড়ো তাঁর পাতে দেওয়ায় তিনি খাপরে বলে হাত গুটিয়ে নিলেন। ভোগে লাগুক বা না লাগুক, কোথাও কিছু কিনতে গেলে সবচেয়ে বড় জিনিসটি তাঁর কেনা চাই। মধ্যপ্রদেশে ভালো লিচু পাওয়া যায় না বলে সেবারেই তিনি আর একদিন কিনে এনেছিলেন এক বিরাট ঝুড়িভর্তি লিচু, তার অধিকাংশই বিলিয়ে দিতে হয়েছিল রিক্সাওয়ালাদের ডেকে ডেকে।

সোমনাথ ও চন্দ্রমৌলি একসঙ্গে পড়তেন হেয়ার স্কুলে, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে। দুই বন্ধুর চরিত্রে কোনো মিল নেই, সোমনাথ সাবধানী, ধরা-বাঁধা রাস্তার পথিক, আর চন্দ্রমৌলি সব কিছুতেই বেপরোয়া। ছাত্রজীবন শেষ করার পর সোমনাথ নিলেন জুডিশিয়াল সার্ভিস, কারণ তাঁর বাবাও ছিলেন মুন্সেফ, আর চন্দ্রমৌলি চলে গেলেন প্রবাসে। চাকরি করা তাঁর ধাতে সয়নি বেশিদিন।

চন্দ্রমৌলির যা জীবনীশক্তি তা পরিপূর্ণ কাজে লাগাবার জন্য তিনি হতে পারতেন ভাইকিংদের নেতা, অকূলে জাহাজ ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়তেন কোনো অচেনা রাজ্য লুণ্ঠনে ; কিংবা হতে পারতেন মরুভূমির লড়াইয়ে চেঙ্গিজ খান বা হলাকুর সমকক্ষ যোদ্ধা ; অথবা এমান্ডসন বা লিভিংস্টোনের মতন দুঃসাহসী পথিকৃৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ যুগে এই অতিনাটকীয় চরিত্রগুলি অন্তর্হিত

হয়ে গেছে। আদিম জীবনের প্রতি একটা ঝোঁক ছিল চন্দ্রমৌলির, তাই চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন অরণ্যে, সেখানেই আস্তানা গাড়লেন, বস্তার জেলায় জঙ্গল ইজারা নেওয়া হলো তাঁর জীবিকা। কথায় কথায় নিজেকে জংলি বলে পরিচয় দিতে তিনি বেশ শ্লাঘা বোধ করেন।

পশ্চিমবাংলায় চন্দ্রমৌলির তেমন আত্মীয়পরিজন কেউ নেই, তিনি পাকাপাকি বস্তারেই থাকেন, তবু একমাত্র বন্ধু সোমনাথের টানেই তিনি এদিকে আসেন মাঝে মাঝে।

যেদিন আকাশ থেকে বরফ-কুচি পড়েছিল, সেদিন রাকার জীবনে এই রূপকথার মানুষটিরও আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু প্রথম সংস্পর্শে কেঁদে ফেলেছিল রাকা। পুতুলের সঙ্গে তুলনা করলেই তার গা জ্বালা করতো যে। চন্দ্রমৌলি সেটা বুঝতে পেরে আস্তে আস্তে ভাব করে নিয়েছিলেন রাকার সঙ্গে।

সেবারে সুকান্তও এসেছিল, কিন্তু তার কথা ঠিক যেন মনে পড়ে না। সেই লাজুক কিশোরটি তো কম কথা বলত, তা ছাড়া তার বাবার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে সে হয়ে গিয়েছিল ম্লান ও অস্পষ্ট। এমনকী দেবিকা ও সুরেখাও ওদের সমবয়স্ক এই ছেলেটির দিকে মনোযোগ না দিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত চন্দ্রমৌলির দিকে। চন্দ্রমৌলি সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন।

সেবন্তী সেবারে আগাগোড়াই স্বাভাবিক ছিলেন।

বর্ধমানের জঙ্গলমহলটি তখনও অনেকটাই গভীর ছিল। একদিন গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যাওয়া হল সেখানে। একবার মাইথন বাঁধে যাবার কথাও হয়েছিল, কিন্তু সেবন্তীই যেতে চেয়েছিলেন জঙ্গলে। চন্দ্রমৌলির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে জঙ্গলেই বেশি মানাবে, তাই না?

স্টেশান ওয়াগানটা অনেকটা ভেতরে যাবার পর পায়ে হাঁটা পথ। প্রথম মাটিতে পা দিয়েই রাকা জিজ্ঞেস করেছিল, এই বনে বাঘ আছে?

সবাই হেসে উঠেছিল।

সেদিন যেন সাজের প্রতিযোগিতায় মেতেছিল দেবিকা ও সুরেখা। দুজনেই পরেছে শালোয়ার-কামিজ, মাথার চুল বেঁধেছে টাট্টু ঘোড়ার লেজের মতন। দু' চোখ টানা দিয়ে আঁকা। সেবন্তীর ড্রেসিংটেবল থেকে লিপস্টিক নিয়ে ছুঁইয়েছে ঠোঁটে। জঙ্গলে আসার জন্য এত সাজগোজ কেন? সঙ্গে যারা আছে তারা তো ক'দিন ধরে এক বাড়িতেই রয়েছে। সুকান্ত ও চন্দ্রমৌলি এই দুই কুমারীকে বিনা সাজেও দেখেছে কতবার। তবে কি গাছপালা দেখবে তাদের

রূপ ?

হয়তো তা নয়, এই সাজসজ্জা যেন যৌবন-আগমনের মহড়া। আয়নায় নিজেকে দেখেই অনুরাগে রঞ্জিত হওয়া। বেশি সাজলে যেন খানিকটা অহঙ্কারের ভাব আসে। দেবিকা ও সুরেখা স্টেশান ওয়াগনে আসার পথে রাকাকে বড় অবহেলা করেছে, তাকে কথা বলার যোগ্যই মনে করেনি।

সবাই হাসলো, দেবিকা-সুরেখা বেশি হাসলো। হাসি থামবার পর দেবিকা বললো, তোর এত বাঘের ভয় ? তুই তা হলে এলি কেন ?

এ জঙ্গলে বাঘের নামগন্ধ নেই, তা জেনেও সোমনাথ ছোট মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাঘ এলেই বা ভয় কী, খুকি ? মৌলিকাকু রয়েছেন না সঙ্গে। মৌলিকাকু খালি হাতে বাঘকে শায়েস্তা করে দেবেন !

এই প্রথম রাকা দিদিকে অবজ্ঞা করতে পারলো। দেবিকার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, আমার থেকে ন' বছর বড়, তবু এই বুদ্ধি ? রাকা কি বাঘের ভয়ের জন্য ও কথা বলেছে নাকি ? সে তো চায় বাঘ আসুক, মৌলিকাকু সেই বাঘের সঙ্গে লড়াই করবেন, রাকা সেই লড়াইটাই তো দেখতে চায়।

চন্দ্রমৌলিও রাকার কথার মূল্য দিয়ে বললেন, যদি একটা বাঘ দৈবাৎ সামনে চলে আসে, তা হলে তার চামড়া দিয়ে রাকার জন্য একটা ফ্রক বানিয়ে দেওয়া হবে।

তারপর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা মস্ত বড় ভোজালি বার করে দেখিয়ে তিনি ছদ্ম বীরত্বের কৌতুকে বললেন, এই দ্যাখো, রাকা, ছাল ছাড়াবার জন্য এটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

সুকান্ত আর তৃণীর পাশাপাশি, দেবিকা ও সুরেখা অন্যদের থেকে একটু দূরে দূরে, একেবারে সামনে চন্দ্রমৌলি, তারপর সোমনাথ, রাকা তার মায়ের হাত ধরে আছে। একটুও ভয় করছে না তার, মায়ের হাত ধরতে তার এমনিই ভালো লাগে।

সেবন্তী তেমন কিছু সাজেননি, একটা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরা, যেমন তেমন করে বাঁধা চুল, মেয়েদের নিজের লিপস্টিক ধার দিলেও নিজে ব্যবহার করেননি, তবে তাঁর কানে দুটো মুক্তোর দুল। এই দুলজোড়া আটপৌরে নয়, আজ ধারণ করেছেন বলেই বোঝা যায়, তিনি এই জঙ্গলে বেড়াতে-আসাটাকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন।

রাকার মনে আছে, কত যত্ন করে, স্নিগ্ধ গলায় মা তাকে সেদিন গাছ চিনিয়েছিল। সেই প্রথম রাকা জানলো যে তেঁতুলগাছ মস্ত বড় হয়, কিন্তু তার

পাতা খুব ছোট আর ঝিরিঝিরি। খানিক'টা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাত দিয়ে মুছে নিয়ে সেবন্তী বলেছিলেন, খেয়ে দ্যাখ। কী সুন্দর টকটক লাগে। আর একটা গাছে এক গুচ্ছ সোনালি সুতো ঝুলছিল, রাকা সেদিকে তাকাতেই সেবন্তী বললেন, ওকে বলে আলোকলতা।

চন্দ্রমৌলি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে মা ও মেয়ের কথা শুনছিলেন। রাকাকে শেখাবার জন্য তিনিও এক একটা গাছের নাম বলতে লাগলেন। একবার মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি একটা ছোট্ট আগাছা তুলে নিয়ে বললেন, বাঃ, এটা তো বেশ ভালো স্পেসিমেন। এটা কি জানো, খুকি? এটা এক ধরনের ফার্ন। ইংরেজিতে বলে মেইডন হেয়ার ফার্ন। তার মানে কুমারী মেয়ের চুল। দ্যাখো, লতাটা কী রকম চুলের মতন কালো।

সোমনাথ একেবারেই গাছ চেনেন না। তাঁর বাল্য কৈশোর কেটেছে শহরে, শান্তিনিকেতনের মতন প্রাকৃতিক পটভূমিকা তিনি কখনো পাননি। তেঁতুল পাতা যে এরকমভাবে খাওয়া যায়, তা জেনে তিনি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার মতনই বিস্মিত।

সোমনাথ বললেন, মৌলি, তোমার তো বড় বড় গাছ কাটাব ব্যবসা। তোমার আবার বোটানিতেও আগ্রহ আছে নাকি?

চন্দ্রমৌলি খানিকটা আহত, প্রতিবাদের সুরে বললেন, আমি শুধু গাছ কাটি না। গাছ লাগাইও। ওয়ান ইচ টু থ্রি। প্রত্যেকটা গাছ কাটার পর তিনটে করে স্যাপলিং বসাই। আর জঙ্গলে থাকতে গেলে জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি মাটি, সব রকম গাছ-গাছড়া কীট-পতঙ্গ চিনতে হয়।

সোমনাথ বললেন, তুমি যেমন হঠাৎ মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে একটা চারাগাছ তুললে, আমি ঐ রকমভাবে কোনো দিনই বসতে পারবো না। অথচ ব্যাপারটা দেখে আমার এত ভালো লাগলো।

চন্দ্রমৌলি হা-হা করে উঁচু রব তুলে হাসলেন। তারপর সেবন্তীকে আলোকলতার গুচ্ছের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন, এই আলোকলতার মূল নিয়ে বাউলদের কী একটা গান আছে না?

সেবন্তীও পাতলা করে হাসলেন। বোঝা গেল তিনি গানটির কথা জানেন, অথচ হ্যাঁ কিংবা না বললেন না।

বেতের বাস্কেট ভর্তি করে আনা হয়েছিল কত রকম খাবার। বুড়িমা দু'খানা মাদুর, কাপ-প্লেট, ফ্লাস্ক ভর্তি জল, সব কিছু গুছিয়ে দিয়েছেন। তাঁকেও আসতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বাড়ির বাইরে যান না।

বড় বড় ডালপালা মেলা কয়েকটি গাছ এক জায়গায় চন্দ্রাতপ রচনা করেছে, তলায় কোনো আগাছা নেই. বেশ পরিষ্কার, মাদুর বিছিয়ে বসা হয়েছিল সেখানে। চন্দ্রমৌলি লম্বাভাবে পা ছড়িয়ে বাঁ কনুইতে মাথায় ভর দিয়ে একটা মাউথ অর্গান বাজাতে লাগলেন। এই বাজনাটিতে বেশ দক্ষতা আছে তাঁর। একটা গাঢ় নীল রঙের কর্ডুরয়ের প্যান্ট পরা, তার ওপরে একটা দুপুর রঙের টি শার্ট, বোতামগুলো খোলা, দেখা যাচ্ছে তাঁর রোমশ প্রশস্ত বক্ষ, পায়ে মজবুত ধরনের ফিতে বাঁধা চামড়ার জুতো। পা দুটো তিনি মাদুরের বাইরে রেখেছেন, হঠাৎ এক সময় বাজনা থামিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, চা আনা হয়েছে তো, সেবন্তী ?

দেবিকা আর সুরেখা চন্দ্রমৌলির বিপরীত দিকে বসেছে। দু'জনের দৃষ্টিও সমান্তরাল। তারা বাবার বন্ধু কিংবা একজন কাকাকে দেখছে না, তারা চন্দ্রমৌলির মধ্যে দেখছে একজন পুরুষ-শ্রেষ্ঠকে। সুকান্ত তাদের সমবয়েসী, কিন্তু সে এখনো পুরোপুরি পুরুষ হয়ে ওঠেনি, সে বাবার শরীরের গড়ন পায়নি, রোগাটে, কণ্ঠার হাড় জেগে আছে। উনচল্লিশ বছর বয়স্ক চন্দ্রমৌলি একজন পূর্ণ পুরুষ। দেবিকা ও সুরেখা কিশোরীকাল সমাপ্ত করতে চলেছে। তারা চন্দ্রমৌলির প্রতিটি কথা থেকে আঙুল নাড়া পর্যন্ত যেন দেবো নিচ্ছে হৃদয়ে। এরপর তারা চন্দ্রমৌলির মুখখানা বদলে নিয়ে ঠিক ঐ রকম একজন পুরুষের স্বপ্ন দেখবে বেশ কিছু দিন।

বেতের বাস্কেটটা খোলার পর দেবিকা ও সুরেখা আড়ষ্টভাবে সেবন্তীর দিকে তাকালো। সেবন্তী এক একদিন নিজে আগ্রহ করে পরিবেশন করেন। এক একদিন খাবারের সামনে এমনভাবে হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকেন, যেন তিনি কোনো খাবারের অস্তিত্বই জানেন না। তখন দেবিকা ও সুরেখা তাড়াতাড়ি পরিবেশনের ভার নেয়। সেদিন সেবন্তী কিন্তু একটুও দ্বিধা না করে একটা স্টিলের হাতা তুলে নিয়ে লঘু কণ্ঠে বললেন, সব কিছুই কিন্তু বুড়িমা করেনি, কিমার তরকারিটা আমি রেঁধেছি।

আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে সেবন্তী প্রথমেই প্লেটভর্তি খাবার দিলেন সুকান্তকে। সোমনাথ স্মিতমুখে তাকিয়ে রইলেন। সুকান্তকেই যে প্রথমে দেওয়া উচিত, তা সেবন্তী ছাড়া আর কে বুঝবে ? সুকান্ত যথারীতি লাজুক ভাবে হাত বাড়াতেই চন্দ্রমৌলি বাজনা থামিয়ে বললেন, এই স্টুপিড, তুই আগে নিচ্ছিস যে ? আগে রাকাকে দে, ও সবচেয়ে ছোট।

সোমনাথ বন্ধুর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কী মনোরম ছিল, সেই দিনটা। শরীর-মন জুড়িয়ে দেবার মতন বইছিল বাতাস। একটা পাখি আপ্রাণ ডেকে যাচ্ছিল গৃহস্থের খোকা হোক, আর মাঝে মাঝে থেমে অন্য একটা পাখি ডাকছিল, ঠাকুর গোপাল, ওঠো, ওঠো...। জারুল গাছে অনবরত ওঠা-নামা করছিল দুটো কাঠবেড়ালি, দু'একবার থমকে তারা উদগ্রীব হয়ে দেখছিল এই দলটিকে। খাওয়ার সময় সবাই মৃদু গলায় কথা বলছে, সেবন্তী নিজে খাওয়া শুরু করেনি, সকলকে না দিয়ে তিনি খাবেন না, সুকান্ত ও ছেলে মেয়েদের বারবার বলছেন, আর একটু নে, আর দু'খানা লুচি...। চন্দ্রমৌলি একটা লঙ্কা চেয়ে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে টিয়াপাখির মতো কচকচিয়ে সেটা শেষ করে বললেন, ঝাল নেই, আরও দুটো দাও!

বাঘের দেখা পাওয়া যায়নি বটে, তবে একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল ঠিকই।

লুচি-আলুর দম ও কিমার তরকারি শেষ করার পর অন্যরা যখন ছোট ছোট বাটিতে সেমুইয়ের পায়েস খাচ্ছিল, তখন সেবন্তী নিজের প্লেট নিয়েছিলেন। এমনিতেই তিনি স্বল্পাহারী, অন্যদের সামনে তিনি আরও কম খান। একখানা লুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোনো রকমে মুখে তুলে দিলেন অনেকক্ষণ ধরে, যাকে বলে দাঁতে কাটা। হঠাৎ একটু দূরের দিকে, সোমনাথের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে খুব নরমভাবে সেবন্তী বললেন, ওটা কী?

একটা নতুন ধরনের প্রজাপতি কিংবা আকস্মিকভাবে একটা শুয়োরের ছানা দেখলে যেভাবে বলতেন সেইভাবেই সেবন্তী জিজ্ঞেস করলেন। সবাই তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আঁতকে উঠলো, মাদুর থেকে মাত্র দশ এগারো হাত দূরে ঝোপ থেকে একটা সাপের অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে, খুবই স্পষ্ট ও নির্ভুল। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে প্রায় সকলেই ছিটকে দূরে সরে গেল, দুটি কিশোর ও দুটি কিশোরী চলে গেল অনেকটা পেছনে, সোমনাথ রাকাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেলেন একটা গাছের পেছনে, চন্দ্রমৌলি বিশাল শরীর নিয়েও স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠলেন, ভোজালিটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন অন্যদের আড়াল করে, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর রক্ষাকর্তার ভূমিকা। একমাত্র সেবন্তী একটুও নড়লেন না, তাঁর হাতে খাবারের প্লেট একই রকম রইলো, কোনো অবস্থাতেই বিসদৃশভাবে তিনি অন্যদের সামনে দৌড়োবেন না, শাড়ি ঠিকঠাক করে না গুছিয়ে উঠে দাঁড়াবেন না। যদি আচমকা কখনো মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তাঁর সামনে, তা হলেও তিনি চুল ঠিক না করে, শাড়িতে পা না ঢেকে তাকাবেন না মৃত্যুর দিকে।

চন্দ্রমৌলি হাতের অস্ত্র প্রস্তুত রেখে অকম্পিত গলায় অন্যদের বললেন, তোমরা সবাই সরে যাও, অনেকটা সরে যাও—

সাপটা ঝোপ ছেড়ে প্রকাশ্যে এসে গিয়ে যেন কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়েছে। কী করবে বুঝতে পারছে না, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে এক জায়গায়, দু'একবার চন্দ্রমৌলিকে মুখ তুলে দেখে জিহ্বা চিড়িক চিড়িক করলো।

চন্দ্রমৌলির নিরাপত্তার জন্য কেউ চিন্তিত নয়, কারণ তিনি প্রতিষ্ঠিত বীরপুরুষ, একটা সাপ তাঁর কাছে কিছুই নয়।

দেবিকা কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করে বললে, ওরে বাবা, কত বড়, মৌলিকাকা, মারো, ওকে মারো—

সুরেখা, তূণীররাও সেই রকম শব্দই করলো। চন্দ্রমৌলি সাপটার দিকে দু'কদম এগিয়ে গিয়ে একবার হাসি মুখ ফিরিয়ে দূরের অন্যদের দেখলেন। কাছেই তাঁর পেছনে বসে থাকা সেবন্তীকে দেখতে পেলেন না, সেবন্তীকে খুঁজলেনও না। তিনি ফৌজি লোকদের কায়দায় ধপ ধপ করে পা ঠুকলেন, সাপটা তাতে চঞ্চল হলো।

দেবিকা, সুরেখা, তূণীররা সমস্বরে বলে যাচ্ছে মারো, মৌলিকাকা ওকে মারো, কিন্তু মৌলি তাঁর উত্থিত ভোজালিটা ব্যবহার করলেন না, নাচের ভঙ্গিতে জুতো ঠুকতে ঠুকতে এগোতে লাগলেন সাপটার দিকে, মুখে বলতে লাগলেন, যাঃ যাঃ।

সাপটা পেছন ফিরেছে, ঝোপের মধ্যে সর সর করে ঢুকে যাবার পর চন্দ্রমৌলিও একেবারে ঝোপটার কাছে এসে প্রায় সস্নেহে বললেন, যাঃ, বাড়ি যা, এখানে এসেছিলি কেন ?

একবার তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, আর ভয় নেই, ও আর আসবে না।

দেবিকা-সুরেখারা মাদুরের কাছে সন্তর্পণে ফিরে এলো, চন্দ্রমৌলির দু'পাশে দাঁড়িয়ে অনুযোগ করতে লাগলো, তুমি কেন ওকে মারলে না। যদি আবার তেড়ে আসে।

রাকা কোনো শব্দ না করে আগাগোড়া বড় বড় চোখ মেলে দেখছিল সব কিছু। সাপটা দেখে তার সারা শরীরটা কুঁকড়ে উঠছিল, তবু তাঁর মনে হলো, চন্দ্রমৌলি যদি সাপটা মারতেন, তারচেয়েও তিনি যে সাপটাকে না মেরে তাড়িয়ে দিলেন এতেই যেন তিনি আরও বড় বীরপুরুষ হয়ে গেলেন।

সোমনাথ নিজের স্ত্রীর পাশে বসে পড়ে বললেন, সত্যি, তোমার যা সাহস, তুমি একটুও নড়লে না, ভয় পেলে না।

সেবন্তীর ঠোঁট কাঁপছে। তিনি দু'চোখে লজ্জা ফুটিয়ে বললেন, আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। লক্ষ্মীটি আমাকে আর খেতে বলো না।

সোমনাথ বুঝলেন, আর অনুরোধ করা বৃথা। তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

চন্দ্রমৌলি এসব লক্ষ করলেন না, তিনি দেবিকা-সুরেখাদের অনুযোগের জবাব দিতে ব্যস্ত, বললেন, নারে, সাপ কখনো তাড়া করে আসে না, ওরা আসলে...

সব কিছু গুছিয়ে গাড়িতে রেখে এসে, বাড়ি ফেরার আগে আর একটা সরু পায়ে চলা পথ ধরে ওরা এলো একটা অরক্ষিত সরোবরের সামনে। অরণ্যের প্রাণী ছাড়া বহুদিন কোনো মানুষ এটা ব্যবহার করেনি বোঝা যায়। যদিও মানুষেরই তৈরি। একদিকে বাঁধানো ঘাট আছে।

সেবন্তী সেই ঘাটে বসলেন। ডান দিকের আড়'লে কোথাও গাছ কাটার শব্দ হচ্ছে, চন্দ্রমৌলি সেটা বৈধ ব্যাপার কিনা দেখতে যেতে চান, চারটি ছেলে মেয়েও গেল তার সঙ্গে, রাকাও যেতে চেয়েছিল, কিছুটা গেলও দৌড়ে দৌড়ে ঐ দলটির পিছু পিছু, কিন্তু কেউ তাকে গ্রাহ্য করছে না বলে ফিরে এলো মায়ের কাছে। সোমনাথও স্ত্রীকে ছেড়ে যাননি।

রাকার মনে হলো, এখানেই বেশি ভালো, কারণ মা গান গাইছে।

শান্তিনিকেতনে শেখা গলা, তবু সেবন্তী গান করতেই চান না, বিশেষত কেউ অনুরোধ করলে একেবারেই রাজি হন না, আজ স্বেচ্ছায় গুনগুন করছেন। সোমনাথ এক সময়ে বললেন, জায়গাটি বেশ, তেমন দূর নয়, আমরা আগে এখানে আসিনি কেন?

গানের মাঝখানেই সেবন্তী বললেন, আমরা মাঝে মাঝে ছুটির দিনে এরকম কোথাও না কোথাও

তারপর তিনি চলে গেলেন ঘাটের শেষ ধাপে জলের কাছে।

সরোবরটি পানায় ভর্তি, মাঝখানে ফুটে আছে প্রচুর পদ্ম। সেবন্তী খেলা করবার মতন হাত দিয়ে পানা সরাতে লাগলেন, পানা সরে গেলে জল বেশ টলটলে, যেন দর্পণ, সেবন্তী দেখতে পেলেন তাঁর মুখের প্রতিবিম্ব। সেবন্তী একটুক্ষণ দেখলেন তাঁর জল-কম্পিত মুখের ছবি, তারপর জল চাপড়ে সেই ছবি ভেঙে দিয়ে হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কে? এটা কি আমি, এত খারাপ দেখতে হয়ে গেছি, সারা মুখে কাটা কাটা দাগ, আমি কী খারাপ! কী খারাপ!

সোমনাথ দৌড়ে এসে সেবন্তীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, কী হলো ? কী হলো ?

সেবন্তী জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে আরও জোরে বলে উঠলেন, তুমি আমায় ধরছো ? তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো না আমি কী খারাপ হয়ে গেছি।

সোমনাথ ব্যাকুলভাবে বললেন, চুপ চুপ, না তুমি একটুও খারাপ দেখতে হওনি, সেবন্তী ! সবাই বলে... এ তো জলের মধ্যে

সেবন্তী বললেন, হ্যাঁ গো, আমি নোংরা আর বিশ্রী, আমার সারা মুখে দাগ।

সোমনাথও তাঁর স্বভাবের তুলনায় অনেকখানি গলা তুলে বললেন, সেবন্তী, প্লিজ চুপ করো, তোমার কিছু হয়নি, এই তো, তুমি এত সুন্দর...

সেবন্তী থেমে গেলেন। বিভ্রান্তভাবে জল ও বৃক্ষরাজির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, আমি বুঝি খুব জোর চেঁচিয়েছি ! কেন ?

দ্বিতীয়টির তুলনায় এই প্রথম ঘটনাটি রাকার মনে তেমন রেখাপাত করেনি, কারণ সে তখন আরও ছোট ছিল, তা ছাড়া সে প্রথম দিকটা শোনেনি, দুটো গুবরে পোকার খেলা দেখছিল। সেদিনের অন্যান্য সব কিছুর অভিঘাত অনেক তীব্র ছিল। দ্বিতীয় ঘটনার সময় সে মাকে একটা প্রশ্ন করেছিল, মা উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ? এই হাহাকারই একটা শেলের মতো তার বুকে বিঁধেছিল। প্রথম বারের ঘটনার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কোনো যোগ ছিল না। অনেক পরে সে দুটিকে মিলিয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনার পর বরং সেবন্তী অনেক শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে সংসারে মন দিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য।

মায়ের কাছে উত্তর পায়নি রাকা, কিন্তু প্রশ্নটা তার মনে রয়ে গেল। কাকে বলে সুন্দর ? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে তাকে ?

স্কুলে রাকার প্রধান বান্ধবী তাপসী। কী করে যেন এটা হয়, এক ক্লাসে সাঁইত্রিশ জন মেয়ে, অনেকের সঙ্গেই ভাব, তবু শুধু একজন হয়ে যায় প্রাণের বন্ধু। বীথি কিংবা শিখার সঙ্গেও মনের অনেক মিল, ওরা থাকে বাড়ির কাছাকাছি, তবু রাকা মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধু কে ? তাপসী, তাপসী !

এই তাপসী রাকার চেয়ে একটু লম্বা হয়েছে এরই মধ্যে, শ্যামলা রং, ভালো করে চুল বাঁধে না, নাকটা খাড়া মতন, নাক বিঁধিয়ে একটা নাকছাবি পরানো,

চোয়ালের হাড় স্পষ্ট বোঝা যায়। তাপসীকে কেউ কখনো পুতুল বলেনি, চোয়ালের হাড় বের করা, উস্কোখুস্কো মাথা, শ্যামলা রঙের পুতুল কেউ বানায় না। তাপসীর দিকে কেউ ফিরে তাকাবে না দ্বিতীয়বারও। তবু তাপসীকেই ক্লাসের সব মেয়ের চেয়ে সুন্দর মনে হয় রাকার। তার ভুরু দুটো মনে হয় কাজল-আঁকা, আর মাঝে মাঝে কী রকমভাবে তাকায়! তখন তাপসীকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

স্কুলে থাকার সময়েই তাপসী দু'বার অপমান করেছে রাকাকে। তাপসী যেন বয়েসের তুলনায় বেশি বোঝে। পৃথিবীটাকে বেশি চিনে ফেলেছে।

তাপসীদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায় রাকা। নিজেদের বাড়ি ও চন্দননগরের মামাবাড়ি ছাড়া এই পরিবারটিকেই সে চেনে।

শহরের মধ্যে সরু ফিতের মতন একটা গলি, দু'পাশে খোলা নর্দমা, ন্যাংটো শিশুরা যেখানে রাস্তার মাঝখানে খেলা করে, দু'দিক থেকে দুটো সাইকেল রিক্সা এলে মুখোমুখি আটকে যায়, তারা ঝগড়া করে। গায়ে গায়ে লাগা সব ছোটবড় বাড়ি, কোনোটা ভাঙা, কোনোটা সবে তৈরি হচ্ছে, কোনো কোনো বাড়ির স্ত্রীলোকেরাও চেঁচিয়ে কথা বলে, রাস্তা থেকে শোনা যায়। বাইরের দিকের জানালায় দড়ি খাটিয়ে তারা শুকোতে দেয় সায়া-ব্লাউজ-জাঙ্গিয়া।

এ সবই রাকার অভিজ্ঞতায় নতুন। তাদের নিজেদের বাড়ি কিংবা মামা বাড়ি, কোনোটাই এ রকম পাড়ার মধ্যে অন্য বাড়ির সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগা নয়। তাদের বাড়িতে বাগান আছে, অনেকখানি খোলা মাঠও দেখা যায়। ডিস্ট্রিক্ট জাজ সোমনাথকে আসতে হয় বর্ধমান আদালতে, কিন্তু তিনি বাড়ি নিয়েছেন শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে। যাতায়াতে অনেক সময় যায়, রাকাদের স্কুল বেশ দূর হয়, তবু সেবন্তীর এরকমই পছন্দ।

তাপসীরা থাকে ভাড়া বাড়ির দোতলায়। একতলার লোকেরা গেঞ্জি বানায়, শোঁ শোঁ করে গেঞ্জির কল চলে। দোতলাতেই আর একটা পরিবার সব সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, রাকা যে-কদিনই এসেছে, সে কদিনই দেখেছে সেই দিক থেকে একটা হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা ধ্যাড়েঙ্গা চেহারার ছেলেকে দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যেতে।

তাপসীদের বারান্দায় টিনের দরজাটা বন্ধ করলে ও দিকের গোলমাল বিশেষ শোনা যায় না। তাপসীদের সংসারে নিজস্ব অনেক ধ্বনি আছে।

রাকা নিজের বাবা-মাকে দেখে ভাবতো, সব বাবা-মায়েরাই বুঝি এ রকম বয়সী হয়। তাপসীদের বাড়িতে এসে তার এই ভুল ভেঙেছে। সোমনাথ ও

সেবন্তীর তুলনায় তাপসীর বাবা-মায়ের বয়েস অনেক বেশি মনে হয়। তাপসীর বাবা নিশিকান্ত প্রায় এক ঝুঁকে পড়া বুড়ো, মাথার চুল অনেকটাই সাদা, কিন্তু তাঁর প্রাণশক্তি কম নয়, হাসি-ঠাট্টা-কৌতুক-লাফ-ঝাঁপের বিরাম নেই, মাঝে মাঝে কানের কাছে একটা হাত নিয়ে আ-আ-আ-আ করে একটা কালোয়াতি তান দিয়ে দেন।

নিশিকান্ত কোনোদিন চাকরি করেননি, আগে তিনি পাড়ায় পাড়ায় জলসায় গান গাইতেন, কিছুদিন যাত্রাও করেছেন, এখন আর তাঁকে কেউ ডাকে না। এখন তিনি পাড়ার ছেলেমেয়েদের গান শেখান। শুধু গান নয়, তবলা, সেতার, নাচ, যে-যেটা চায়, নিশিকান্ত এই সবকটাই জানেন, কিন্তু কোনোটাতেই নিজে সার্থক হননি। রাকা এসে দেখেছে, সামনের বড় ঘরটায় চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে কেউ তবলা পিটছে, কেউ সেতার, কেউ গান, কেউ নাচে তালিম নিচ্ছে। আর নিশিকান্ত লাফিয়ে লাফিয়ে কারুর হাত ঠিক করে দিচ্ছেন, কারুর পা, কারুর সঙ্গে সা-রে-গা-মায় গলা মেলাচ্ছেন, আবার মাঝে মাঝে হুঁকো টানছেন এক কোণে দাঁড়িয়ে। বেশ মজা পেয়েছিল রাকা।

তাপসীর অবশ্য একটা নিজস্ব ঘর আছে। খুবই ছোট, এক চিলতে ঘর, আসলে একটা ছোট বারান্দা, টিন দিয়ে ঘেরা। এই ঘরে তাপসী আর তার ছোট ভাইটা থাকে। তাপসীর দুই দাদা সাবালক হয়েই এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে গেছে। তাপসীর বাবা তাদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে বলেন, 'আমার দুই হারামজাদা'! রাকাদের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী যে সব শব্দগুলো 'খারাপ কথা', তা এই বাড়িতে অনেকগুলোই অনবরত চলে। সোমনাথ একদিন রাকার দাদা তূনীরকে বলেছিলেন, রাস্তার রিক্সাওয়ালা, ঝাঁকা মুটে আর বখাটে ছেলেদের মুখে অনেক খারাপ কথা শুনবে, তোমাদের তো আর চারদিক ঘিরে রাখা যাবে না, কিন্তু সেই সব শব্দ কোনোদিন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না।

রাকাও রিক্সাওয়ালাদের ঝগড়ায়, বাজারের কাছে বসে থাকা ছেলেদের মুখে, দেয়ালের লেখায় অনেক খারাপ, অসভ্য কথা শুনেছে ও দেখেছে, কিন্তু কারুর বাবা যে এই ধরনের কথা অনর্গল বলতে পারে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

তবু নিশিকান্তকে রাকার ভালো লাগে। বুড়ো লোক হয়েও ছেলেমানুষদের মতন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলেন, মাঝে মাঝে হেসে ওঠেন বুক ফাটানো হা-হা শব্দে। কিন্তু তাপসীর মা মৃদুলাকে কেমন যেন লাগে। মাতৃমূর্তি হিসেবে তাঁকে কিছুতেই ভাবা যায় না।

মৃদুলা খুব রোগা। অনেক মানুষই রোগা হয়, কিন্তু সেটাই প্রধান হয়ে চোখে পড়ে না। মৃদুলাকে মনে হয় একটা শীর্ণ শালিকের মতন, মুখখানা যেন শুকিয়ে গেছে। তা ছাড়া রাকা যে-কবার দেখেছে, প্রত্যেকবারই মৃদুলার পরনের শাড়িটা ছিল নোংরা। হলুদের দাগ, আরও ছোপ ছোপ ময়লা। সেই বয়েসে রাকা কম দামি-বেশি দামি শাড়ি-জামা-কাপড় সম্পর্কে অবহিত হয়নি, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা তার চোখে লাগে। মায়েদের যেন ময়লা কাপড় একেবারেই মানায় না। অথচ নিশিকান্ত লুঙ্গির ওপর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে থাকেন, কিন্তু তাঁর মুখখানা এমন জীবন্ত যে পোশাকের দিকে চোখ পড়ে না।

মৃদুলা প্রথম দিন রাকাকে চিনি মাখানো ফুটি খেতে দিয়েছিলেন। সেই চিনির সঙ্গে কয়েকটা মরা পিঁপড়ে লেগে ছিল। জ্যান্ত পিঁপড়ে খেয়ে ফেললে সাঁতার শেখা যায়। মরা পিঁপড়েতে তো আর তা হয় না, তাই একটু একটু ঘেন্না করছিল রাকার। তা দেখে মৃদুলা বলেছিলেন, বড়লোকের বাড়ির মেয়ে, এত সুন্দর, ওকে আর আমি কী দিয়ে যত্ন করবো ! আমাদের যা অবস্থা !

রাকা জানতো না যে তারা বড়লোক। বাবার কাছে মুলুকচাঁদজী নামে একজন আসেন ঝকঝকে গাড়ি চেপে, এক একদিন এক এক রকম গাড়ি, দিদিদের মুখে শুনেছে যে ঐ মুলুকচাঁদজী একজন বড়লোক। বর্ধমানের রাজারা ধনী। আর রাকার ধারণা ছিল, যারা গরিব, তারা রাস্তায় থাকে, অনেকবার রাস্তায় সে নোংরা নোংরা গরিবদের দেখেছে, তারা রাস্তাতেই শুয়ে থাকে, তাদের মেয়েরা মাথার চুল থেকে উকুন বাছে। আর যারা বাড়ির মধ্যে থাকে, তারা রাকাদেরই মতন। তারা বড়লোকও নয়, গরিবও নয়।

এটা তা হলে একটা গরিব বাড়ি !

এমন অগোছালো, হৈ-হট্টগোলের বাড়ির মেয়ে হয়েও তাপসী পড়াশুনোতে দারুণ ভালো, প্রায় প্রতিবারই সে ফার্স্ট হয়। বেশ গাইতে পারে, খানিকটা নাচতেও পারে তাপসী। বাড়িতে সব সময় এসব চলছে, দেখে দেখে শুনে শুনেই অনেকটা শিখে গেছে নিশ্চয়ই। যখন আপন মনে তাপসী নাচে, তখন ওকে খুব অন্যমনস্ক আর হারিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মনে হয়। রাকাদের বাড়িতে মা গান জানে, দিদিরাও মাঝে মাঝে গান গায়, কিন্তু নাচের পাট একেবারেই নেই।

তাপসী আর রাকা এক সঙ্গে গল্পের বই বদলাবদলি করে পড়েছে, স্বপ্ন বিনিময় করেছে, এমন কী এক সঙ্গে কেঁদেছে। কত গোপন কথা ছিল দু'জনের, যা আর কেউ জানতো না। একবার, যখন ওদের বয়েস আট বছর,

যখন ওরা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কথা বিশ্বাস করতো, সেই সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। যে পণ্ডিতমশাই বাংলা পড়াতেন, তিনি একদিন বলেছিলেন, জানো তো, এমন অনেক প্রশ্ন আছে, যার উত্তর আমিও জানি না। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে, যার উত্তর বাবা-মাও জানেন না। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারেন বলো তো ? ভগবান ! একমাত্র তিনিই সব জানেন ! তাঁকে জানালেই তিনি উত্তর দেবেন।

তাপসী জিজ্ঞেস করেছিল, ভগবান কী করে উত্তর দেন ! কী করে আমরা জানতে পারবো ?

পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন, সে জন্য চিন্তা করো না। ভগবান ঠিক জানিয়ে দেবেন। মনে করো, তুমি ভগবানকে চিঠি লিখলে, কোনো ঠিকানা লাগবে না, এমনিই একটা চিঠি খামে ভরে পাঠিয়ে দিলে, দেখো, একদিন না একদিন ভগবানের কাছ থেকে ঠিক উত্তর আসবে। ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখলেই উত্তর পাবে।

পণ্ডিতমশাইয়ের কথায় বিশ্বাস করেছিল ওরা দু'জনে।

ক্লাস থ্রি-তে পড়া বালিকার আঙুল গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছিল, শ্রীচরণেষু ভগবান, দু'পাতার চিঠি। ডাক টিকিট আঁটা খামে সেই দু'খানা চিঠি পোস্ট করা হয়েছিল একটা নিরিবিলি লাল রঙা ডাক বাক্সে।

কেউ কারুর চিঠি পড়েনি, সেই তাদের প্রথম গোপন। মা-বাবাও উত্তর দিতে পারবেন না, এমন কোন্ প্রশ্ন ছিল তাদের ? চিঠি পোস্ট করার পর পরস্পরের দিকে লজ্জারুণ মুখে চেয়েছিল কয়েক মুহূর্ত।

এমন যে বন্ধু তাপসী সে ঠিক একটা চাবুক মারার মতন কঠিন কথা বলে রাকাকে একদিন কাঁদিয়ে দিয়েছিল। অথচ কী দোষ ছিল রাকার ? সেবার স্কুলের পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে একটা উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল। এমন উৎসবে উঁচু ক্লাসের মেয়েদের নাচ-গান-আবৃত্তি করাই প্রথা। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা কী একটা নৃত্যনাট্যের মহড়া দিচ্ছিল, কী মজা তাদের, টিফিনের পর আর ক্লাস করে না, দোতলায় একটা ঘরে তারা নাচে আর গায় আর হেসে কুটিকুটি হয়। জিওগ্রাফির টিচার মানসীদি তাদের শেখাচ্ছেন। হঠাৎ একদিন ক্লাস ফাইভের পাঁচটি মেয়েকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মানসীদি বললেন, তোমরা কে কেমন নাচতে পারো দেখি তো। নৃত্যনাট্যে একটি বাচ্চা মেয়ের দরকার, যে বড়দের সামনে একা নেচে দেখাবে।

রাকা নাচতে রাজি হয়নি, সে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। সে লাফাতে পারে,

স্কিপিং করতে পারে, দৌড়তে পারে, দাদার কাছে সাইকেল চালাতেও শিখছে, কিন্তু নাচেনি তো কখনো! মানসীদি বলেছিলেন, জানিস না কি রে? সব মেয়ের মধ্যেই নাচ থাকে। শুধু একটু প্র্যাকটিস লাগে। অন্যমেয়েদের মধ্যে বীথি আর রুমাও খানিকটা নাচ শিখেছে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো নাচে তাপসী। দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে রিনিঝিনি শব্দ তুলে সে সারা ঘরটা ঘুরে ঘুরে নাচলো, দু'হাতের মুদ্রা ও মুখের ভঙ্গিতে তার চেহারাটা যেন বদলে গেল একেবারে, মুদিত চক্ষু, এ যেন এক ক্ষুদ্র পূজারিনী।

এরপর অন্য একটি মেয়ে যখন খোঁড়া মেয়ের মতো এঁকেবেঁকে নাচবার চেষ্টা করছে, তখন তাপসী রাকার পাশে বসে কানে কানে ফিসফিস করে বললো, ক্লাস ফাইভ থেকে মোটে একজন নেবে তো? দেখিস রাকা, তুই-ই চান্স পাবি, তুই যে খুব সুন্দর।

অবিশ্বাসের চেয়েও বেশি রাগের সঙ্গে রাকা বললো, যাঃ বাজে কথা। তুই এত ভালো নাচলি, আমি তো কিছু জানিই না।

চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে তাপসী বললো, তাতে কী হয়েছে, তোর এত সুন্দর মুখ, ঠিক যেন একটা পরী, পায়ের দিকে কে দেখবে?

সত্যিই তাই। পাঁচজনকে দেখার পর মানসীদি রাকাকেই পছন্দ করেছিলেন। জোর দিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, রাকা, তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো, কিছু ভেবো না!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাপসী মিটিমিটি হাসছে।

সেইদিনই রাকা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, মা, সুন্দর কাকে বলে? কেন সবাই আমাকে...

মা কোনো উত্তর দেননি। তখন ভগবানকে চিঠি লেখার বয়েসটাও পার হয়ে গেছে।

রাকা অবশ্য তারপর আর চারদিন স্কুলে যায়নি। সত্যিই তার জ্বর হয়ে গিয়েছিল। সে নাচেনি। তাপসীও কিছুতেই সেই উৎসবে নাচতে রাজি হয়নি।

তাপসী দ্বিতীয় আঘাতটা দিয়েছিল আরও কয়েক বছর পর।

এর মধ্যে রাকার জীবনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, তা বোধহয় তার মা ছাড়া আর কেউ জানে না। তেরো বছর বয়েসে রজস্বলা হয়েছে রাকা, সে বালিকা থেকে রমণী হতে চলেছে, কিন্তু রাকা তা বুঝতে পারছিল না। প্রথম রক্ত দর্শনে সে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপর সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে

ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল মাকে।

নোংরা, নোংরা, শরীরটা নোংরা মনে হয়, এর নাম নাকি বড় হওয়া!

মাকে জড়িয়ে ধরেছিল রাকা, কিন্তু মায়ের কাছে আশ্রয় পায়নি। সেবন্তী তখন নিজেকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। তাঁর মনের মধ্যে যেন নিরন্তর এক যুদ্ধ চলছে। অন্য কোনো দিকে তাকাতে পারেন না। ধরা গলায় মেয়েকে বলেছিলেন, যা, বুড়িমার কাছে যা। বুড়িমা সব ব্যবস্থা করে দেবে।

বুড়িমা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সব। তিনি আর একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। শোন খুকি, দুপুরবেলা মা যখন ঘুমোবে, মায়ের পা ছুঁয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করে আসবি। এখন থেকে আর কোনো পরপুরুষের সঙ্গে একা একা এক ঘরে থাকবি না। সে রকম হলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবি। এ প্রতিজ্ঞার কথা তোর মা হয়তো জানতেও পারবে না, কিন্তু তুই মনে রাখবি সব সময়।

দেবিকা-সুরেখা তখন কলেজে যায়, কলেজ থেকে দল বেঁধে ঘাটশিলা বেড়াতে যায়। ওরা দু'জন সব সময় প্রায় শ্যামদেশীয় যমজের মতন এক সঙ্গে থাকে। তূণীর একা একা ফুটবল খেলা দেখতে যায়-কলকাতায়। বড় বড় ক্লাবের কোনো ম্যাচ সে বাদ দেয় না, তার প্রিয় দল জিতলে সে বন্ধুদের চপ কাটলেট খাওয়ায়, কখনো ফিরতে না পারলে সে রাত কাটিয়ে আসে চন্দননগরে মামার বাড়িতে। একবার আচমকা ট্রেন ও বাস-ট্রাম সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে সারা রাত শুয়ে ছিল হাওড়া স্টেশনে। তাতে কোনো দোষ হয়নি, তূণীর যে পুরুষ মানুষদের দলে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু রাকার গণ্ডিটা ছোট হয়ে এলো। বুড়িমা তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন, এখন সাইকেল চালানো শিখে গেছে রাকা, কিন্তু তূণীরের সাইকেল নিয়ে তাকে একা একা কোথাও যেতে দেওয়া হয় না, লাইব্রেরি থেকে বই বদলাতে হলে ধীরেনকে পাঠানো হয় সঙ্গে। সে বছর রাকা পড়াশুনোয় খুব মন দিয়েছিল। বাংলা গল্পের বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধরেছে ইংরিজি বই। তাপসীও ইংরিজি উপন্যাস পড়ে, সে একদিন অস্কার ওয়াইল্ডের 'পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে' বইটা দিয়ে রাকাকে বলেছিল ধৈর্য ধরে পড়বি, সব শব্দের মানে বুঝতে না পারলেও পড়ে যাবি, ডিকশিনারি দেখতে হবে না, একবার গল্পের টান এসে গেলে দেখবি আর কোনো অসুবিধা হবে না। দারুণ গল্পটা রে!

সত্যি, প্রথম দু'পাতার পর কিছুতেই পড়তে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু যে-হেতু তাপসী বইটা শেষ করেছে, তাই রাকাকে পড়তেই হবে, খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলে রাকা আবার প্রথম থেকে শুরু করেছে, এইভাবে তিন-চারবারের

চেষ্টায় বইটা পড়ে ফেলে রাকার খুব গর্ব হয়েছিল, অন্য কারুর সাহায্য না নিয়ে সে নিজের চেষ্টায় একখানা ইংরিজি বই শেষ করেছে। দেবিকা-সুরেখা এখনো ইংরিজি বই পড়ে না। এবার সে সমান সমানভাবে তাপসীর সঙ্গে বইখানা নিয়ে কথা বলতে পারবে!

অসম্ভব রূপবান ও চিরতারুণ্য-অভিলাষী ডোরিয়ানকে নিয়ে আলোচনায় বাংলার মফঃস্বলের দুই কিশোরীর একটা দুপুর কেটে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপার, বেশি গল্পের বই পড়ায় মন দিলেও সেই বছরেই রাকার পরীক্ষার রেজাল্ট সব চেয়ে ভালো হলো। অন্য বছর সে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় না, কিন্তু উঁচুর দিকে থেকেছে। এ বছর সে রুমা, রুচিরা, অন্যান্যদের টপ্‌কে একেবারে সেকেণ্ড হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তাপসীর চেয়ে মাত্র এক নম্বর কম পেয়ে সেকেন্ড। আর একটু হলে আনতাবড়ি ফার্স্টও হয়ে যেতে পারতো রাকা। যাক ভালোই হয়েছে, ভাগ্যিস সে ফার্স্ট হয়নি। তাপসীর মনে কোনো আঘাত সে দিতে চায় না, তাপসীকে খুশি দেখলে সে খুশি হয়। স্কুলের প্রেসিডেন্টের মায়ের নামে একটা পঞ্চাশ টাকার বৃত্তি আছে, ক্লাস এইট থেকে ফার্স্ট হয়ে যে মেয়ে ক্লাস নাইনে ওঠে, সে দু'বছর ঐ বৃত্তি পায়।

তাপসী রাকার রেজাল্ট দেখে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল!

স্কুলের সংলগ্ন ছোট মাঠটার এক কোণে একটা বকুল গাছ। ফুল ফুটলে সেই জায়গাটা সুগন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে। সেই বকুল গাছে আবার বুলবুলি পাখির বাসা। ছেলেদের স্কুল হলে কবেই সেই বাসা ভেঙে দিত, মেয়েরা বাসা ভাঙে না, রাকা আর তাপসী প্রায়ই সেখানে এসে বুলবুলি পাখির ডাক শোনে।

সেই গাছতলায় দাঁড়িয়ে, রাকার রেজাল্ট শীটটা হাতে নিয়ে তাপসী বলেছিল, এ কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলি তুই, আর একটু হলে আমাকে ছাড়িয়ে...তোর এত ভালো রেজাল্ট করার কী দরকার? তুই এত সুন্দর রাকা, তুই মোটামুটি পাশ করলেই তোর ভালো বিয়ে হয়ে যাবে, বড়লোকের বউ হবি, কত আরামে থাকবি! আমাকে চাকরি করতে হবে। ফার্স্ট না হলে আমি স্কলারশীপটা পেতাম না...

প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে এমন আঘাত পেয়ে রাকা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। অশ্রু-ঝাপসা চোখে সে শুধু তাকিয়ে ছিল তাপসীর দিকে, একটা কথাও আর বলতে পারেনি। ওপর থেকে একটা বকুল ফুল খসে পড়লো তার চুলে, সেটাও যেন বজ্রপাতের মতন।

রাকাদের বাড়িতে অনুচ্চার্য শব্দের যে একটি অলিখিত তালিকা ছিল, বিয়ে তার মধ্যে পড়ে। ছোট ছেলেদের মুখে বিয়ে একটা অসভ্য কথা। দেবিকা ও সুরেখা এক সময় তাদের পুতুলের খেলা ঘরে নিজেদের দুই পুতুলের বিয়ের ব্যবস্থা করে তূণীরকে পুরুত সাজিয়েছিল। সেবন্তী জানতে পেরে খুব বকুনি দিয়েছিলেন, তূণীরের হাত ধরে টেনে তুলে বলেছিলেন, ছিঃ, পুতুল নিয়ে খেলতে চাও খেলো, কিন্তু বিয়ে আবার কী খেলা? এই বয়েসে ওসব চিন্তা করাটাই পাপ! দুই বোন তো যথেষ্ট পাকা হয়েছে, তার মধ্যে আবার ছেলেটাকেও টেনে এনে...।

সেই জন্য রাকা কোনোদিন পুতুলের বিয়ের কথাও ভাবেনি।

বড়দের অবশ্য ও কথা উচ্চারণ করতে কোনো বাধা নেই। সুরেখার বিয়ের প্রচেষ্টা ততদিনে অনেকটা এগিয়ে গেছে। বুড়িমা বাড়ি ছেড়ে বেরোন না, তবু তিনি প্রায়ই দেবিকা-সুরেখার জন্য এক একটা সম্বন্ধ ঠিক করেন।

একদিন তিনি রাকার পড়ার ঘরে ঢুকে বললেন, আয় তো খুকি, আমার সঙ্গে, তোর মাকে একটা কথা বলবো!

জানলার ধারে সেই পুরোনো পালঙ্কের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন সেবন্তী। কোলের ওপর একটা বই খোলা। হঠাৎ এমন রোগা হয়ে গেছেন যে কণ্ঠার হাড় দেখা যায়, ব্লাউজ ঢলঢল করছে গায়ে। ইদানীং তাঁর কথা-না-বলা রোগ হয়েছে। অন্য কেউ সাতবার কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বড়জোর একবার এক অক্ষরে উত্তর দেন, হ্যাঁ কিংবা না। কিছু খেতেও চান না, প্রায় জোর করে খাওয়াতে হয়। বই খোলা থাকে, বই পড়েন না, চেয়ে থাকেন দূরের দিকে, দু'চোখ দিয়ে যখন তখন জলের ধারা বয়ে যায়। কী যে তাঁর দুঃখ কেউ বোঝে না। তিনি বোঝাতেও পারেন না। সোমনাথ তিনজন বড় ডাক্তার এনে দেখিয়েছেন, তাঁরা দিয়ে গেছেন রাশিরাশি ওষুধ। কেউই বলেননি যে এটা পাগলামির লক্ষণ, এর নাম ডিপ্রেশান।

রাকার হাত ধরে ঘরে ঢুকলেন বুড়িমা, সেবন্তী লক্ষই করলেন না।

সেবন্তীর মন ভালো করার চেষ্টায় বুড়িমা লঘু কণ্ঠে বললেন, দ্যাখো বউমা, দ্যাখো, খুকি কী রকম তরতর করে বড় হয়ে যাচ্ছে. এই তো সেদিনও কত ছোট ছিল, আমার কাঁধ জড়িয়ে ঝুলে গল্প শোনার জন্য আবদার করতো, হঠাৎ লম্বা হয়ে গেল, কী সুন্দর হচ্ছে দিন দিন, যেমন গড়ন, তেমনি রং, এবার ওর বিয়ের কথাও ভাবতে হবে।

সেবন্তী সুদূর থেকে ফিরে এসে তাঁর দৃষ্টি এই কাছের দু'জনের ওপর ন্যস্ত

করলেন।

বুড়িমা আবার রঙ্গ করে বললেন, আমাদের সুকান্ত তো বেশ ভালো ছেলে। পড়াশুনোয় নাম করেছে, ব্যবহার কত ভালো, সুকান্তর সঙ্গে রাকার বিয়ে দিলে হয় না? এখুনি দিতে বলছি না, আগে বড় দুই বোনের... কিন্তু ঠিক করে রাখতে দোষ কী? ও ছেলে যদি পট করে আবার অন্য কোথাও

রাকার থুতনি ধরে রঙ্গ করে বুড়িমা বললেন, কী রে, অত লজ্জা কিসের? সুকান্তকে তোর পছন্দ নয়?

রাকা প্রথম থেকেই লজ্জায় ছটফট করছিল, বুড়িমা'র হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু বুড়িমা শক্ত করে ধরেছিলেন তার হাত। রাকার মুখখানা যেন চাঁপা ফুলের ওপর পড়েছে শেষ বিকেলের রাঙা রোদ।

সেবন্তী কিছু শুনছেন কি না কিংবা এই সব কথা তাঁর মর্মে প্রবেশ করছে কি না কিছুই বোঝা গেল না, তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাকার মুখের দিকে। একটু বাদে তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ অসম্ভব কাতর আর্তনাদের মতন, যেন তাঁর অন্তরটা একেবারে দলে-মুচড়ে যাচ্ছে, আ-হা-হা চিৎকার করে ঢলে পড়লেন এক পাশে। বানবিদ্ধ হরিণীর মতন ছটফট করতে করতে একটুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে নিথর হয়ে গেলেন।

সেইদিন রাকার মনে হয়েছিল, যে-কোনো কারণেই হোক, মা তাকে যেন ভয় পায়। কেন? কারণটা তাকে জানতেই হবে।

॥৩॥

সেই প্রথমবার সুকান্তকে সঙ্গে এনে চন্দ্রমৌলি তাকে ভর্তি করে গিয়েছিলেন ইটাচুনা হাইস্কুলের ক্লাস নাইনে। সেখানকার হেডমাস্টার চন্দ্রমৌলির পূর্ব পরিচিত। হস্টেলে ছেলের জায়গা পেতে অসুবিধে হয়নি।

হস্টেলের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে অনেক বাবা-মায়ের মনেই একটা বিভীষিকাময় ধারণা আছে। এক মাস পরেই কোনো একটা ছুটি উপলক্ষে সোমনাথ নিজে ইটাচুনা গিয়ে সুকান্তকে নিয়ে এলেন বাড়িতে এবং তাকে দেখামাত্র সেবন্তী ও বুড়িমার ধারণা হলো, ঠিক মতন না খেতে পেয়ে ছেলেটা এই এক মাসেই অনেক রোগা হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেল সুকান্তর ওপর আদর যত্নের অত্যাচার।

সেবন্তী সে সময় পরিপূর্ণ স্বাভাবিক ছিলেন। এবং স্বাভাবিক থাকলে

সেবন্তীর মতন মমতাময়ী ও কৌতুকউচ্ছলা নারী দুর্লভ। সুকান্ত মাতৃহীন, সেইজন্য সেবন্তী যেন নিজের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ ঢেলে দিলেন সুকান্তর ওপর। নিজে রোজ রান্না করতে লাগলেন তার জন্য। সুকান্তকে সঙ্গে নিয়ে বর্ধমানের সবচেয়ে বড় সেলুনে চুল কাটিয়ে আনলেন, তার জন্য কিনে আনলেন হাল ফ্যাশানের জামা।

সুকান্ত খেতে ভালোই বাসে না। আবাল্য মধ্যপ্রদেশে কাটাবার জন্য বাঙালীদের খাদ্য রুচি সে পায়নি, ভাতের বদলে তার রুটি পছন্দ, বেশির ভাগ মাছেই তার গন্ধ লাগে। রুটির সঙ্গে দুটো-একটা সব্জি হলেই চলে যায়, বাঙালীদের ভাতের সঙ্গে পঞ্চব্যঞ্জন চাই। সেবন্তী কোনো আপত্তি শুনবেন না, সুকান্তকে তিনি ভাতের সঙ্গে মাছ খাওয়াবেনই, সকালবেলা ব্রেক ফাস্টে ডিম, রাত্তিরে শোবার আগে এক গেলাস গরম দুধ।

চন্দ্রমৌলি নেই, এবারে সুকান্ত একটু একটু করে মুখ খুলেছিল। চন্দ্রমৌলি নিজে চান বা না চান, সব জায়গায় তিনি মধ্যমণি, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ থাকে। বাবার প্রবল ব্যক্তিত্বের আড়ালে সুকান্ত প্রথমে ছায়াচ্ছন্ন হয়েছিল, এবারে দেখা গেল তার নিজেরও মতামতের দৃঢ়তা আছে। এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল, সেবন্তী ক্যারাম প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সোমনাথকে হারালেও নিজে শেষ রাউন্ডে হেরে গেলেন সুকান্তর কাছে। ছেলেমেয়েদের টুয়েন্টিনাইন শিখিয়ে সুকান্তকে পার্টনার নিয়ে তিনি জিতে গেলেন কিছুটা চোরামি করে।

রাকা তখন এত ছোট যে ক্যারাম বা তাস, কোনো খেলাতেই তাকে নেওয়া হয় না।

অনেক রকম খেলা জানেন সেবন্তী, অনেক ধাঁধা, অনেক মজার গল্প। সেইসব সময়ে রাকা বড় বড় চোখ মেলে দূরে বসে থাকে।

তিন দিন ছুটির পর সুকান্তকে বিদায় দেবার সময় বলে দেওয়া হলো, সে যেন প্রত্যেক ছুটিতে হস্টেল থেকে এখানে চলে আসে। তার পরের দু' মাস সে রকম কোনো বড় ছুটি নেই। সুকান্ত এলো না। সেবন্তী একদিন সোমনাথকে বললেন, চলো না। আমরা একবার ইটাচুনা ঘুরে আসি।

অন্যদের তুলনায় আদালতের ছুটি বেশি। সোমনাথের কোনো অসুবিধে নেই। নিজে গাড়ি কেনেননি বটে, কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর খুব খাতির। চাইলেই গাড়ি পেয়ে যান। দেবিকা-সুরেখা-তূণীরকে বুড়িমার জিম্মায় রেখে রাকাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সোমনাথ-সেবন্তী।

শ্রাবণ মাস, সারা রাস্তা ধরে শুধু বৃষ্টি। আগের রাতে খুব ঝড় হয়েছিল, এক জায়গায় প্রধান সড়কের ওপর আড়াআড়ি পড়েছিল একটা বড় গাছ। ঠিক যেন পথের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকা একজন অতিকায় মানুষ। সদ্য 'ছবিতে মহাভারত' পড়েছে রাকা, তার মনে হয়েছিল ঘটোৎকচের কথা। কেন কে জানে, সে যাত্রায় ঐ গাছটার কথাই মনে আছে রাকার। ইটাচুনায় সুকান্তর সঙ্গে দেখা, তার হস্টেলের ঘরটায় যাওয়া, এসব কিছু তার স্মৃতি থেকে বাদ পড়ে গেছে। সেবন্তী দ্রুত হাতে সুকান্তর ঘর গুছিয়ে দিচ্ছিলেন, নানা কৌটো ভর্তি বিস্কিট, আলুভাজা, চানাচুর, আচার সাজিয়ে দিয়েছিলেন তার দেয়াল আলমারিতে। সেই দিনটার কথা পরে যতবার ভাববার চেষ্টা করেছে রাকা, তার চোখে ভেসে উঠেছে রাস্তায় শুয়ে থাকা একটা মস্ত গাছ। হয়তো সেই প্রথম গাছের সঙ্গে মানুষের তুলনা তার মনে এসেছিল।

এবার আর ছ' সাত বছর পর নয়, মাত্র ছ' মাস বাদেই মধ্যপ্রদেশ থেকে আবার এসেছিলেন চন্দ্রমৌলি। ছেলের টানে। সুকান্তকে আনানো হলো ইটাচুনা থেকে, প্রথম তাকে দেখেই চন্দ্রমৌলি ধমক দিয়ে বললেন, চিঠি লিখিস না কেন? গত তিন মাসে আমি সাতখানা চিঠি লিখেছি, তুই একখানাও...

সেবারের কথা ভালোই মনে আছে রাকার। কারণ, বস্তারের জঙ্গল থেকে নিজে হাতে ধরা একটা ময়ূর নিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রমৌলি, রাকার জন্য। হ্যাঁ, রাকার জন্য। সবার সামনে রাকাকে বলেছিলেন, বিটিয়া, ইয়ে স্রিফ তুমহারে লিয়ে লায়া—।

সত্যিকরের একটা জ্যান্ত ময়ূর, তার লম্বা লেজ, ঠিক ছবিতে দেখা ময়ূরের পালক, তার গা-টা স্বপ্ন-স্বপ্ন, কিন্তু চোখ দুটি বড় বেশি তীক্ষ্ণ, যেন খানিকটা ক্রূর, এমন সুন্দর অথচ ধারালো প্রাণী রাকা আগে কখনো দেখেনি। এই ময়ূরটাকে ট্রেনে করে নিয়ে এসেছেন চন্দ্রমৌলি, তাও খাঁচায় ভরে নয়, পায়ে দড়ি বেঁধে। চন্দ্রমৌলির পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

চন্দ্রমৌলি জিজ্ঞেস করলেন, কী, তোমার পছন্দ হয়েছে?

রাকা উত্তর দেয়নি, তার সমস্ত মনোযোগ, এমনকি কণ্ঠস্বরও যেন আটকে আছে দু' চোখে।

দেবিকা-সুরেখা-তূণীররা ভিড় করে এসেছে, তাদের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রমৌলি বললেন, তোমরা সবাই দেখাশুনো করবে, বাট দিস ইজ আ গিফ্‌ট ফর দা লিট্‌ল প্রিনসেস!

সেই প্রথমবার চন্দ্রমৌলি রাকাকে বললেন লিট্‌ল প্রিনসেস। আগেরবার

বলেছিলেন পুতুল।

তূণীর জিজ্ঞেস করলো, ময়ূর কী করে পুষবো ? ময়ূর কী খায় ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, ময়ূর সাপ খেতে খুব ভালোবাসে। সাপ ধরে ধরে খাওয়াতে পারবে না ?

হা-হা করে খানিকটা হেসে তিনি আবার বললেন, ওর খাওয়ার জন্য তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। ও বাগান থেকে খুঁটে খুঁটে পোকা-মাকড় খেয়ে নেবে।

আগেরবারের মতনই চার-পাঁচ দিন খুব হৈ-চৈ করলেন চন্দ্রমৌলি, কিন্তু পিতা-পুত্রে তেমন যেন কোনো কথাই হলো না। চন্দ্রমৌলির আগমনে সুকান্ত আবার চুপসে গেছে, তার অস্তিত্ব সহজে টের পাওয়া যায় না। খেলাধুলোর সময়েও তাকে ডেকে আনতে হয়।

সেবারে শীতের শুরুতেই ওদের বাগানে ব্যাডমিন্টনের নেট টাঙানো হয়েছিল। তূণীর বেশ ভালো খেলে, দেবিকা-সুরেখা এখনো সেবন্তীর কাছে হেরে যায়। বিশ্বভারতী টিমের হয়ে একবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়েছিলেন সেবন্তী। যে-সব দিনে তাঁর চোখ দুটি দূরে চলে যায় না, সেইসব দিনে হাতে র‍্যাকেট নিয়ে তিনি দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠেন।

চন্দ্রমৌলি পুরোপুরি আউটডোর ম্যান। সব খেলাতেই তাঁর উৎসাহ আছে। তূণীরের কাছ থেকে র‍্যাকেটটা নিয়ে তিনি বললেন, এসো সোমনাথ, তুমি আর সেবন্তী ওদিকে যাও, আমি দেবিকাকে নিয়ে খেলছি, একটা মিক্‌স্‌ড ডাব্‌লস কম্পিটিশান হয়ে যাক।

সোমনাথকে ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে খেলতে নামায়, তিনি মোটামুটি শিখেছেন বটে, কিন্তু খানিকবাদে হাঁপিয়ে যান। তিনি পড়ুয়া মানুষ, রাত জেগে জেগে মামলার রায় লিখতে হয় লম্বা লম্বা, চোখের তেমন শক্তি নেই, চশমা ছাড়া অন্ধ। তিনি বললেন, ওরে বাপ রে, তোমাদের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারবো না। তার চেয়ে এক কাজ করো না, তুমি আর সুকান্ত, এদিকে সেবন্তী আর তূনীর, দুই ফ্যামিলিতে প্রতিযোগিতা হোক।

সুকান্ত তখন বাগানের অন্য এক কোণে রাকার সঙ্গে ময়ূরটাকে দেখছিল। ময়ূরের গায়ে হাত দিয়ে আদর করা যায় না, কামড়ে দিতে আসে। সুকান্ত ময়ূরটার একেবারে মুখের কাছে হাত নিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিল, ময়ূরটা ঠোক্‌রাবার চেষ্টা করেও বেশি দূর আসতে পারে না, তার পা বাঁধা।

এই খেলা থেকে সুকান্তকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যাডমিন্টন খেলায়। দেবিকা আর তূণীরের মধ্যে কে মায়ের সঙ্গে খেলবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব চললো একটুক্ষণ, দেবিকার ইচ্ছে মেয়েরা বনাম পুরুষেরা খেলা হবে। তূণীর তার দাবি ছাড়বে না, শেষ পর্যন্ত সোমনাথের কথায় দেবিকাকেই স্থান দিতে হলো। সোমনাথ জানেন, তূণীরকে প্রবোধ দেওয়া যাবে, কিন্তু দেবিকা বড় অভিমানী। অন্য তিনজন খেলোয়াড়ের তুলনায় চন্দ্রমৌলির মাথা অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। গুল্মভূমিতে যেন এক বনস্পতি। র‍্যাকেটটাকে তলোয়ারের মতন শাঁ শাঁ করে চালিয়ে তিনি একবার অনুকম্পার হাসি দিলেন। ব্যাডমিন্টন যদি বাহুবলের খেলা হতো, তাহলে অন্য পক্ষের জেতার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

সেবন্তী আঁচলটা কোমরে বেঁধে নিয়েছেন,--খালি পা, মাথার চুলে এলো খোঁপা। খেলার সময় তাঁর চঞ্চলা গতি দেখে বোঝাই যায় না বয়েস। অন্যদের মতন তিনি র‍্যাকেটটা উঁচু করে রাখেন না, সব সময় থাকে নীচের দিকে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, সেবন্তী, অনেকদিন আমার প্রাকটিস নেই, তবু গুণে গুণে তোমাদের তিন গেম হারাবো।

সেবন্তী সার্ভ করতে করতে বললেন, এই দেখুন, আমাদের প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে, ওয়ান লাভ !

সত্যি সে সার্ভ ফেরাতে পারলেন না চন্দ্রমৌলি ! পর পর তিন পয়েন্ট পেল মা-মেয়ে জুটি।

চন্দ্রমৌলি সুকান্তকে বললেন, ঠিক সে খেল্ বেটা !

সুকান্ত অনেকটা সামলে নিল। দু' পক্ষেরই পয়েন্ট যখন প্রায় সমান, সমান, দশ্-এগারো, তখন হঠাৎ একবার উঃ বলে বসে পড়লেন সেবন্তী। তাঁর পা মচকে গেছে ভেবে ছুটে দেখতে এলেন সোমনাথ। দেবিকা মায়ের পায়ের পাতা ডলে দিতে লাগলো।

চন্দ্রমৌলি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আর খেলতে পারবে না ? নির্ঘাৎ হেরে ভূত হতে !

সেবন্তী উঠে দাঁড়িয়ে আবার খেলা শুরু করলেন। ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতেই আবার তিনটি পয়েন্ট নিয়ে প্রায় জেতার মুখে এসেও সোজা কোর্টের বাইরে চলে যেতে যেতে বললেন, আর খেলবো না। আমার পায়ে লাগছে।

চন্দ্রমৌলি এবার দ্রুত কাছে এসে বললেন, আরে, আমি ভাবছিলাম বুঝি তুমি মজাক্ করছে। সত্যিই বেশি লেগেছে নাকি ?

সেবন্তী বললেন, না, সে রকম কিছু না। আপনারা খেলুন না। সুরেখা খেলুক।

খেলা অবশ্য আর তেমন জমলো না। এর পর ময়ূরটা সকলের মনোযোগ কেড়ে নিল। কী করে যেন যে খুঁটির সঙ্গে তার পায়ের দড়িটা বাঁধা ছিল, সেখানে গিঁটটা খুলে গেল, বুনো ময়ূর উড়াল দিল আকাশে। পালাতে পারলো না অবশ্য। তার পায়ের দড়িটা বেশ লম্বা, ভোঁ কাট্টা ঘুড়ির সুতোর মতন সেই দড়ি ঝুলতে লাগলো খানিকটা উঁচুতে, ছেলে-মেয়েরা ছোটাছুটি করতে করতে সেটা ধরে ফেলে ঠিক ঘুঁড়ির মতনই নামিয়ে আনলো ময়ূরটাকে।

তূণীর বললো, এটার জন্য একটা খাঁচা বানাতে হবে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, না, না, খাঁচাটাঁচার দরকার নেই। আর কয়েকদিন বেঁধে রেখে একটু চোখে চোখে রাখবে, ছাতু মেখে খাওয়াবে, তারপর দেখবে পোষ মেনে যাবে, দড়ি খুলে দিলেও এই বাগান ছেড়ে যাবে না।

দেবিকা জিজ্ঞেস করলো, মৌলিকাকা, এটা তো বাচ্চা নয়, বেশ বড় ময়ূর। এরকম জংলি ময়ূরটাকে তুমি ধরলে কী করে ?

জীবন একটা একটা করে নতুন ছবি জমায়। কোনো কোনো ছবিতে নতুন করে রং লাগে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও গাঢ় হয়।

বাগানের ওপর দিয়ে একটা ময়ূরের উড়ে যাওয়ার দৃশ্য রাকার কাছে এতই অভিনব, যে সেই বিস্ময়ের ঘোরে সে মায়ের পা মচকে যাওয়াটাকে যেন খেয়ালই করলো না। ময়ূরটাকে মাটিতে নামানোর পরেও সে যেন দেখছে যে এখনও ময়ূরটা উড়ছে, সে চাইছিল আরও অনেকক্ষণ উড়ুক।

এর পর চন্দ্রমৌলির গল্পটাও অবিস্মরণীয়। চন্দ্রমৌলি থাকেন অনেক দূরের এক জঙ্গলে, সেই অদেখা জঙ্গল রাকার কাছে খুব ভয়াল, গহন মনে হয়। চন্দ্রমৌলি কথায় মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হিন্দি শব্দ ব্যবহার করেন, ময়ূরকে বলেন মোর, হরিণকে বলেন হিরণ, তাই এত কাছে দেখেও মনে হয় এই মানুষটার অনেকটাই অচেনা।

বাগানের ঘাসের ওপর বসে পড়ে, একটা চুরুট ধরিয়ে চন্দ্রমৌলি বললেন, এত বড় মোর জ্যান্ত ধরা খুব শক্ত। জাল ফেলে ধরা যায়। আদিবাসীরা তীর-ধনুক দিয়ে মারে। মারিয়া আর মুরিয়া ট্রাইব আছে ওখানে, তাদের চাষের খেতে মোর ঢুকে পড়লে ওরা চারদিক থেকে ঘিরে ধরে লাঠিপেটা করে।

দেবিকা জোরে শ্বাস টেনে বললো, ইস, ওরা ময়ূর মেরে মাংস খায় ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, মোরের মাং·ন খুব টেস্টফুল। ওরা আমাকে খাইয়েছে।

সুরেখা বললো, ময়ূর মারা তো নিষেধ। ন্যাশনাল বার্ড।

চন্দ্রমৌলি বললেন, ওসব দিল্লির নিয়মকানুন বস্তারের জঙ্গলে পৌঁছোয় না।

অন্যরা চন্দ্রমৌলিকে ঘিরে বসেছে, সুকান্ত খানিকটা দূরে, সে একটা একটা ঘাস ছিঁড়ে ভেতরের শাঁস চিবোচ্ছে।

রাকা একবার মুখ তুলে দেখলো, ওপরে কোণের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে মা।

চন্দ্রমৌলি বললেন, আমি তো এটাকে জ্যান্ত ধরতে চেয়েছিলাম। ওখানকার ময়ূরগুলো বেশ জোরে উড়তে পারে। একটা পেড় থেকে আর একটা পেড়ে উড়ে যায়। তবে লক্ষ করলে দেখবে, এরা এক একটা বিশেষ পেড়, মানে গাছকে পছন্দ করে। আই অ্যাম সরি, তোমরা তো পেড় সমঝো না। ব্যাম্বু গ্রোভ কাকে বলে জানো ? বাংলায় বলে বাঁশঝাড়। সেই রকম একটা বাঁশঝাড় কাটাই হচ্ছিল, আমি তাঁবু খাটিয়ে আছি, সেখানে অনেক বড় বড় গাছ আছে, কিন্তু দেখলাম, একটা মস্ত গুলমোর গাছে এই মোরটা কোথা থেকে রোজ বিকেলবেলা উড়ে আসে আর পিঁয়াও পিঁয়াও করে ডাকতে থাকে। একদিন ঠিক করলাম, এ শালাকে পাকড়াতে হবে।

দেবিকা ও সুরেখা মুখ নিচু করলো। এ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে শালা শব্দটা নিষিদ্ধ। চন্দ্রমৌলি তা জানেন না, জানলেও বোধহয় মানবেন না। রাকা ভেবেছিল, এ সময় এখানে মা উপস্থিত থাকলে কী বলতেন ?

দেবিকা জিজ্ঞেস করলো, এটা ছেলে না মেয়ে ? মানে, ময়ূর না ময়ূরী ?

চন্দ্রমৌলি, চোখ টিপে মজার ভঙ্গি করে বললেন, এর সুরৎ দেখে বুঝতে পারিসনি ? বেটী, তোরা খুব ভাগ্যবতী, পুরুষরা তোদের রূপের তোয়াজ করে হাত কচলাচ্ছে। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে পুরুষরাই সুন্দর, মেয়েগুলো কুচ্ছিত হয়।

তূণীর জিজ্ঞেস করলো, কী করে ধরলেন, ময়ূর তো ঠুকরে দেয় ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, আমার মোটা দস্তানা আছে। দু' হাতে দস্তানা পরে একবার একটা নেউল পাকড়েছিলাম। সেদিনও দস্তানা হাতে লাগিয়ে গুলমোর গাছটার একটা ডালে বসে রইলাম ছিপাকে প্রায় আধ ঘণ্টা বসতে

হয়েছিল, হঠাৎ শাঁ শাঁ করে একটা ডাকোটা প্লেনের মতন এই মোরটা উড়ে এলো, বিকেল তখন শেষ হচ্ছে, যেই বসতে যাবে, আমি আগে চেপে ধরলাম ওর মুখ, আর এক হাতে পা। এত বড় পাখি, এর গায়ে কী জোর, সেটা আগে বুঝতে পারিনি! এইসান ঝটাপটি করতে লাগলো, আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারি না। দুটো হাতই এনগেজ্ড, নামবো কী করে? একবার মনে হলো, আমাকে শুদ্ধ গাছ থেকে ফেলে দেবে।

সবাই উদগ্রীব। সবাই দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা। একটা কৃষ্ণচূড়ার ডালে চন্দ্রমৌলি দু' হাতে চেপে ধরে আছেন জঙ্গলের সবচেয়ে বড় এক স্বাধীন পাখিকে, সে মুক্তি পাবার জন্য ঝটাপটি করছে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, ভুল করে সঙ্গে দড়ি নিয়ে যাইনি যে ব্যাটাকে বাঁধবো। তখন চিল্লামিল্লি করে ডাকলাম গাছ-কাটা কুলিদের। কয়েকজন কুলি ছুটে এলে, আমি তাদের বললাম, তাঁবু থেকে আমার খাটিয়াটা নিয়ে আয়, এই গাছের তলায় পেতে দে। সে খাটিয়ায় নতুন নেয়ারের দড়ি বাঁধা হয়েছে, বেশ মজবুত আছে, ওরা গাছতলায় সেটা পেতে দেবার পর বললাম, তোরা সব সরে যা। তারপর আমি জয় বজরংবলি পুকার দিয়ে দিলাম ঝাঁপ!

দু' হাতে ময়ূরটাকে ধরে গাছ থেকে লাফ মেরেছেন চন্দ্রমৌলি, তিনি এখন শূন্যে, একটু একটু করে পড়ছেন, খাটিয়ার নেয়ারের দড়ি যেন স্প্রিং-এর মতন, তার ওপর পড়ে আর একবার একটুখানি উঁচুতে উঠলেন তিনি, তারপর হাঁটু মুড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। যেন একটা স্লো মোশন মুভি দেখছে এই কিশোর কিশোরীরা এবং একটি বালিকা।

এই রোমহর্ষক কাহিনীটি কতটা সত্য আর কতটা অতিরঞ্জিত তা আর কোনোদিন জানা যায়নি। কিন্তু রক্তিম-সোনালি কুসুমে ভরা একটা গাছ থেকে ময়ূরকণ্ঠী রঙা একটা ময়ূরকে বুকে চেপে ধরে চন্দ্রমৌলি শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছেন, সে দৃশ্যটা গেঁথে গেল সকলের মনে। একটুও অবিশ্বাস্য মনে হলো না।

অভিভূত অবস্থার কিছুটা পরে রাকা জিজ্ঞেস করলো, তুমি ময়ূরটা ধরলে কেন?

চন্দ্রমৌলি অবাক হলেন। খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার জন্য লিট্ল প্রিন্সেস! তোমার জন্য এনেছি, তুমি খুশি হওনি?

রাকা কী করে বোঝাবে যে ময়ূরটা তার নাম করে দেওয়া হয়েছে বলে সে খুবই খুশি হয়েছে। বাগানে একটা ময়ূর রয়েছে বলে তার ভালো লাগছে, স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে সে কত গর্ব করেছে, তবু, একথাও তার মনে হচ্ছে,

ময়ূরটাকে না ধরলেই ভালো হতো, বস্তারের জঙ্গলে আপন মনে উড়ে বেড়ালে তাকে বেশি সুন্দর দেখাতো।

সেবারে যাবার সময় চন্দ্রমৌলি বললেন, আবার যখন আসবো, একটা হরিণের বাচ্চা নিয়ে আসবো!

সোমনাথ বললেন, তুমি আমার বাড়িটাকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলবে নাকি, মৌলি?

এর পর দু' বছরের মধ্যে চন্দ্রমৌলি আর আসতে পারেননি এদিকে।

সোমনাথকে তিনি নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সে চিঠিতে অভিযোগ থাকতো, সুকান্ত সব চিঠির উত্তর দেয় না। নিজের খবর জানায় না। এ বাড়ির সবাই লক্ষ করেছিল, সুকান্ত লম্বা ছুটির সময়ও যেতে চায় না বাবার কাছে। সে এ বাড়িতে এসে থাকে কিংবা কলকাতায় যায়, একবার এক বন্ধুর মা বাবার সঙ্গে ঘুরে এলো বম্বে।

স্কুল শেষ করার পর সুকান্ত ভর্তি হলো ইটাচুনা কলেজে। চন্দ্রমৌলি তাঁর ছেলেকে ডাক্তারি-এঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন সুকান্ত বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বি-এসসি পাশ করুক। বটানি-বায়োলজি খানিকটা শিখে বস্তারে চলে এসে সে পৈতৃক ব্যবসায় যোগ দিলে তাকে আর উপার্জনের চিন্তা করতে হবে না। চন্দ্রমৌলি জঙ্গলকে ভালোবাসেন ঠিকই, আবার সেই জঙ্গলই তাঁর জীবিকা ছিল, তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছলতার চেয়ে কিছু বেশি। দণ্ডকারণ্যের একাধিক মেধাবী উদ্বাস্তু ছাত্রের তিনি উচ্চ শিক্ষার খরচ চালান, সে কথা তিনি নিজে কখনো জানাননি, জানা গিয়েছিল অনেক পরে।

সুকান্ত ইটাচুনা কলেজে পড়লো মাত্র এক বছর। তারপর সে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে মনোনীত হয়ে চলে গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোমনাথকে এসে বললো, আমার বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পড়তে ভালো লাগে না, এটা আপনি বাবাকে জানান। যাদবপুরে পড়ার খরচ বাবাকে দিতে হবে না, আমি নিজেই জোগাড় করবো।

সোমনাথ কখনো জোর দিয়ে সুকান্তকে বস্তারে ছুটি কাটাতে যেতে বলেননি, সুকান্ত কেন যেতে চায় না, তা একমাত্র তিনিই জানতেন। কিন্তু এবার দৃঢ় স্বরে বললেন, ঠিক আছে, তোমার এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ইচ্ছে হয় পড়ো, তোমার বাবাকে আমি রাজি করাবো, কিন্তু তুমি উঞ্ছবৃত্তি করে পড়ার খরচ জোগাড় করতে পারবে না, তোমার বাবার অনেক টাকা আমার কাছে জমা

আছে, তুমি মাসে মাসে আমার কাছ থেকে টাকা নেবে। তোমাকে মন দিয়ে পড়তে হবে।

সুকান্তর সঙ্গে এ-বাড়ির যোগাযোগ রয়েই গেল। একতলার একটি ঘর গেস্ট রুম হিসেবে সাজানো আছে। সেখানা যেন সুকান্তরই ঘর। কখনো সে তার কলেজের দু' একজন বন্ধুকেও সঙ্গে এনে এ ঘরে থেকেছে। সেই বন্ধুদের একজনের নাম ইন্দ্রজিৎ, সুকান্তর তুলনায় সে অনেক বেশি দুর্বোধ্য মানুষ।

সোমনাথের কাছে চিঠি লিখতেন চন্দ্রমৌলি, তার মধ্যে একবার রাকার জন্যও একটা চিঠি ছিল। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দ বলে ফেললেও চন্দ্রমৌলির চিঠির বাংলা নির্ভুল, পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ছোট্ট রাজকুমারী, ময়ূরটার খবর কী?

ওপরে টানা টানা মাত্রা দিয়ে, গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা লিখতে শেখার পর রাকা এ পর্যন্ত চিঠি লিখেছে শুধু তার চন্দননগরের দিদিমাকে বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে। মা যা বলে দিতেন তাই লিখেছে। চন্দ্রমৌলিকে উত্তরই প্রকৃতপক্ষে রাকার প্রথম চিঠি। লাইন টানা কাগজের পৃষ্ঠার দু' দিকে লেখা সেই চিঠি যেন এক বালিকার ময়ূর বিষয়ক রচনা। শুধু শেষ লাইনে চন্দ্রমৌলির প্রতি প্রশ্ন ছিল, তুমি আবার কবে আসবে? তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

ময়ূরটা অবশ্য ততদিনে আর বাস্তবে নেই, আছে শুধু কল্পনায়। চন্দ্রমৌলি ফিরে যাবার ন' দশ দিনের মধ্যেই সেই ময়ূর আবার পায়ের দড়ি খুলে উড়ে পালালো। কখন গেল কেউ দেখেনি, শুধু লেজের একটি লম্বা পালক খসিয়ে ফেলে রেখে সে উড়ে গেছে। রাকার ধারণা, একটার পর একটা গাছ পার হয়ে, আকাশের পথ চিনে চিনে সেই ময়ূর উড়ে যাচ্ছে বস্তারের জঙ্গলের দিকে। শুধু পালকটি সে ইচ্ছে করেই রেখে গিয়েছিল রাকার জন্য।

সেই পালকটি দারুণ মোহে ও আদরে রেখে দিয়েছিল রাকা। যৌবন উত্তীর্ণ হবার পরেও সেটা সে হারায়নি, পালকটিও মলিন হয়নি।

দু' বছর পর যেবার এলেন চন্দ্রমৌলি, সেবারে তিনি হরিণ-শিশু আনেননি, বোধহয় সে প্রতিশ্রুতি তাঁর মনেও নেই, এলেন মাত্র এক্‌বেলার জন্য। সেবারে তাঁকে বেশ গম্ভীর মনে হয়েছিল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প-খেলার সময় পেলেন না, তাদের অবজ্ঞাও করলেন না অবশ্য, প্রত্যেকের থুতনি ছুঁয়ে আদর করলেন, প্রত্যেকের হাতে একশোটা করে টাকা দিলেন পুজোর উপহারের জন্য, তারপর সোমনাথের সঙ্গে ব্যাপৃত রইলেন গভীর কোনো আলোচনায়।

বিকেলের ট্রেনে ফিরে যাবার পর জানা গেল চন্দ্রমৌলি তাঁর কাঠের ব্যবসা অন্য একজনের কাছে জমা দিয়ে আফ্রিকায় চলে যাচ্ছেন। উগাণ্ডায় থাকবেন কিছু দিন। সোমনাথ এই সন্দেহও ব্যক্ত করলেন যে, চন্দ্রমৌলি হয়তো আর ফিরবেনই না।

সুকান্তর সঙ্গে সেবার দেখাই হলো না চন্দ্রমৌলির। ছেলের জন্য তিনি একটা মুখবন্ধ খামের চিঠি রেখে গিয়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে সুকান্ত যখন এলো, দেবিকা সেই খামটা তুলে দিল সুকান্তকে। সুকান্ত উল্টেপাল্টে দেখলো, কিন্তু খুললো না।

পরদিন সকালে রাকা শুনতে পেল দেবিকা ফিসফিস করে সুরেখাকে বলছে, কী অদ্ভুত ছেলে ঐ সুকান্ত, ওর বাবা চিঠি দিয়ে গেছেন, ও এখনো সেটা খুলেই দেখলো না। একটু আগেও দেখলাম, ওর টেবিলে খামটা সেই রকম অবস্থাতেই পড়ে আছে!

সুরেখা জিজ্ঞেস করলো, সুকান্ত এর মধ্যে উঠেছে ঘুম থেকে? এখানে এসে তো অনেক বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

দেবিকা বললো, না, এখনো ওঠেনি।

সুরেখা একটা অন্য রকম ইঙ্গিত দিয়ে বললো, তাহলে তুই এত সাত-সকালে ও ঘরে গিয়েছিলি কেন?

দেবিকা বললো, বেশ করেছি গেছি। ও ঘরে কাল আমার একটা খাতা ফেলে এসেছি না?

দেবিকা সুরেখার সঙ্গে এখন ~~সুকান্তর~~ বেশ বন্ধুত্ব। তৃণীর খেলা নিয়ে মত্ত, সে প্রায় সময়টায় বাইরে বাইরে কাটায়, তা ছাড়া তার অন্য বন্ধু আছে।

একতলার ঘরে দুই বোন সুকান্তর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী গল্প করে কে জানে। কখনো রাকা সেখানে গিয়ে পড়লে ওরা হাসাহাসি থামিয়ে চুপ করে যায়, তারপর কিছু একটা কাজের ছুতোয় দেবিকা বা সুরেখা তাকে ওপরে পাঠিয়ে দেয়। তারপরেও রাকা থাকতে চাইলে ওরা গল্পের বদলে ক্যারাম খেলতে বসে।

ঐ দুই বোনের মধ্যে দেবিকা একটু সরল সরল ভালো মানুষ ধরনের, সুরেখার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। সুরেখার তুলনায় দেবিকার চেহারা বেশি চোখ টানে, দেবিকার মুখ থেকে ঝরে পড়ে লাবণ্য। সুরেখার মুখখানা শুকনো ধরনের, তবু কথা বলার সময় ওদের বয়েসী ছেলেরা তাকিয়ে থাকে সুরেখারই দিকে। সুরেখার চোখের ভাষা বোঝা সহজ নয়।

দুই দিদিই সবটা সময় অধিকার করে থাকে বলে সুকান্তর সঙ্গে রাকার তেমন ভাব জমলো না। একা একা সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় রাকা। কখনো রান্না ঘরে বুড়িমা'র পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, কখনো শেলাই নিয়ে ব্যস্ত মায়ের ঘরে উঁকি মারে, কখনো সে নিজের ঘরের মেঝেতে কাগজ ছড়িয়ে ছবি আঁকতে বসে।

সুরেখার বিয়ে হয়ে গেল সিউড়ির এক অধ্যাপকের সঙ্গে। কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া পাত্র, সব দিক থেকেই বেশ মনোমতন, বেশি দূরেও না, সুরেখা যখন তখন চলে আসতে পারবে বর্ধমানে। দেবিকার বিয়ে দু'জায়গায় ঠিক হয়েও ভেঙে গেল, তারপর তার উপযুক্ত বর পাওয়া গেল আসামের জঙ্গলে।

সেবারে গরমের ছুটিতে সবাই মিলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল মাঁনসের জঙ্গলে।

তার কিছুদিন আগে সোমনাথকে ট্রান্সফার করা হয়েছে চুঁচুড়ায়। সেখানে গঙ্গার কিনারে তাঁকে ভালো কোয়ার্টার দেওয়া হলেও সোমনাথ বর্ধমানের এ বাড়ি ছাড়লেন না। চন্দ্রমৌলির কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে সোমনাথ এই চমৎকার বাড়িটা কিনে নিয়েছেন, সেবন্তীও এ বাড়ি ছেড়ে চুঁচুড়ায় যেতে চান না। এখান থেকেই প্রতিদিন সোমনাথকে যাতায়াত করতে হয় ট্রেনে। একদিন আদালত থেকে বেরিয়ে সরকারি গাড়ি পাননি সোমনাথ, একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে চুঁচুড়া স্টেশনের দিকে আসছিলেন বিকেলবেলা, হঠাৎ তাঁর সাইকেল রিক্সার ওপর একটা বোমা পড়লো।

তখন নক্শালপন্থী যুব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়েছে সারা পশ্চিমবাংলায়, তাদের হাতে কিছু অস্ত্র এসেছে। একটা কিছু প্রবল ভাঙচুরের জন্য নিশপিশ করছে তাদের হাত। ঠিক মতন অস্ত্র চালাতে তারা শেখেনি, কোথায় কখন কার ওপরে অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করবে সে বিষয়েও তাদের মতের স্থিরতা নেই, আবার হাতের অস্ত্র বেশিদিন নিষ্ক্রিয় রাখাও যায় না। সোমনাথের মতন একজন নিরীহ সরকারি বিচারককে মারার কথা কে বা কেন ঠিক করেছিল কে জানে!

রিক্সা থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছিলেন সোমনাথ, সে জন্য মাথায় কিছুটা চোট লেগেছিল, কিন্তু বোমার আঘাত তাঁর লাগেনি, বরং বেশি আহত হয়েছিল রিক্সাওয়ালাটি। যার রোজগারের জন্য বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ের সাতটি মুখ হাঁ করে থাকে।

এর পরেই সোমনাথ ছ'মাসের ছুটি নিলেন এবং আবার অন্য জায়গায়

ট্রান্সফার না করলে চাকরি ছেড়েই দেবেন ঠিক করেছিলেন।

তখনই কিছুদিন বর্ধমান থেকে দূরে থাকার জন্য চন্দননগরে কাটানো হলো কয়েক সপ্তাহ, তারপর বেড়াতে যাওয়া হলো আসামে। সেবন্তীর দাদা এক সময় চাকরি করেছেন আসামে, সেখানে তাঁর অনেক চেনাশুনো, তিনি মানস ফরেস্টে ডাক বাংলো ঠিক করে দিলেন। সুকান্ত তো প্রায় এই পরিবারেরই একজন, সেও এলো সঙ্গে।

মানসের জঙ্গলে প্রচুর ময়ূর আছে। প্রথম ময়ূরের ডাক শুনেই রাকার মনে পড়েছিল তাদের পলাতক ময়ূরটার কথা। তারপর তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, জঙ্গল এত ভালো, জঙ্গলে বেড়াবার কী অপূর্ব আনন্দ, তাহলে কেন বস্তারের জঙ্গলে তারা একবারও বেড়াতে যায়নি ? এখন না হয় চন্দ্রমৌলি সেখানে নেই, তিনি উগান্ডাতে রয়ে গেছেন, চিঠিও লেখেন না, কিন্তু যখন তিনি থাকতেন সেখানে, তখনও কেন যাওয়া হয়নি ?

সুকান্তকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের বস্তারের জঙ্গল ভালো, না এটা ভালো ?

বিনা দ্বিধায় সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, এ জঙ্গলটা এত চমৎকার যে বস্তারের সঙ্গে তুলনাই চলে না !

সুকান্ত তখনো এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেনি, তা ছাড়া সে দেবিকা-সুরেখার সমবয়েসী, তাই ওদের কারুর সঙ্গে তার বিয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। এখানেই আলাপ হলো আর একটি পরিবারের সঙ্গে। তাদের মধ্যে রয়েছে একটি সুদর্শন যুবা, পাঁচ বছর আগে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সে ভালো চাকরি করছে রাঁচিতে। প্রায় প্রথম আলাপেই সে মনোহরণ করে নিল দেবিকার। ছেলেটির নাম সুরঞ্জন, তার মা ও দিদি-জামাইবাবুও রয়েছেন সঙ্গে, বলতে গেলে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেল সেখানেই।

দেবিকার বিয়েটা যথেষ্ট ধুমধামের সঙ্গেই হলো চন্দননগরের মামাবাড়িতে। সেবন্তীর মন তখন বাষ্পে ভরা, কিছুতেই তাঁর মুখ দিয়ে কথা ফোটে না, মুখে বিষাদের মেঘলা ছায়া : পাছে পাত্রীর মাকে পাত্রপক্ষের সবাই পাগল মনে করে তাই সোমনাথের সনির্বন্ধ অনুরোধে সেবন্তী প্রাণপণে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলেন। চন্দননগরের বাড়িতে আরও অনেক মহিলা ছিলেন, নির্বিঘ্নে শুভকাজ সামলে দিলেন তাঁরা।

সোমনাথের আবার পোস্টিং হলো বর্ধমানেই, আবার ফিরে আসা হলো এ বাড়িতে। একজন আর্মড গার্ড বসলো গেটের সামনে।

দেবিকা-সুরেখা নেই, বাড়িটা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। আগের তুলনায় অনেক বড় আর শূন্য।

এর মধ্যে বুড়িমা একবারও এ বাড়ি ছেড়ে যাননি। আর ধীরেন নামে কর্মচারিটি এসে থাকতো একতলায়। কয়েকখানা ঘরের তালা খোলা হয়নি অনেকদিন। সেবন্তী মাঝে মাঝে ভুল করে দেবিকা-সুরেখার ডাক নাম ধরে ডেকে ওঠেন।

অনেকদিন স্কুলে যায়নি রাকা, কিন্তু তার নাম কেটে দেওয়া হয়নি। সে নিজের পুরোনো স্কুল থেকেই ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেল। আবার দেখা হলো ক্লাসের বান্ধবীদের সঙ্গে, তাপসী আগের চেয়েও একটু রোগা হয়েছে, পড়াশুনোর কথা ছাড়া সে আর কোনো কিছুই ভাবে না, তাকে স্কলারশীপ পেতেই হবে। একদিন তাপসীদের বাড়িতে গিয়ে রাকা দেখলো, বড় ঘরটায় সেতার-হারমোনিয়াম-ঘুঙুর ছড়ানো, তাপসীর বাবা একা একা ধপাধপ করে তবলা বাজাচ্ছেন, একটিও ছাত্র-ছাত্রী নেই। তাপসীর মা কী যেন বলছেন, সরু গলায় নিশ্চিত কোনো অনুযোগ বা গঞ্জনা, তাপসীর বাবা আরও জোরে জোরে চাঁটি মারতে মারতে হাসি মুখে, মাথা নাড়তে নাড়তে বলছেন, শুনতে পাচ্ছি না, কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

লুঙ্গিটা উরুর কাছে গোটানো, ছেঁড়া গেঞ্জিও আর নেই, খালি গা, রোমহীন বুকের মাঝখানটা যেন ভেতর দিকে ঢোকানো। পাশে একটা বাঙলা মদের বোতল।

রাকাকে দেখে তিনি বললেন, এই তো একটা ফুটফুটে মেয়ে এসেছে। অ্যাই খুকি, তুই আমার কাছে গান শিখবি ? নাচ ? সেতার ? বেশি না, মাসে মাত্তর পঞ্চাশটা টাকা দিলেই হবে।

তাপসীদের এ বাড়িতে রাকা এর পরে আর মাত্র একবারই এসেছিল।

সেবন্তীর জন্য দু'জন ডাক্তার আনাগোনা করেন। তাদের চিকিৎসায় কোনো সুফলই দেখা দিচ্ছে না। দু'জন ডাক্তারেরই অভিমত, কিছুদিনের জন্য অন্তত সেবন্তীকে কোনো নার্সিং হোমে রাখা দরকার, অথবা নিয়ে যাওয়া উচিত কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায়, পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে।

সোমনাথ তাঁর স্ত্রীকে নার্সিং হোমে পাঠাতে রাজি নন। সদ্য ছ'মাসের ছুটি শেষ হয়েছে, এখন আবার পাহাড় বা সমুদ্রতীরে যাবেনই বা কী করে ? সেবন্তীকে কে নিয়ে যাবে ? তূণীর আর রাকা দু'জনেরই এখন বেশি পড়াশুনো করার বয়েস।

মা কোনো কথা বলেন না, কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেন না বলে তূণীরও আর মায়ের কাছে বেশি আসে না। তা ছাড়া পারিবারিক গণ্ডি ছিন্ন করে ছেলেরা এই সময় বাইরের পৃথিবীতে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়, মা-বাবা-ভাই-বোনের চেয়ে এই সময় দু'একজন শিক্ষক বা সমবয়েসী বন্ধুরাই প্রধান হয়ে ওঠে, বাড়ির দিকে তাকাবারও সময় থাকে না। দিনের পর দিন মায়ের সঙ্গে দেখাই হয় না তূণীরের। রাকা তবু আসে। মা কোনো কথা না বললেও সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো দুধ কিংবা জলখাবার জোর করে মাকে খাওয়াবার চেষ্টা করে। একমাত্র চা খেতে সেবন্তীর আপত্তি নেই, দিনে দশ-বারো কাপ চা দিলেও তিনি খেয়ে নেবেন, কিন্তু অন্য কোনো খাবারে রুচি নেই। বাড়িতে নিত্য-নতুন ধরনের খাবার বানাবার চেষ্টা হয় সেবন্তীর জন্য, কিংবা কলকাতা থেকে আনানো হয় মিষ্টি, ভালো ভালো ফল। বুড়িমা প্লেটে করে সে সব সাজিয়ে দিয়ে রাকাকে বলেন, তুই যা তো, খুকি, জোর করে খাওয়াবি মাকে, তোর হাতে ঠিক খাবে। সেবন্তী তাও খেতে চান না, বার বার প্লেট সরিয়ে দিলে রাকার চোখে জল এসে যায়।

তবু রাকা অনুভব করে, আগে মায়ের প্রতি যেমন একটা চুম্বকের মতন টান ছিল, এখন সেটা যেন আলগা হয়ে আসছে। তূণীরের মতন তাকেও বাইরের পৃথিবী ডাকছে। সে পুরোপুরি যেতে না পারলেও যাবার জন্য ছটফট করে। এখন মাকে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়াবার চেষ্টা করতে করতে যদি সোমনাথ এসে পড়েন, রাকা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, সে নিজের ঘরে চলে যায়।

সোমনাথের কোনো ক্লান্তি নেই, সামান্যতম বিরক্তিও নেই।

অফিসের কাজের সময় ছাড়া তিনি বাকি সময়ের অধিকাংশটাই রাখেন স্ত্রীর জন্য। সেবন্তীর মাথায় কোনো দোষ হয়েছে, তা সোমনাথ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতে চান। সেবন্তী কখনো কোনো জিনিসপত্র ভাঙেন না, কারুকে আক্রমণ করেন না, বাইরের কোনো মানুষের সামনে বিকৃত আচরণ করেন না, তা হলে তাঁকে পাগল বলা হবে কেন? তিনি কথা বলতে চান না, আহারে রুচি নেই, কখনো কখনো বিরলে রোদন করেন, এ সব তো কারুর কারুর চরিত্রের অন্তর্গত হতে পারে। অন্যদের তুলনায় তাঁর স্ত্রী বেশি ইনট্রোভার্ট। নার্সিং হোমে পাঠালে সেখানকার লোকেরা ওঁকে সত্যিকারের পাগল করে দেবে!

একদিন দুপুরে রাকা শুনতে পেল তার মা তাকে ডাকছেন।

বছরের পর বছর এরকম ডাক শোনেনি রাকা। এমনই অভাবনীয় যে সে বিশ্বাস করতেই পারছে না। সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেবন্তীর তীক্ষ্ণ

কণ্ঠস্বর, রাকা, রাকা, রাকা, তুই কোথায় ?

বুড়িমা ঘুমোয় এই সময়। বাড়িতে আর কেউ নেই। গরমকালে এক তলার ঘরটা ঠাণ্ডা থাকে বলে রাকা সেখানে বসে পড়াশুনো করছিল। বিছানার ওপর ছড়ানো বইপত্র, মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রাকা, মেঝেতে বসে কোনো উঁচু জায়গায় বই রেখে পড়তে পছন্দ করে সে।

মায়ের সেই ডাক শুনে তার বুক কেঁপে উঠলো। নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে, আগুন লেগে গেছে নাকি ? পড়ি মরি করে ছুটে ওপরে চলে এলো সে। মায়ের ঘরের দরজার কাছে এসে সে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সেবন্তীর আজ এ কী অদ্ভুত রূপ ! সমস্ত জানলা খোলা, রোদ্দুরে ঝলমল করছে ঘর। একটা ফিকে গোলাপি সিল্কের শাড়ি পরে ড্রেসিং টেবলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেবন্তী। মাথায় বেঁধেছেন একটা মস্ত খোঁপা, সারা মুখে পাউডার, ঠোঁটে টকটকে রক্তের মতন লিপস্টিক, একটা আইলাইনার নিয়ে ভুরু আঁকছেন সেবন্তী। তাঁর শাড়ির আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে, লো-কাট ব্লাউজে দেখা যাচ্ছে তাঁর বুকের আভা।

মাকে এরকম সাজে কখনো দেখেইনি রাকা। এ যেন মা নয়, চোখে সর্বনাশ ঝলসানো এক যুবতী !

আয়নায় মেয়েকে দেখতে পেয়েই পিছন ফিরে ছুটে এলেন সেবন্তী, তাকে জড়িয়ে ধরে হাসি-কান্না মেলানো গলায় বলতে লাগলেন, রাকা, রাকা, রাকা সোনা আমার, কোথায় ছিলি, তোকে না দেখে যে আমি থাকতে পারি না !

খুব জোরে রাকাকে বুকে চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে আদর করতে লাগলেন সেবন্তী, রাকা অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো। একটা বয়েস পর্যন্ত সে মায়ের একটু আদর, একটু মনোযোগ পাবার জন্য গা ঘেঁষে এসে বসতো, এখন রাকা সদ্য ষোলো বছর পেরিয়েছে, এখন সে যে মায়ের কোল-বুক ছাড়িয়ে গেছে। আর এ যে অনভ্যেসের আদর !

রাকা নিজেকে ছাড়িয়ে একটু দূরে সরে গেলেও সেবন্তী তার দুটি হাত ধরে রইলেন। রাকার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে সেবন্তীর মুখখানা যেন মোমের পুতুলের মতন গলে যেতে লাগলো। তিনি অসহায় গলায় বললেন, আমার এ কী হচ্ছে রে, রাকা ? সবাই বুঝি আমাকে পাগল বলে ?

রাকা বললো, না, না, মা, কেউ তা বলে না।

সেবন্তীর দৃষ্টি ভিজে গেছে, রাকার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা দেয়ালে হেলান দিলেন, যেন তাঁর পায়ে জোর নেই। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, কেন আমি এরকম হয়ে গেলাম? আমাকে ধরে রাখতে পারলি না? আমি কারুর সঙ্গে মিশতে পারি না, কথা বলতে ভয় হয়! আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি!

হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রায় দু'তিন মিনিট চুপ করে রইলেন। তাঁর ভেতরে যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে সেই কষ্টকে তিনি বাইরে মুক্তি দিতে পারছেন না!

আবার মুখ তুলে বললেন, আমি কি দেখতে খুব খারাপ হয়ে গেছি? আর কোনোদিন আমি...রাকা, রাকা, তোকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভয়, তুই, তুই, আমার সর্বনাশ করে দিলি, তুই, আমার রাকা, তোকে এত ভালোবাসি, কিন্তু তোর জন্যই আমি...

রাকা অসম্ভব চমকে গেল, সে কিছুই বুঝতে পারলো না।

সে এবার ছুটে এসে সেবন্তীকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, না, না, মা, আমি তোমার কী করেছি? আমি তো কিছু করিনি।

এরপর দু' জনেরই শুধু কান্না। রাকা আর কোনো কথা খুঁজে পেল না।

অনেক দিন পর রাকা ভেবেছে, মা ঐ রকম একটা অদ্ভুত কথা বলার পর রাকা কেন ঠিক ঠিক উত্তরটা জানতো না তখন? তা হলে সে মাকে কিছুতেই চলে যেতে দিত না।

সেই রাতেই আত্মহত্যা করেন সেবন্তী। কারুকে কিছু জানতে দেননি, অনেক দিন ধরে জমানো পঁয়ষট্টিটা ঘুমের বড়ি খেয়ে শুলেন, আর জাগলেন না। নিজের সঙ্গে অনেক দিন ধরে লড়াই চালিয়ে আগেই হেরে বসেছিলেন, অতি কষ্টে সামলে রেখেছিলেন দেবিকা-সুরেখার বিয়ে পর্যন্ত, আর পারলেন না।

সেবন্তীর মৃত্যুতে শোক করার চেয়েও প্রথম দিকে প্রধান হয়ে পড়েছিল তাঁর আত্মহত্যার ব্যাপারটা গোপন করা। মৃতদেহ যাতে পোস্টমর্টেমে পাঠানো না হয়, সে জন্য সোমনাথকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। সেবন্তীর দু'জন নিয়মিত চিকিৎসকের মধ্যে যিনি বেশ বৃদ্ধ, যাঁর বয়েস এবং চোখের অবস্থার জন্য প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবার সময় এসেছে, তাঁকে সত্যি কথা জানিয়ে, অনেক অনুরোধ করে সোমনাথ স্বাভাবিক মৃত্যুর ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়েছিলেন।

দেবিকা-সুরঞ্জন, সুরেখা-মোহিত চলে এসেছিল খবর পেয়ে। দুই বোন কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে ফিসফিস করেছে, কিন্তু নিজেদের স্বামীদের

কাছে ঘুণাক্ষরে কোনো কথা উচ্চারণ করেনি।

সুকান্ত প্রায় তূণীরের সমানই শোক পেয়েছিল। কিন্তু ঐ বয়েসের ছেলেরা প্রকাশ্যে কাঁদে না। তারা মুখ বুজে প্রয়োজনীয় সব কাজ করে যেতে লাগলো। বুড়িমারও যেমন কাঁদবার সময় নেই, বাড়ির সব কিছু সামলাতে সামলাতেই চোখ মোছেন।

একটুও কাঁদেনি রাকা। শোকের চেয়েও তার বুক জুড়ে ছিল তীব্র অভিমান ও এক ধরনের রাগ। মৃত্যুর ঠিক আগে, প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়ে মা তার নামে একটা অসম্ভব অভিযোগ দিয়ে তাকে অপরাধিনী করে গেছেন। তার কোনো ভিত্তিই নেই। রাকা কেন, কী করে মায়ের সর্বনাশ করবে ? কোনো মেয়ে কি স্বপ্নেও এরকম চিন্তা করতে পারে ! সেবন্তী যখন সুস্থ থাকতেন, তখন তাঁর মতন ভালো মা যে পৃথিবীতে আর হয় না।

যখন কোনো অভিযোগের কারণ বোঝা যায় না, কোনো অপরাধ না করেও যখন কারুর কাছে অপরাধী হতে হয়, তখন তার যে কষ্ট, তা কিছুতেই বুঝবে না অন্য কেউ !

॥ ৪ ॥

এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে যাবার পর হস্টেল ছেড়ে দিতে হয়েছে সুকান্তকে, তার আর থাকার জায়গা নেই, সে এখন এ বাড়িতেই এসে রয়েছে। চাকরির চেষ্টা করছে নানা জায়গায়, প্রত্যেক দিনই দুপুরের দিকে কলকাতায় যায়, ফেরে লাস্ট ট্রেনে। চোখের অসুখের জন্য তূণীরের যেমন খেলা ছাড়তে হয়েছে, তেমন ডাক্তারি-এঞ্জিনিয়ারিংও পড়তে যায়নি, সে নিয়েছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, কলকাতার একটা ফার্মে আর্টিকেলড্ ক্লার্ক হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

দুপুরবেলা বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকে। রাকার আর স্কুল নেই, সে তৈরি হচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য। রাকার দুই সহপাঠিনী, অঞ্জনা আর বীথি মাঝে মাঝে চলে আসে দুপুরবেলা। একসঙ্গে পড়াশুনো করে। একেবারে একা একা নির্জন বাড়িতে লেখাপড়ায় সব সময় মন লাগতো না রাকার, ওরা এলে ভালোই লাগে, মাঝে মাঝে বই বন্ধ করে গল্প, হাসাহাসি, গানও হয়, কিছুক্ষণের জন্য মনটা হালকা হলে আবার বইয়ের পৃষ্ঠায় মনোযোগ গাঢ় হয়।

তাপসী আসে না। তাপসী এ বাড়িতে দু' একবার মাত্র এসেছে। সে আসতে চায় না, কারণ এতদূর থেকে ফিরতে তার অনেক রিক্সা ভাড়া লাগে। রাকাদের বাড়ির কাছাকাছি কোনো বাস নেই।

একদিন রাকা বীথির কাছে শুনলো যে তাপসী পরীক্ষা দেবে না! এই খবরটা জানাবার সময় বীথির মুখে কোনো বিস্ময়, বেদনা কিংবা আফসোসের চিহ্ন ফুটে উঠলো না। যেন এটা অস্বাভাবিক কিছু না। ক্লাসের সব মেয়েই শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেয় না। সাতচল্লিশ জনের মধ্যে বারো জনই ড্রপ করছে, তিনটি মেয়ের বিয়েই হয়ে গেল এর মধ্যে।

তাপসীর সঙ্গে ক্লাসের অন্য কারোর বিশেষ ভাব ছিল না, কারণ তার কথাবার্তা চোখা চোখা, সে কারুকে তোয়াজ করে না, কারুর কাছে গোপন কথা বলে না, তার অহংকার করার মতন কিছুই নেই, তবু যেন তার ব্যবহারে প্রচ্ছন্ন অহংকার রয়েছে। ঠিক এইসব কারণেই তাপসীকে ভালো লাগে রাকার। তাপসী তাকেও আঘাত দিতে ছাড়েনি, তবু রাকা তাপসীর ভক্ত।

তূণীরের সাইকেলটা চালিয়ে পরদিনই রাকা চলে গেল তাপসীদের বাড়িতে। বাবা যখন থাকেন না, তখন রাকা একা সাইকেল চালিয়ে বেরুলে বুড়িমা ছাড়া নিষেধ করার আর কেউ নেই। কিন্তু বুড়িমাকে অগ্রাহ্য করার বয়েসে পৌঁছে গেছে রাকা। আগে সে বুড়িমাকে খুবই ভালোবাসতো, এখন মাঝে মাঝে বুড়িমার ওপর তার বেশ রাগ হয়। বুড়িমা এক এক সময় এমন অদ্ভুত কথা বলেন, তা শুনলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায়!

একদিন রাকা একতলার ঘরে কথা বলছিল সুকান্তর সঙ্গে। ঠিক কথা নয়, তর্ক। টাইম মেশিনে মানুষকে অদৃশ্য করে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায় কি না। কিংবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে।. বস্তুকে যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, সেই রকম মানুষের শরীরও তো ম্যাটার, তাকে যদি এনার্জিতে ট্রান্সফর্ম করা যায়...। রাকা এইসব জিনিস নতুন পড়ছে, তাই তার খুবই উৎসাহ। সুকান্ত পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, ওসব গাঁজাখুরি চিন্তা, মানুষের মস্তিষ্ক নামক বস্তুটির দশ বিলিয়ান সেল একবার ডিসইন্টিগ্রেট করিয়ে আবার ঠিক ঠিক ফিরিয়ে আনা নিউ ইয়র্ক শহরটাকে এক নিমেষে গুঁড়ো করে আবার অবিকল সে-রকম গড়ে তোলার চেয়েও অনেক শক্ত!

তর্ক যখন বেশ জমে উঠেছে, তখন বুড়িমা দোতলার সিঁড়ি থেকে বার বার ডাকতে লাগলেন রাকার নাম ধরে। রাকার তখন একটুও আসতে ইচ্ছে

করছিল না, কিন্তু আরও কয়েকবার ডাক শুনে মনে হলো জরুরি কিছু।

বেরিয়ে এসে সে সিঁড়িতে বুড়িমাকে দেখে ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কী বলছো ? এতখানি এসেছো, ঘরে গিয়ে বলতে পারতে না ?

বুড়িমা দু' চোখ ঘুরিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করে বললেন, একবার ওপরে আয়—

দোতলার বারান্দা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় থমকে বুড়িমা গোপন কথার মতন ফিসফিসিয়ে বললেন, তুই ও ঘরে এতক্ষণ কী করছিলি ? তোর বয়েস হয়েছে, পরপুরুষের সঙ্গে এখন একা একা থাকতে নেই, মা !

রাগে, বিরক্তিতে রাকার গলায় ব্যথা হয়ে গেল। সে শুধু বললো, পরপুরুষ ? সুকান্তদা পরপুরুষ ?

বুড়িমা বললেন, ওমা, পরপুরুষ নয় ? যতই বাড়ির ছেলের মতন হোক, ওর সঙ্গে তো তোর বিয়ের কিছু ঠিক হয়নি ! তুই এরকম পোশাক পরে ওর কাছে—

রাকা এবার এক ধমক দিয়ে বললো, বুড়িমা, বাজে কথা বলবে না !

বুড়িমা ধমক খেয়েও হাসলেন। তারপর তুরুপের তাস ছোঁড়ার মতন বললেন, তুই প্রতিজ্ঞা করেছিলি মনে নেই ?

রাকা বললো, সে তো মায়ের কাছে।

বুড়িমা বললেন, মা চলে গেলেই বুঝি প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যায় ? সে বুঝি ওপর থেকে সব দেখছে না ?

রাকা পেছন ফিরতে ফিরতে বললো, না, কিছু দেখছে না। খবর্দার, তুমি আর কক্ষনো আমাকে এ ভাবে ডাকবে না !

রাকার মনে হলো, বেশি বয়েসের জন্য বুড়িমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ! না হলে কেউ এরকম কথা বলে ! পরপুরুষ ! শুনলেই বিশ্রী লাগে। সুকান্তদা কখনো তার ঘরে ডাকলে রাকা যাবে না ? রাকার দিদিরা ও ঘরে গিয়ে কত গল্প করতো। বাবার কাছে মাঝে মাঝে বাইরের লোকরা দেখা করতে আসেন। বাবা না থাকলে রাকাকেই এখন তাঁদের ঘরে বসিয়ে কথা বলতে হয়। সেইসব লোকই পরপুরুষ।

বাড়িতে রাকা স্কার্ট-ব্লাউজ পরে থাকে, কিংবা প্যান্টের ওপর টি-শার্ট। তূণীরের শার্টগুলো তার গায়ে ফিট করে এখন, রাকা মাঝে মাঝে সেগুলো দিব্যি ব্যবহার করে। পিসিমার ধারণা এগুলো ঠিক পোশাক নয়, এখন সব সময় শাড়ি পরতে হবে।

সাইকেল নিয়ে একা একা বেশিদূর যাওয়া এখন খুব নিরাপদ নয়। রাস্তায় যখন তখন বোমা ফাটে, পুলিশের সঙ্গে নকশালপন্থী ছাত্রদের শুরু হয়ে যায় খণ্ডযুদ্ধ। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে রাস্তার পাজি-বখাটে ছেলেরাও বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, মেয়েদের প্রতি অশালীন ব্যবহার করলে বাধা দেবার কেউ নেই। সপ্তাহ দু' এক আগে কাছাকাছি একটা গ্রামে কয়েকটা ফেল-করা ছেলে স্কুলবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে বুক ফুলিয়ে চলে গেল।

রাকা তবু ভয় পায় না, বিপদ দেখে পালাবার বদলে এখন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। মৃত্যু যেন ছেলেখেলা। মায়ের মৃত্যুর পর তার এখন মনে হয়, সেও যদি কোনো দিন টপ করে মরে যায়, তাতে কিছুই আসে যায় না।

বস্তির পাশ দিয়ে, সরু গলির মধ্যে ঘুরে ঘুরে রাকা পৌঁছে গেল তাপসীদের বাড়ির সামনে। সাইকেলটায় তালা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখলো, তাপসীদের দিকটায় টিনের দরজাটা বন্ধ। এর আগে সে প্রত্যেকবার দরজাটা খোলাই দেখেছে। এ পাশের ভাড়াটেরা ঝগড়া করেই চলেছে। একজন খাঁকি হাফ-প্যান্ট পরা লোক দৌড়ে নীচে নেমে গেল। তাপসীরা কি এখানে আর থাকে না? ভেতরে একটা বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

টিনের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। আজ আর হারমোনিয়াম-তবলাগুলো ছড়ানো নেই, তাপসীর বাবা একটা তেল চিটচিটে তাকিয়ায় ভর দিয়ে আধা-শোয়া অবস্থায় একটা বাঁশের বাঁশি বাজাচ্ছে। কেমন যেন ফাটা ফাটা সুর। সেটা বাঁশিটার দোষ, না যিনি ফুঁ দিলেন তাঁর অযোগ্যতা, সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

রাকাকে দেখে নিশিকান্ত বাঁশিটা সরিয়ে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, এই তো একজন এসেছে। হুঁ হুঁ বাবা, আসতেই হবে! বিয়ের আগে দু'খানা গান তুলবে? এসো, বসে যাও, শিখিয়ে দেবো। ষাট টাকা লাগবে। পার সং থার্টি রুপিজ। কিছু অ্যাডভান্স দাও! দু'দিন মাল খাইনি!

রাকা আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সে কথা শুনে মৃদুলা বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা, কাকে কী বলছো? চোখের মাথা খেয়েছো নাকি? ও তো রাকা, মিনুর সঙ্গে স্কুলে পড়ে। তোমার যদি এরকমভাবে ভিক্ষে করতে হয়, রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করো!

নিশিকান্ত বললেন, অ! গানের পার্টি নয়!

তিনি আবার বাঁশিতে ফুঁ দিলেন।

মৃদুলা রাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিনু তো নেই, একটু বেরিয়েছে। তুমি এসে বসো না ওর ঘরে। এসে পড়বে, একটু বাদেই এসে পড়বে।

তাপসীর সেই বারান্দা ঘেরা ঘরে চেয়ার-টেবিল পর্যন্ত নেই, শুধু একটা লম্বা চৌকি, তাপসীর বই-পত্রগুলো সব যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। আগে এই ঘরের এখানে সেখানে, চৌকির ওপরেও বই-খাতা ছড়ানো থাকতো।

একটামাত্র জানলা, সেখান দিয়ে উঁকি মারতেই রাকা দেখলো একজন পূর্ণবয়স্ক লোক গামছা পরে রাস্তার কলে স্নান করতে করতে উরু ঘষছে। রাকা সঙ্গে সঙ্গে সরে এলো সেখান থেকে। চুপ করে বসে রইলো চৌকির ওপর। দরজাটার একটা পাল্লা খোলা।

একটু পর সে শুনতে পেল, মৃদুলা ফিসফিস করে বলছেন, ওঠো, একবার বাইরে গিয়ে কিছু একটা চেষ্টা করো। দুপুরে গিলতে হবে না ? কিচ্ছু নেই !

নিশিকান্ত বললেন, আঃ, বিরক্ত করো না !

মৃদুলা এবার গলা তুলে বললেন, ঐ বাঁশিটা আমি এবার টান মেরে ফেলে দেবো ! সংসার করার সময় খেয়াল ছিল না ? বউ ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে পারো না, কোনো দায়িত্বই তোমার নেই, দিন রাত শুধু প্যাঁ-পোঁ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। সারাটা জীবন জ্বলেপুড়ে গেল !

বাঁশিটা সরিয়ে নিশিকান্ত এবার বললেন, চুপ কর মাগী ! সংসারের খোঁটা দিচ্ছিস যে বড় ? এ ছাইয়ের সংসার আমি একা করেছি ? তুই করিসনি ? বিয়ে করেছি বলে সারা জীবন সবাইকে আমি একা খাওয়াবো-পরাবো, এমন মাথাব দিব্যি দিয়েছি কখনো ? ছেলেমেয়েদের জন্ম আমি একা দিয়েছি ? বলাৎকার করেছি নাকি, অ্যাঁ ? তুই তখন ঘুমোচ্ছিলি ? বড় ছেলে দুটো ভেগেছে, এখন তুই আর তোর ছোট ছেলেমেয়ে যেখান থেকে পারিস নিজেদেব ব্যবস্থা কর। আমি আর কিচ্ছু পারবো না। দু' একবেলা না খেয়ে থাকলে আমার অসুবিধে হয় না। তোরা উপোষ করতে না পারিস তো মর, মর না কেন ! কিংবা বাজারে গিয়ে দাঁড়া !

রাকা শুনতে না চাইলেও উপায় নেই। সে দু' কানে হাত চাপা দিল। এখন আর দারিদ্র্য ব্যাপারটা তার কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়, গল্প-উপন্যাস-খবরের কাগজে অনেক পড়েছে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও কিছুটা বোঝে, কিন্তু চোখের সামনে এমন দেখেনি আগে। দারিদ্র্য মানুষের মুখের ভাষাও এত খারাপ করে দেয় ! পভার্টি ডিজেনারেট্স !

স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া যখন উত্তুঙ্গে, সেই সময় এসে পড়লো তাপসী। তার এক হাতে একটা চটের থলে, কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগ। সারা মুখে ঘাম, মাথার চুলে একটা ফিতের ফাঁস বাঁধা, একটা তুঁতে রঙের শাড়ি পরা।

ঝগড়ার কথাগুলো গ্রাহ্য না করে সে চটের থলিটা মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও। চাল-ডাল আর কয়েকটা বেগুন আছে। নুনও তো নেই বলেছিলে, ওর মধ্যে একটা ঠোঙায় নুন আছে দেখে নিও।

মৃদুলা থতমত খেয়ে, গলার আওয়াজ বদলে বললেন, কোথায় পেলি? কোথা থেকে আনলি এসব?

তাপসী বললো, পয়সা দিয়ে কিনে এনেছি।

মৃদুলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, পয়সা, তোর কাছে পয়সা তো ছিল না—

নিশিকান্ত খেঁকিয়ে উঠে বললেন, তোমার অত জানবার দরকার কী? যেখান থেকেই পাক। মেয়ে বড় হয়েছে, নিজের ভালো-মন্দ নিজে বুঝবে। বলেছি না, এখন প্রত্যেককে নিজে খুঁটে খেতে হবে!

মৃদুলা বললেন, মিনু, তোর বন্ধু এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে তোর ঘরে বসে আছে।

রাকার মনে হলো, তার আগেই ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। তাপসী তাকে দেখে লজ্জা পাবে।

তাপসী কিন্তু লজ্জা পেল না। কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে রেখে আঁচল দিয়ে মুখ মুছলো। তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, কী রে, রাকা, কখন এসেছিস?

অন্য কথা বলার কোনো মানে হয় না, তাই রাকা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, তুই নাকি পরীক্ষা দিচ্ছিস না?

যেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এইভাবে তাপসী বললো, নাঃ দিচ্ছি না।

রাকার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। সে ভেবেছিল, তাপসী কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবে। পরীক্ষা দেবে না, তা হয় নাকি? পড়াশুনোয় এত ভালো, স্কুলের মধ্যে তাপসী সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করবে। এখন পরীক্ষার চেয়ে বড় কোনো কাজ থাকতেই পারে না। যে-কয়েকটা মেয়ে পরীক্ষার আগেই বিয়ে করে ফেললো, তারা বোকা।

খুব বিমর্ষ গলায় রাকা জিজ্ঞেস করলো, কেন দিবি না? তোর কী অসুখ হয়েছে?

এবার তাপসী হাসলো। হাসির রেখা ফুটলো ঠোঁটে, কিন্তু চোখ দুটি স্থির। কে বললো, হ্যাঁ, অসুখ, খুব অসুখ, আমার বাবা, মা এই বাড়িটার খুব অসুখ। আমারও অসুখ। আমার পরীক্ষা-টরিক্ষা সব চুকে গেছে। আমি এখন চাকরির চেষ্টা করছি।

—চাকরি ? তুই কী চাকরি করবি ?

—সেটাই প্রশ্ন। কে কী চাকরি আমাকে দেবে ? কেউ কিছু দিতে চায় না। সবাই বলে, আগে পরীক্ষাটা দিয়ে নাও ! আমাদের পাঁচ মাসের ভাড়া বাকি, বাড়িওয়ালা মেরে তুলে দেবে বলেছে, বাড়িওয়ালার একটা ছেলে হাতে লোহার বালা পরে, আমাদের সংসারে রোজগার এখন শূন্য, প্রত্যেকদিন কী খাবো তা ভাবতে হয়। না খেয়ে কেউ পড়াশুনো করতে পারে ? নার্সিং-এর ট্রেনিং নেবো ভাবছি।

—নার্সিং ?

—কেন, নার্স হওয়া কি খারাপ ?

রাকা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। নার্সের কাজ খুব ভালো কাজ, মানুষের সেবা করা খুব মহৎ ব্যাপার, কিন্তু রাকার চেনাশুনো জগতের কেউ হাসপাতালের নার্সের চাকরি নেয় না।

তাপসী আবার বললো, নার্সিং-এ ঢোকাও সোজা নয়। তার জন্য ধরাধরি করতে হয়। আমার তো দেরি করার উপায় নেই, পরশুদিন আমাদের বাড়িতে রান্নাই হয়নি। একজন আমাকে বললো, দাই-এর কাজ করতে পারো। তাতে ট্রেনিং লাগে না, ডেইলি পনেরো টাকা।

রাকা কী বলবে জানে না, সে শুধু মাঝে মাঝে তাপসীর এক একটা শব্দের পুনরুক্তি করে যাচ্ছে। সে বললো, দাই ?

তাপসী বললো, হ্যাঁ, দাই, জানিস না ? ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্ট যাকে বলে। হাসপাতালে কোনো শক্ত রুগীর কাছে বসে থাকতে হয়, তার জামা-কাপড় কাচা, বাথরুমে নিয়ে যাওয়া, পিকদানি পরিষ্কার করা, শক্ত কিছু নয়। একদিন করে দেখেছি। রোজ অবশ্য ও কাজ পাওয়া যায় না। চার-পাঁচজন থাকে তো, কোটা সিসটেম, এক একজন এক একদিন ডাক পায়, আমি নাম লিখিয়ে এসেছি। নাম লেখাবার জন্য আমাকে কি করতে হয়েছে জানিস ? বড় গেটের কাছে যে একদল ছেলে বসে থাকে, আমাদের দেখলে আওয়াজ দেয়, তোর মনে আছে। একদিন তোর সাইকেল রিকশা থামিয়ে একটা ছেলে নেচেছিল ? তার মধ্যে দুটো ছেলে, গণা আর শিবু খুব আমার পেছনে লেগেছে, একদিন

গণা আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললো, বেশি তেড়িয়াপানা করো না, তা হলে লোপাট হয়ে যাবে। আমি কাঁদিনি, বুঝলি, বাড়িতে এসে ভাবলুম, ঠিকই তো আমার বাবা থেকেও নেই, দাদারা কেউ আসে না, আমাকে কে বাঁচাবে যদি ওরা একদিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় ? যদি রেপ করার পর গলা টিপে রেল লাইনে ফেলে দেয় ? তাই একদিন আমি গণার সঙ্গে শক্তিগড়ের দিকে বেড়াতে যেতে রাজি হলাম। গিয়ে বললাম, তুমি আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দাও...গণাই হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তবে, ওরা তো রাক্ষসের জাত, ওদের বড় বড় নখ হয়...

আঁচলটা ফেলে দিয়ে, বুকের ব্লাউজটা খানিকটা টেনে নামিয়ে তাপসী বললো, এই দ্যাখ নোখের দাগ।

রাকা সঙ্গে সঙ্গে মুখটা নিচু করে ফেললো।

তাপসী দু' হাতে রাকার কাঁধ ধরে এতক্ষণ পর আবেগ উতলা গলায় বলে উঠলো, রাকা, রাকা, তোকে কেন এইসব কথা বলছি ! তোর কী দায় পড়েছে ! তুই এখন মন দিয়ে পড়াশুনো করবি ভালো করে পরীক্ষা দিবি, তুই এসব নিয়ে মাথা ঘামাসনি রাকা ! একটু সামলে নিতে পারলে আমি সামনের বছর পরীক্ষা দেবো ?

রাকা আর সামলাতে পারলো না। সে একটা জলপ্রপাতের মতন ভেঙে পড়লো।

চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছে রাকা, শালোয়ার-কামিজ পরা, শরীরেরই মতন পরিচ্ছন্ন মন, বাড়ির খাবার-দাবার কোথা থেকে আসে তা নিয়ে সে কোনোদিন চিন্তাই করেনি, সে নিজে তেমন টাকা পয়সা খরচ করে না, কিন্তু প্রয়োজনের সব কিছু পেয়ে যায়। আর তাপসী ঠিক তারই বয়েসী, স্কুলের ভালো ছাত্রী, অথচ তার বাড়িতে খাবার সংস্থান নেই, এই বয়েসে তাকে জীবিকার সন্ধানে যেতে হবে বলে সে পরীক্ষা দিতে পারবে না ? কেন এই বৈষম্য ? এর জন্য কি শুধু তাপসীর বাবা দায়ী ? যদি তাপসীর বাবার সঙ্গে রাকার বাবা বদলা-বদলি হয়ে যেত ? যদি রাকা জন্মাতো এখানে ?

সামনের ঘরে বাঁশির আওয়াজটা হয়েই চলেছে।

কান্না থামিয়ে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে রাকা বললো, তোর বাবাকে আগে কখনো বাঁশি বাজাতে শুনিনি।

তাপসীও চোখ মুছে বললো, এই বুড়ো বয়েসে নতুন করে বাঁশি বাজানো শিখছে। সেতার-তবলা-হারমোনিয়াম সব বিক্রি হয়ে গেছে, ছাত্র-ছাত্রী তো

আর আসে না। বাড়িতে কোথায় একটা ফাটা বাঁশি পড়েছিল, এটা বিক্রি হবে না, সেটাতে সব সময় ফুঁ দেয়। কিছু না কিছু সুর ছাড়া থাকতে পারে না। অথচ আমাদের সংসারটাই বেসুরো।

বাবার সম্পর্কে কথা বলার সময় তাপসীর গলায় কোনো তিক্ততা ফোটে না। যেন তার বাবা একটা শিশু। সে আবার বললো, বাবার কোমরটা পড়ে গেছে। ভালো করে দাঁড়াতে পারে না, বাইরেও বেরুতে পারে না। কোমর ভাঙা দুর্যোধন! দুর্যোধন বাঁশি বাজাচ্ছে!

রাকা তাপসীর মুখের দিকে তাকালো। তাপসী তার তুলনায় অনেক বড় হয়ে গেছে, জীবন-রহস্য বুঝে ফেলেছে অনেকখানি, তার কথাবার্তাও কঠোর বাস্তব ঘেঁষা। গণা নামে রাক্ষস পরিবারের কোনো পুরুষের সঙ্গে তাপসী বেড়াতে গিয়েছিল স্বেচ্ছায়?

রাকা খুব দ্বিধার সঙ্গে, লজ্জা মাখা গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমার বাবাকে কিছু বলবো? যদি...

তাপসী বাধা দিয়ে বললো, কী বলবি? আমাদের সাহায্য করার কথা? আমি তো পরীক্ষার ফি-ও দিতে পারিনি, আমাদের স্কুল কমিটির গোবিন্দবাবু আছেন না, তিনি কোথা থেকে যেন শুনে বলেছিলেন, ফি-এর টাকা তিনি দিয়ে দেবেন। রোটারি ক্লাব থেকে আরও দু'শো টাকা জোগাড় করে দিতে পারেন, পরীক্ষার সময় যাওয়া-আসার খরচ হিসেবে। কিন্তু এখনো যে দেড় মাস বাকি, এই দেড় মাস না খেয়ে থেকে আমি পরীক্ষার পড়া তৈরি করবো? মা-বাবা আর একটা ছোট ভাই আছে, ওরা কী খাবে? এইসব কথা শুনলে সবাই পিছিয়ে যায়। পুরো একটা পরিবারের ভার কেউ নিতে চায় না রে! এইসব অভাব আর দুঃখ কষ্টের কথা শুনলে লোকে ভয় পায়। তোর বাবা কী করবেন বল?

—তোর দুই দাদা?

—ওরা বাবাকে সহ্য করতে পারে না। এক দাদা আগে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাতো মাকে, এখন বন্ধ করে দিয়েছে। বউদি চায় না। আর একজন আসানসোলে কয়লাখনিতে গুণ্ডামি করে বেড়ায় শুনেছি। যারা গুণ্ডামি করে, তারা বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এটাই নিয়ম।

একটু পরে রাকাকে পৌঁছে দেবার জন্য তাপসী নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। পাশের ভাড়াটেরা এখনো ঝগড়া করে চলেছে। বাড়ির সামনের রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, উল্টোদিকের বাড়িগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ। কেমন যেন

একটা শুনশান ভাব।

তাপসী জিজ্ঞেস করলো, তুই সাইকেল রিক্সা দাঁড় করিয়ে রাখিসনি। তা হলে তো এখানে পাওয়া যাবে না, মোড় পর্যন্ত যেতে হবে।

রাকার শরীরটা কাঠ হয়ে গেছে। দাদার সাইকেলটায় তালা দিয়ে এই দরজার পাশেই সে রেখে গিয়েছিল। সাইকেলটা নেই!

এ কথা কি তাপসীকে বলা যায়? থাক দরকার নেই। তাপসী এগিয়ে যাচ্ছে, তখন রাকার মনে হলো, হয়তো সাইকেলটা কেউ ভেতরে তুলে রেখেছে।

সে ফিসফিস করে বললো, আমি সাইকেলে এসেছি, এখানে ছিল...

তাপসী চোখ বড় বড় করে বললো, অ্যাঁ? সাইকেল এনেছিলি? বাইরে রেখেছিস, আগে বলিসনি কেন? এ পাড়ায় চোরের রাজত্ব।

রাকা বললো, তালা লাগানো ছিল।

তাপস বললো, তালা ভাঙতে কতক্ষণ লাগে? তালা না ভেঙেও পুরো সাইকেলটা তুলে নিয়ে যায়।

তারপর গলা চড়িয়ে বললো, এ পাড়ারই কেউ নিয়েছে। আমার বন্ধুর সাইকেল ফেরৎ না দিলে আমি ছাড়বো না। কে নিয়েছে, এখনো দিয়ে যাও বলছি, ভালো হবে না!

অদৃশ্য কাদের উদ্দেশে যেন ভয় দেখাতে লাগলো তাপসী। একটু বাদে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে এলো উল্টো দিক থেকে। তাপসী ছুটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

রাকা আর্তভাবে বললো, ওটা নয়, ওটা নয়।

তাপসী তবু ধমকে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই বিশে, এখানে একটা সাইকেল ছিল দেখেছিস? কে নিয়েছে? জানিস না? গণাদাকে চিনিস? গণাদাকে ডেকে সব্বাইকে এমন ধোলাই খাওয়াবো, ভেবেছিস আমরা সব মুখ বুজে সহ্য করবো। সাইকেল না পেলে গণাদা প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে...

স্কুল কম্পাউন্ডে বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে যে তাপসী রবীন্দ্রনাথের অচেনা অচেনা কবিতার লাইন মুখস্ত করে শোনাতো, তার মুখ দিয়ে এখন অনর্গল বস্তির মেয়েদের মতন খারাপ কথা বেরুচ্ছে। আর শুনতে পারলো না রাকা, সে দৌড়ে গেল মোড়ের দিকে।

মা চলে যাবার পর থেকেই যেন রাকার গায়ে বাইরের বাস্তবতার আঁচ বেশি করে লাগছে। মানুষের হিংস্রতা, লোভ, কর্কশভাব আগে এমন চোখে

পড়েনি। আগেও সে জানতো যে মানুষের দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, কিন্তু সেগুলো ব্যক্তিগত, কিন্তু তার বাইরে বাতাসের স্রোতের মতন একটা আনন্দের স্রোতও আছে। কিন্তু মানুষ যে ইচ্ছে করে অন্যকে কষ্ট দেয়, অন্যের সুখ কেড়ে নিয়ে কেউ আনন্দ পায়, সে সম্পর্কে তার বোধ ছিল না। রাকা এখন একলা একলা রাস্তা দিয়ে গেলে কেউ কেউ তার দিকে বিশ্রীভাবে তাকায়। কেন ওরা এরকমভাবে তাকায় ? খারাপ চোখ করে ওরা কী আনন্দ পায় ? তাপসীকে যে ছেলেটি দাই-এর কাজ জুটিয়ে দিয়েছে, সে কেন তাপসীর বুক নোখ দিয়ে চিরে দিল ?

পড়তে বসে অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাকা, খালি মনে পড়ে পরীক্ষা না দিয়ে তাপসী দাইয়ের কাজ করবে, অসুস্থ মানুষের নোংরা জামা-কাপড় কাচবে, পিকদানি ধোবে। গানের গলা আছে, তাপসীর, খানিকটা নাচতেও পারে, রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে'-র মতন অত বড় কবিতা তার মুখস্ত, সে প্রায় একটা মেথরানি হয়ে থাকবে হাসপাতালে। সেদিন তাপসী কথায় কথায় বলেছিল, সে অত পড়াশুনো না করে যদি বাবার কাছে নাচ-গান শিখতো মন দিয়ে, তাহলে অন্তত কোনো যাত্রাপার্টিতে সখীর পার্টও পেতে পারতো, নার্স হওয়ার চেয়ে তাতে রোজগার বেশি।

তাপসীর কথা ভাবতেই রাকার চোখে ভাসে তাপসীর বুকে সেই নোখের চেরা দাগ। ঐ ব্যাপারটাই রাকাকে বেশি কাঁপিয়ে দিয়েছে। কী অবলীলাক্রমে তাপসী বললো কথাটা, সে একটা বদ ছেলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বেড়াতে গিয়েছিল। একজনের সঙ্গে না গেলে অন্যরা তার ওপর আরও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাতো।

তাপসীর কাছে তার শরীরটা এমন অবহেলার জিনিস হয়ে গেল কী করে ? কেউ তেমনভাবে কিছু বলে দেয়নি, তবু রাকা নিজের শরীরটাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। সে টের পায় যে তার শরীর জাগছে। ছেলেদের তুলনায় তার উরু দুটো বেশি চওড়া হয়েছে, কোমরের নীচের অংশ যেন ওপরের অংশের চেয়ে বেশি লম্বা। হঠাৎ কোনো সুন্দর জিনিস দেখলে, একটা কোনো ফুলের গুচ্ছ কিংবা এক ঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়া কিংবা সন্ধের আবছা আকাশে একটা বিদ্যুতের এ-ধার থেকে ও-ধারে চিরে যাওয়া, তার রক্ত যেন ঝনঝন করে ওঠে, সেই কথাটা তক্ষুনি কারুকে জানাতে ইচ্ছে করে। ভালো কবিতা পড়লে চোখে জল আসে, এও এক রকম শরীরের জেগে ওঠা।

যখন সে খুব ছোট ছিল, অনেকেই তার গাল টিপে আদর করতো। রাকার

ভালো লাগতো না। তার দশ-এগারো বছর বয়েস হবার পর থেকেই বয়স্ক পুরুষ মানুষরা কথায় কথায় অন্যমনস্কভা'ব তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে, রাকা শরীর মোচড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যায়, তাদের ঘেমো ঘেমো পুরুষ পুরুষ গন্ধ তার পছন্দ হয় না। রাকার সমবয়েসী কোনো ছেলের সঙ্গে এ পর্যন্ত বন্ধুত্ব হয়নি। দেবিকা আর সুরেখার বিয়ের পর তার দুই জামাইবাবু সুরঞ্জন আর মোহিত তাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরে আদর করতে চায়। শ্যালিকাদের আদর করার যেন একটা বিশেষ অধিকার আছে জামাইবাবুদের।

পুরুষের স্পর্শের একটা ভাষা আছে, যা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়। দু' জনের মধ্যে মোহিতের হাত বেশি কিছু বলে, সে কথাও বলতে পারে অনেক সাজিয়ে-গুছিয়ে। একদিন সে রাকাকে প্রায় বুকে জড়িয়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে বলেছিল, লিট্‌ল প্রিন্সেস, রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন জানো? স্ত্রী হচ্ছে মূলধন, আর শ্যালিকা হচ্ছে সুদ। মূলধনের চেয়ে সুদই বেশি মিষ্টি।

মোহিতের মুখে সিগারেটের গন্ধ। তা ছাড়া, লিট্‌ল প্রিন্সেস নামটা একমাত্র চন্দ্রমৌলির মুখেই ভালো লাগতো রাকার। চন্দ্রমৌলি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, রাকাও আর লিট্‌ল নেই।

শুধু স্পর্শ দিয়ে নয়, দৃষ্টি দিয়েও অনেকে ছোঁয়। অনেক সময় স্পর্শের চেয়ে দৃষ্টিতেই গায়ে বেশি জ্বালা ধরায়। বাবার কর্মচারি ধীরেনবাবু, যিনি মাঝে মাঝে এ বাড়িতে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে চলে যান মেমারিতে নিজের বাড়িতে, ছোটবেলা থেকে রাকা যাঁকে দেখেছে একজন নিরীহ, শান্ত, গোবেচারা মানুষের মতন, সেই ধীরেনবাবুর দৃষ্টিটাও কী রকম বদলে গেছে ইদানীং। রাকার দিকে চোরা চোখে তাকায়। রাস্তায়, বর্ধমান স্টেশানের কাছে কিছু কিছু মানুষের দৃষ্টিতে যেন জল-বিছুটি থাকে।

সব দৃষ্টি অবশ্য খারাপ নয়। দু' একজন মানুষের দৃষ্টি তার শরীরে একটা লজ্জার ভাব এনে দেয়। কোনো কোনো দৃষ্টিতে কিছুটা পুলকেরও সঞ্চার হয়। তারা রূপের তারিফ করে, কিন্তু লোভের লোমশ হাত দেখায় না। কিছুদিন আগেও স্কুলে যাবার পথে, রাজ কলেজের সামনে একজন মোটাসোটা ধরনের ভদ্রলোককে রাকা প্রায়ই দেখতো, হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে তিনি বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন, কিংবা যেন জানতেন, ঠিক এই সময় রাকার রিকশা এই পথ দিয়ে যায়, তিনি সস্মিত মুখে তাকিয়ে থাকতেন রাকার দিকে, সেই দৃষ্টিতে রাকার শরীরে একটা সুন্দর ভালো লাগার ঝাপটা লাগতো। সেই মানুষটির

নাম বা পরিচয় কিছুই জানে না রাকা, বয়েসেও অনেক বড়, তবু এক-একদিন রাকার নিজেরই মনে হতো, আজও উনি দাঁড়িয়ে থাকবেন তো ?

এ পর্যন্ত রাকা তার শরীরকে নিষ্কলুষ রেখেছে। যারা জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে, তারাও রাকার স্পষ্ট প্রতিবাদের ইঙ্গিত পেয়ে বেশিদূর এগোয় না। তেরো-চোদ্দ বছর থেকেই রাকা বড়দের উপন্যাস পড়ে, কোনো কোনো লেখায় নারী-পুরুষের শারীরিক মিলনের বর্ণনা পড়লে তার কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে, শরীরে তাপ বাড়ে, কিন্তু নিজের ওরকম কোনো ইচ্ছে জাগে না। সে যে লিট্‌ল প্রিন্সেস, যার-তার কাছে সে ধরা দেবে কেন, এক সময় তার জীবনে আসবে প্রিন্‌স চারমিং, সে এসে তার শরীরের ঘুম ভাঙাবে। তার জন্য রাকা প্রস্তুত রেখেছে তার অমৃতমাখা অধরোষ্ঠ।

স্পর্শ দিয়ে নয়, শুধু দৃষ্টি দিয়ে একবারই মাত্র একজন রাকার শরীরে শিহরন জাগিয়ে ছিল। ঠিক যেন ঝনঝন শব্দ শুনতে পেয়েছিল রাকা।

এ বাড়িতে অনাত্মীয় পুরুষ বলতে সুকান্তকেই সবচেয়ে বেশি দেখেছে সে। তাদের পরিবারটি অনেকদিন ছিল ঘন নিবদ্ধ, নিজেদের নিয়েই বেশ মেতেছিল তারা, বাইরের লোকের আনাগোনা ছিল কম। সুকান্তকে এত ছোট বয়েস থেকে দেখেছে রাকা যে তাকে বাইরের মানুষ মনেই হয় না, সুকান্ত অনেক সময় খালি গায়ে থাকে, তা দেখে রাকার মনে হয় না পুরুষ মানুষের শরীর। সহপাঠিনীদের মধ্যে বীথি প্রায়ই ছেলেদের গল্প করে, তার অনেকগুলো মাসতুতো ও পিসতুতো দাদা, এবং তাদের অনেক বন্ধু, বীথির আর কোনো বন্ধু নেই বলে ঐ সব দাদা ও তাদের বন্ধুদের সঙ্গে বীথির খুব ভাব। সে একদিন বলেছিল, দ্যাখ ভাই, ছেলেরা আমাদের বুকের দিকে তাকায়, আমারও কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে পুরুষ মানুষদের কাঁধ। কাঁধের গড়ন ভালো না হলে পুরুষেরা সুন্দর হয় না!

সুকান্তর কাঁধ দেখার কথা রাকার কখনো মনে পড়েনি।

সুকান্তর দু' একজন বন্ধু এ বাড়িতে এসে থেকেছে মাঝে মাঝে। যাদবপুরে পড়ার সময় প্রায়ই সে কোনো না কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসতো, নীচের ঘরে দরজা বন্ধ করে গল্প করতো অনেক রাত পর্যন্ত। সেই বন্ধুদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ ইদানীং ঘন ঘন আসে।

যে-কেউ প্রথম দেখলেই বুঝবে, ইন্দ্রজিৎ তার বয়েসী ছেলেদের চেয়ে একেবারে আলাদা। তার চেহারায় দু' একটা বিশেষত্ব আছে বটে, কিন্তু সে জন্য তাকে আকর্ষণীয় সুপুরুষ বলা যায় না, এমনকী তার ছবি দেখলে মনে

হবে সে আর পাঁচজনেরই একজন, কারণ ছবিতে ঠিক দৃষ্টি ফোটে না।

ইন্দ্রজিতের মাথার চুল বেশ কোঁকড়ানো, প্রায় আফ্রিকানদের মতন, তবে চুলের গোছ খুব বেশি। কপাল থেকে অনেকটা উঁচু হয়ে থাকে, যেন সে একটা কালো রঙের মুকুট পরে আছে। গায়ের রং অবশ্য কালো নয়, তেমন ফর্সাও নয়, চামড়ায় রয়েছে উজ্জ্বলতা, তার উচ্চতাও মাঝারি ধরনের, হাতের হাড় বেশ চওড়া। আসল বৈশিষ্ট্য তার ব্যবহারে। নম্রতা, বিনয়, লাজুকতার সে ধার ধারে না একেবারেই। যে-কোনো মানুষের চোখের দিকে সে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলে, এক জায়গায় চার পাঁচজন লোক উপস্থিত থাকলে, ইন্দ্রজিৎ একটিও বাক্য না বলে বুঝিয়ে দেবে, সেখানে সে-ই প্রধান।

সুকান্তর অন্য বন্ধুরা এ বাড়িতে প্রথম এসে কিছুক্ষণ মুখচোরা হয়ে থাকে। সোমনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তারা শ্রদ্ধা দেখিয়ে উঠে দাঁড়ায়, কেউ কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করে। সোমনাথ রাশভারি পুরুষ নন, তাঁর ব্যবহার স্নিগ্ধ, কিন্তু দীর্ঘদিন বিচারকের আসনে বসছেন বলে তাঁকে দেখলে সকলেরই সম্ভ্রম জাগে। ইন্দ্রজিৎ যেদিন প্রথম আসে, সোমনাথ একতলার ঘরে নিজেই ঢুকে পড়েছিলেন সুকান্তর সঙ্গে কথা বলতে, ইন্দ্রজিতের হাতে তখন জ্বলন্ত সিগারেট, সে সিগারেট লুকোলো না, উঠে দাঁড়ালো না, সোমনাথের মুখের দিকে স্পষ্টভাবে চেয়ে বললো, নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, আমি যাদবপুরের হস্টেলে সোমনাথের রুমমেট।

তারপর সামনের একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, আপনি বসুন!

যেন সোমনাথই এ বাড়িতে অতিথি।

অযথা বিনয় নেই বটে, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ অভদ্রও নয় মোটেও। সুকান্তর মুখে কাকামণি ডাক শুনে সেও সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথকে কাকামণি বলে সম্বোধন করলো এবং বললো, আমি আপনার সামনে সিগারেট খেলে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

সোমনাথ ছেলেটিকে অপছন্দ করেননি একটুও, বরং সেবন্তীর কাছে এসে ওর গল্প করেছিলেন।

প্রথমবার ইন্দ্রজিৎকে দেখেইনি রাকা। সেবার ওরা দু' রাত্রি ছিল, সারাদিন কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে, রাকার সঙ্গে চোখের দেখাও হয়নি। দ্বিতীয়বার যখন সে এলো, তখন রাকা সদ্য ষোলো বছর পার হয়েছে। অনেকে তখনো রাকাকে ছোট মেয়ে মনে করে, একমাত্র রাকা নিজে জানে সে আর ছোট নয়। এখন আর এমন কিছুই নেই, যা সে বুঝতে পারবে না। জীবন অনেক

জটিল ও রহস্যময় ঠিকই, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করে আছে বিস্ময়, কিন্তু সেই বিস্ময়কে ধারণ করার বোধ সে অর্জন করেছে।

একতলায় সুকান্ত যে ঘরখানায় থাকে, সেই লম্বাটে ঘরখানার একদিকে কয়েকটি র‍্যাকে বেশ কিছু বই রাখা আছে, ছোটখাটো একটা লাইব্রেরির মতন। আর এক অংশে খাট, বিছানা, রাইটিং টেবিল, গোটা তিনেক চেয়ার, একটা পুরোনো আমলের ভারী কাঠের আরাম কেদারা। সুকান্ত যখন থাকে না, তখন রাকা-তৃণীররা কখনো কখনো এই ঘরটা ব্যবহার করে।

সেদিন রাকা সকাল সাড়ে দশটার সময় এই ঘরে এসেছিল একখানা বই নিতে। বইখানা সে তাপসীকে পড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আগের রাত্রে সুকান্ত এসে পৌঁছেছে, কিন্তু সেবারে যে সে তার সঙ্গে একজন বন্ধুকে এনেছে, তা রাকা জানতো না। রাকা পরে আছে একটা কাঁচা হলুদ রঙের স্কার্ট-ব্লাউজ, সদ্য স্নান করেছে, ভেজা চুল, এই সময় চোখের পল্লব ও ভুরু গাঢ় দেখায়।

খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে রাকা দেখলো বইয়ের র‍্যাকগুলোর কাছে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুরুষ। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, সে সুকান্ত নয়। ধবধবে সাদা চুস্ত্ ও কাজ করা ঘি রঙের পাঞ্জাবি পরা। রাকা প্রথমেই দেখলো তার কাঁধ।

সুকান্ত ঘরে নেই। অপরিচিত মানুষকে দেখে রাকা ইতস্তত করছে, এমন সময় ইন্দ্রজিৎ ঘুরে দাঁড়ালো। রাকার লাল চটি পরা পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

রাকার বুকে যেন একটা বড় কোনো পাখির ডানার ঝাপটা লাগলো। কিংবা ঢেউ। কিংবা ঝড়-লাগা গাছের মতন সে দুলে উঠলো।

ইন্দ্রজিৎ আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

রাকা খুব অস্ফুট গলায় বললো, আমি রাকা।

ইন্দ্রজিৎ আর কোনো কৌতূহল দেখালো না। এক পাশে সরে গিয়ে সিগারেট ধরালো।

রাকা বইয়ের র‍্যাকের কাছে এসে বইটা খুঁজতে লাগলো। বইটা কোথায় রাকা জানে, আগের দিনও দেখেছে, অথচ এখন চোখে পড়ছে না। এদিকে ফিরে থাকলেও রাকা বুঝতে পারছে, ইন্দ্রজিৎ সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

শেষ পর্যন্ত বইটা পেয়েও, তুলে নিতে গিয়ে, হাত থেকে পড়ে গেল। লজ্জা পেয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে রাকা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ

বললো, কী বই নিলে, একবার দেখতে দেবে ?

রাকা এগিয়ে দিল, ইন্দ্রজিৎ সেটা নিয়ে পাতা উল্টে বললো, 'তিথিডোর'। বুদ্ধদেব বসু। তুমি বুঝি বুদ্ধদেব বসুর লেখা পছন্দ করো ? ভদ্রলোক খুব রোমান্টিক। রিয়েলিজ্‌মের ধার ধারেন না।

রাকা বললো, রোমান্টিক হওয়া বুঝি খারাপ ?

ইন্দ্রজিৎ ভরাট গলায় হেসে উঠলো। তার হাসি ঘরের শিলিং ছুঁয়ে ছড়িয়ে গেল অনেকটা জায়গায়।

ইন্দ্রজিৎ আবার বললো, না, খারাপ কেন হবে ? তোমার বয়েসী মেয়েদের...তুমি তুর্গেনিয়েভের লেখা পড়েছো ? বুদ্ধদেব বসুই এক জায়গায় লিখেছেন, ষোলো-সতেরো বছর বয়েসে যে-সব ছেলেমেয়ে তুর্গেনিয়েভের লেখা পড়েনি, তাদের জীবনটাই ব্যর্থ।

রাকা সঙ্গে সঙ্গে নামটা মুখস্ত করে নিল।

ইন্দ্রজিৎ বললো, এই 'তিথিডোর' বইটা আমার পড়া নেই। তোমাদের বাড়িরই তো বই, এটা আমি নিয়ে যাবো ? সুকান্তর হাতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবো।

বইটা সেবন্তীর। সেবন্তী তাঁর কুমারী জীবনের সঞ্চিত কিছু বই নিয়ে এসেছিলেন এ বাড়িতে। বইয়ের ব্যাপারে তিনি খুব স্পর্শকাতর। তবু মাকে জিজ্ঞেস না করেই এই একজন অচেনা মানুষকে রাকা বইটি দিতে রাজি হয়ে গেল কেন ?

আর কোনো কথা হলো না। তবু ওপরে গিয়ে রাকার কানে বার বার বাজতে লাগলো, তুমি কে ? তুমি কে ? সামান্য একটা কথা, অথচ তার অনুরণন থামে না।

এটা রাকাদের বাড়ি। একজন অচেনা মানুষকে রাকার যে প্রশ্নটা করা উচিত ছিল, অচেনা মানুষটিই তাকে সেই প্রশ্ন করে বসলো ?

কী মর্মভেদী ওর দৃষ্টি ! সরল, অলজ্জিত। নিছক লোভীর দৃষ্টি নয়, অথচ একটুখানি লোভ আছে, শুধু রূপ মুগ্ধতা নয়, কিছুটা, আর খানিকটা কৌতূহল, আর যেন স্বাভাবিক অধিকারের ইঙ্গিত। রাকার সর্বাঙ্গে লেগে রইলো সেই দৃষ্টির আঁচ। ক্ষণে ক্ষণে তার রোমাঞ্চ হচ্ছে। এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। পড়ায় আর মন বসলো না, ছটফটিয়ে উঠে গেল এখানে সেখানে, সেই একটা বিরল দিন, যেদিন সেবন্তী সুস্থ ছিলেন, আলমারির সব জামা-কাপড় বার করে গুছোচ্ছিলেন মন দিয়ে, কিন্তু মায়ের ঘরে একবার উঁকি

দিয়েও মায়ের সঙ্গে কথা বললো না রাকা। শরীরের এই জাগরণের কথা মাকেও বলা যায় না।

এক সময় রাকা অনেকক্ষণ বাথরুমের দরজা বন্ধ করে রইলো। দরজার পেছনে একটা প্রমাণ আকারের আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় কাটাবার নারী-সুলভ রোগ এখনো ধরেনি তাকে, এখনো সে ততটা নারী হয়নি, নিজের পোশাক-খোলা শরীরের দিকে তাকাতে তার লজ্জা করে। রজস্বলা হবার পর বাথরুমের মতন বিচ্ছিন্ন নিভৃত জায়গাতেও রাকা সম্পূর্ণ বিবসনা হয় না।

সেদিন রাকা শুধু বুকের জামা খুলে দাঁড়িয়েছিল আয়নার কাছে। নিজের বুক সম্পর্কে তার এমন একটা আশঙ্কা আছে, যা এ পর্যন্ত বলা হয়নি কারুকে।

রাকার দু' দিকের বক্ষ জেগেছে। সমবয়েসী মেয়েদের তুলনায় রাকার শরীর যৌবনতী হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি, বুড়িমা বলেন বাড়বাড়ন্ত। গত বছর থেকে হঠাৎ সে লম্বা হতে শুরু করেছে অনেকখানি, চুলের গোছ ঘন হয়েছে, হাত দু'খানিতে এসেছে সুগোল মসৃণতা, বুকের দু' পাশে সুমেরু পর্বতের চূড়া। আগে রাকা এমনকী ডিকশনারিতেও স্তন শব্দটি দেখতে লজ্জা পেত, এখন কাব্য, সাহিত্যে বার বার পায় এর বর্ণনা, রাকা মাঝে মাঝে নিজের দুটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

রাকার ধারণা, তার দুটি স্তন সমান নয়, ঈষৎ ছোট বড়, বাঁ দিকেরটা একটুখানি চাপা। যতবার দেখে, তার সেই ধারণা দৃঢ় হয়। মাখনের মতো রং, মাঝখানটায় লালচে আভা, কিন্তু ডান দিকের চেয়ে বাঁ দিকের বৃন্তটি সামান্য ছোট নয়? আজই প্রথম রাকার চোখে জল আসে। সবাই যে তাকে সুন্দর বলে, সে কিসের সুন্দর, তার যে শরীরে খুঁত আছে, কেউ জানে না! মিথ্যেমিথ্যি সে লোকের প্রশংসা পাচ্ছে, এটা তার প্রাপ্য নয়, দু'তিন প্রস্থ পোশাকে ঢাকা থাকে বুক, কিন্তু শরীরের এই খুঁতের কথা কি কারুকে জানিয়ে দেওয়া যায়?

ইন্দ্রজিৎ শুধু তাকিয়েছিল তার দিকে, তার শরীর ও রূপ নিয়ে কোনো কথা বলেনি, বরং পড়াশুনোর কথা তুলে মনের চর্চা করেছিল।

খানিক পরে বুক ঢেকে, চোখের জল মুছে রাকা আয়নায় নিজের বদলে দেখতে লাগলো ইন্দ্রজিৎকে। মৃদু গলায় রাকা বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তুমি কে? তুমি কে?

এর পর আরও কয়েকবার এসেছে ইন্দ্রজিৎ, এ বাড়িতে সে ব্যাডমিন্টন

খেলে গেছে, রাকার সঙ্গে দুটো-একটা কথা হয়েছে মাত্র, কিন্তু প্রত্যেকবারই তার দৃষ্টিতে রাকার শরীরে যে জলতরঙ্গ বেজেছে, তা নিশ্চয়ই ইন্দ্রজিৎ জানে না। ও রকম হয় বলেই রাকা ইন্দ্রজিতের সঙ্গে কখনো যেচে কথা বলতে যায়নি, ইচ্ছে করে চলে গেছে আড়ালে।

তারপর ইন্দ্রজিৎ একদিন এলো শুধু রাকারই জন্য। ঠিক মতন সময় বেছে নিয়ে।

মা নেই, দুপুরগুলি বড় নিঃস্ব। পরীক্ষার পড়া পড়তে পড়তে এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে রাকার ইচ্ছে করে চিঠি লিখতে। কিন্তু কাকে লিখবে? দিদিমা ছাড়া চন্দ্রমৌলিকে কয়েকখানা শুধু চিঠি লিখেছিল রাকা। এখন চন্দ্রমৌলির ঠিকানা কেউ জানে না, সুকান্তও জানে না, তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন আফ্রিকার অরণ্যে।

তাপসীর জন্যও রাকার মন খারাপ হয়। কিন্তু তাপসীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না। এত কম সময়ে এমনভাবে বদলে গেল তাপসী? সাইকেল চুরির জন্য সে বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খারাপ কথা বলছিল। যে গণা নামের রাক্ষসটি তার বুক চিরে দিয়েছে, সেই গণা তার পরিত্রাতা? খারাপ কথা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না রাকা, তার গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে। তাপসীর ঘরের জানলায় দড়িতে ব্রা-শায়া-জাঙ্গিয়া টাঙানো ছিল রোদে শুকোবার জন্য, রাস্তা থেকে দেখা যায়, এ রকম তো রুচি ছিল না তাপসীর!

তাপসীর কথা ভাবলেই রাকার চোখে ভাসে তার বুকের সেই নোখের চেরা দাগ। মনে পড়তেই রাকার কর্ণমূল রাঙা হয়ে যায়। কী অবলীলাক্রমে তাপসী ব্লাউজ টেনে নামিয়ে দেখালো তার শ্যামবর্ণ স্তন। পৃথিবীর কারুকে কোনোদিন রাকা তার বুক দেখাবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।

এরই কিছুদিন পর দুপুর পৌনে তিনটেয় এলো ইন্দ্রজিৎ। সুকান্ত আর তৃণীর দু জনেই কলকাতায় গেছে। দোতলার ঘরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে খাটের ওপর মেলে রাখা একটা চওড়া খাতায় পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখতে লিখতে ছবি আঁকতে শুরু করেছিল রাকা, এমন সময় বাইরের গেট খোলার ক্যাঁচ করে শব্দ হলো, ডেকে উঠলো ওদের কুকুর।

এ সময় দু-একটি ফেরিওয়ালা ছাড়া কেউ আসে না, কুকুরের ভয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো রাকা।

বাগানের মাঝখানে মোরাম বিছানো পথ দিয়ে মশমশ করে হেঁটে আসছে ইন্দ্রজিৎ, সরু পা-জামা ও কাঁধের কাছে কারুকার্য করা পাঞ্জাবি পরা, পায়ে ফুল

বসানো কোলাপুরি চটি, কুকুরটাকে সে গ্রাহ্য করলো না, কুকুরটাও তাকে কিছুটা চিনতে পেরে আওয়াজ নরম করে ফেলেছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে সে ওপরের দিকে তাকালো। জানলার ফ্রেমে রাকার শরীর দেখে সে একটুও আশ্চর্য হলো না, যেন সে জানতোই রাকা তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। মুখে হাসি ফুটিয়ে, একটা হাত তুলে সে বললো, রাকা, নীচে এসো!

আলুথালু করে একটা শাড়ি পরে ছিল রাকা, শুধু সে সেটাকে ঠিক করে নিল, চুল আঁচড়ালো না, অন্য কোনো রকম সাজগোজ যোগ করলো না, তার বুকের মধ্যে যেন দামামা বাজছে, তার ভয় হচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ সেই শব্দ শুনতে পাবে না তো? ইন্দ্রজিতের সেই হাতছানি দিয়ে ডাক, তাতেই আজ শুধু শিহরন নয়, প্রবল ঢেউ উঠেছে শরীরে।

রাকা নীচে পৌঁছোনোর আগেই ইন্দ্রজিৎ সুকান্তর ঘর খুলে বসেছে ইজি চেয়ারটাতে, ফ্যান খুলে নিয়েছে, ধরিয়েছে সিগারেট। রাকাকে দেখে সে একেবারে সাদামাটা ভাবে বললো, এসো রাকা, পড়াশুনো করছিলে? পরীক্ষার আর উনিশ দিন বাকি,তাই না? কেমন প্রিপারেশান হলো?

রাকা সামান্য মাথা হেলিয়ে বললো, ভালো।

ইন্দ্রজিৎ বললো, বাঃ! বোসো, এক বেলা না পড়লে কিছু ক্ষতি হবে না। মাঝে মাঝে একটু আধটু ডিভিয়েশান দরকার, তাতে কনসেনট্রেশান বাড়ে, আমার পরীক্ষার আগে···

হৃৎস্পন্দনের বাড়াবাড়ি ঢাকবার জন্য রাকার কিছু বলা দরকার। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এ সময় কোথা থেকে···সুকান্তদা রোজ কলকাতায় যায়, ফিরতে ফিরতে নটা-দশটা···

ইন্দ্রজিৎ বললো, জানি। আমি তোমার কাছেই এসেছি। আগে এক গেলাস জল খাওয়াও।

এ ঘরেই জলের জাগ ও গেলাস থাকে, জল গড়িয়ে রাকা এমনভাবে গেলাসটা এগিয়ে দিল যাতে আঙুলে-আঙুলে ছোঁয়া না লাগে। স্পর্শ তো আর সামান্য ব্যাপার নয়।

ঢক ঢক করে জলটা শেষ করার পর গেলাসটা ফেরৎ না দিয়ে নীচে নামিয়ে রাখলো ইন্দ্রজিৎ। জিজ্ঞেস করলো, তুমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কী করবে? কলেজে পড়বে নিশ্চয়ই। কোথায়?

রাকা বললো, এখনো ঠিক করিনি।

ইন্দ্রজিৎ বললো, এখানকার কলেজে খবর্দার ভর্তি হয়ো না। কলকাতায় চলে যাবে। তোমার বাবার মিন্স আছে, তিনি তোমাকে হস্টেলে রাখতে পারবেন। মফঃস্বলে পড়ে থাকলে তোমার জীবনের গণ্ডি বাড়বে না। ছোট জায়গায় তোমাকে মানাবে না। কলকাতা থেকে তুমি দিল্লির জে এন ইউ-তে চলে যেতে পারো।

রাকা ভেতরে ভেতরে বিস্মিত হচ্ছে। এই সব কথা বলার জন্য দুপুর রোদ্দুরের মধ্যে চলে এসেছে ইন্দ্রজিৎ ?

এবারে সে বাঁ হাতের দুটো আঙুল তুলে বললো, তোমার কাছে দুটো জরুরি ব্যাপারে এসেছি। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঐ চেয়ারটায় বসো।

রাকা একটু দূরের একটা চেয়ারে বসার পর মুখ তুলতেই ইন্দ্রজিৎ সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে বললো, তার মধ্যে প্রথম জরুরি কাজটা হলো তোমাকে ভালো করে দেখা।

সত্যি সত্যি দুটো আলো জ্বালবার মতন চোখ করে সোজাসুজি সে তাকিয়ে রইলো রাকার দিকে।

রাকার বুকের শব্দ থেমে গেছে, সারা শরীরটা যে একটু একটু কাঁপছিল, সেটা রয়েছে এখনো। তার হঠাৎ সন্দেহ হলো, ইন্দ্রজিৎ কি তাকে নিয়ে কোনো কৌতুক করতে এসেছে ?

ইন্দ্রজিৎ এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলো তার দিকে।

এই মানুষটি অবশ্য রাকার কাছে সম্পূর্ণ অচেনা নয়। এখন আর সে 'তুমি কে ?' জিজ্ঞেস করবে না। সে জানে, সুকান্তর স্কুল জীবনেরই শেষ দিন থেকে বন্ধু এই ইন্দ্রজিৎ। ইটাচুনার জমিদারদেরই একটা শাখা বংশের ছেলে। সেই জন্যই তার একটা সহজাত আত্মপ্রত্যয়, বনেদি বিশিষ্টতা আছে। ইন্দ্রজিৎ নিজে যদিও তা অস্বীকার করে। সুকান্ত আর ইন্দ্রজিতের এ বিষয়ে আলোচনা কিছু কিছু শুনেছে রাকা। সুকান্ত কখনো ইন্দ্রজিৎকে 'তোর এমন জমিদারি মেজাজ' বলে ঠাট্টা করলে ইন্দ্রজিৎ বলেছে, ধুস্, জমিদার বলে এখন আর কিছু আছে নাকি ? বনেদি আবার কী, গোটা বাংলাদেশে কোনো বনেদি পরিবার নেই। এমন কোনো ফ্যামিলি নেই, দুশো-আড়াইশো বছরের বেশি যাদের হিস্ট্রি ট্রেস করা যায়। দুশো-আড়াইশো বছর আবার হিস্ট্রি নাকি ? এক একটা ব্রিটিশ লর্ড ফ্যামিলি অন্তত সাত-আটশো বছরের পুরোনো, আমরা খাঁটি বাঙালী নই, তা জানিস তো ? অবশ্য বাংলাদেশে ক'টা খাঁটি বাঙালী আছে, তাতেও সন্দেহ। সবাই তো দো-আঁশলা। আমরা আসলে ছিলাম বর্গী। আমার পূর্ব

পুরুষ মহারাষ্ট্র থেকে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে ঝড়ের মতন ছুটে আসতো সোনার বাংলা লুঠপাট করতে। ভাস্কর পণ্ডিত মারা যাবার পর বর্গীর হাঙ্গামা থেমে যায়, এটাই সবাই জানে, কিন্তু অনেক বর্গী যে বাংলার নরম মাটির টানে এখানেই থেকে গিয়েছিল, তা অনেকে জানে না। বর্ধমান, মেদিনীপুরে এরকম অনেকগুলো বর্গী ফ্যামিলি আছে। আমরা আগে ছিলাম মুজুমদার, মজুমদার নয়, মারাঠা মুজুমদার, পরে চৌধুরী হয়ে বাঙালীদের সঙ্গে মিশে গেছি।

এই সব কথা শুনে রাকার আরও বিস্ময়-মুগ্ধতা জন্মেছিল। ইন্দ্রজিৎ উঠে এসেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে, বর্গী হিসেবে স্পষ্ট স্বীকৃতি দেবার জন্য তাকে আরও তেজীয়ান মনে হয়। রাকার বাবার নাম সোমনাথ, ঠাকুর্দাকে সে দেখেনি, তাঁর নাম ছিল ভূপেন্দ্রনাথ, তাঁর আগের কারুর নামও জানে না রাকা, তাদের বংশে কোনো ইতিহাসের চিহ্ন নেই।

ইন্দ্রজিৎ চেয়ে আছে, রাকাও চোখ নামিয়ে নেয়নি। যেন স্ট্যাচু খেলছে দুজনে। তাকে যেমন আর কেউ দেখেনি এমন করে, সেও তো আর কোনো যুবকের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে থাকেনি এতক্ষণ ধরে। ইন্দ্রজিতের মসৃণ দাড়ি কামানো গালে নীলচে আভা।

ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি যা ভেবেছিলাম তা ঠিকই। এবার দ্বিতীয় জরুরি কথাটা বলি ?

রাকা এবার চোখ সরিয়ে মাথা ঝোঁকালো।

ইন্দ্রজিৎ বললো, রাকা, তোমার আঠেরো বছর বয়স হয়ে গেছে। তুমি এখন অ্যাডাল্ট। আগে তুমি ছিলে লিট্‌ল প্রিন্সেস, এখন কোয়ায়েট আ বিউটিফুল লেডি।

লিট্‌ল প্রিন্সেস শুনেই এক ঝলক ভেসে উঠলো চন্দ্রমৌলির মুখ। রাকা চায়, ঐ কথাটা তাকে যেন আর কেউ না বলে।

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে খোলাখুলি সব কথা বলতে পারি তো ?

রাকা আবার মাথা হেলালো।

ইন্দ্রজিৎ বললো, গুড ! আমি এখন ইটাচুনায় বেশি থাকি না, মাঝে মাঝে উইক এন্ডে আসি, আলিপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে, ওদিকে আমাদের একটা ফ্যাকট্রিও আছে, সেটার কাজ কিছু কিছু দেখছি। আজ কলকাতা থেকে সোজা এখানে এসেছি শুধু তোমার সঙ্গেই দেখা করার জন্য। তার কারণটাই বলছি। আমার দুটি গার্ল ফ্রেন্ড আছে। বনানী আর মুকুলিকা, এদের মধ্যে কাকে যে আমি বেশি পছন্দ করি, না দু জনকেই ভালো লাগে, দু জনের সঙ্গে

আলাদা আলাদা ভাবে মিশি, ওরাও তা জানে, আমি কিছু গোপন-টোপন রাখতে পারি না, তাছাড়া ওরা নিজের থেকে না এলে আমি আর ওদের পিছু ধাওয়া করবো না, এটা আমার স্বভাব, বাজে স্বভাবও বলতে পারো। তবে মুকুলিকা আর বনানী দু জনেই জানে, একটু একটু রাগ করে, কিন্তু আলাদা ভাবে দেখা হয়।

রাকা আবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এবার বুকের মধ্যে নয়, বাইরে, অনেক কিছু ভাঙছে, কাচের মতন ঝনঝন শব্দ করে ভেঙে পড়ছে। যে মানুষটি প্রথম দিন শুধু দৃষ্টি দিয়ে তার সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল, সে তার প্রিন্স চারমিং নয়, সে রাজপুত্রের মতন সাজ করে এলেও আসলে এক রূপ-দস্যু। এর মধ্যেই রাকা বুঝতে পেরে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, ওদের মধ্যে মুকুলিকা বেশি ফ্রি, বাড়ি থেকে যখন তখন বেরুতে পারে, একটা কলেজে সদ্য পড়াচ্ছে, যদিও আমার মনে হয় টিচিং ওর ঠিক যোগ্য লাইন নয়, ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনিং নিলে, যাক, সে অন্য কথা। মুকুলিকার কোনো ইনহিবিশান নেই, ইনহিবিশান কাকে বলে জানো তো ? না জানলেও বুঝে ফেলবে, যেমন ধরো, অনেক মেয়েকে চুমু খেতে চাইলে খুব আপত্তি করে, আসলে সেটা ন্যাকামি, মনে মনে ইচ্ছে আছে, মুকুলিকা সে রকম নয়, ও আমার খুব ভালো বন্ধু, লম্বা, সুন্দর চেহারা. ও আমার প্রত্যেকটি কথা ঠিক ঠিক বোঝে। কদিন আগে, এই পরশুদিন মুকুলিকাকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম গঙ্গায় বেড়াতে, উট্রাম ঘাটের কাছে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, এরকম গরমকালে দারুণ হাওয়া, ইচ্ছে করলে তুমি সূর্যাস্ত দেখতে পারো, তারপর অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না, পাশ দিয়ে অন্য নৌকো চলে গেলে শোনা যায় দাঁড়ের শব্দ, কিংবা দূরে স্টিমারের ভোঁ, তুমি কখনো যাওনি, রাকা ? তোমাকে একদিন নিয়ে যাবো, যদি যেতে চাও, সাঁতারটা শিখে রাখলে কোনো ভয় নেই। বনানী যেতে চায় না, ও জলকে ভয় পায়, আমি আর মুকুলিকা মাঝে মাঝেই নৌকো ভাড়া নিয়ে দু-তিন ঘন্টা ঘুরি, কলকাতায় এর চেয়ে ভালো বেড়াবার জায়গা আর নেই, ওখানে ইচ্ছে করলে আদর-টাদরও করা যায়। মাঝিরা কিছু বলে না, তারা উল্টোদিকে গিয়ে বসে থাকে।

যে-কোনো গল্প শুনলেই রাকা মনে মনে সেই দৃশ্যটা রচনা করে। কিন্তু অন্ধকার গঙ্গায় নৌকো বিহারের ছবিটা রাকা কিছুতেই কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে না, ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছে তার মন, ইচ্ছে করছে দোতলার ঘরে ছুটে গিয়ে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের ইতিহাসে আবার ডুবে যেতে, মাঝখানের এই সময়টুকু

মুছে ফেলে সে ভাববে, ইন্দ্রজিৎ আজ আসেনি।

যেন এতক্ষণেও মুকুলিকাকে যথেষ্ট আঘাত দেওয়া হয়নি, তাই ইন্দ্রজিৎ আবার বললো, মুকুলিকা আমার পাশে বসে ছিল, মাঝে মাঝে ওর মাথাটা রাখছিল আমার বুকে, একবার আমি দু হাতে ওর মুখটা ধরে চুমু খেতে গেলাম। তারপরেই সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটলো। আমি যা বলছি, তা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, রাকা, এর একটি অক্ষরও মিথ্যে নয়! মুকুলিকার মুখটা আমার খুব কাছে, তখন আমি দেখতে পেলাম, সেই অন্ধকারের মধ্যেও আর একটি মুখ, একটি প্রায়-কিশোরীর লাবণ্যমাখা মুখ, মুকুলিকার বয়েস তেইশ-চব্বিশ, তার চেয়ে অনেক কম বয়েসী, চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না, সেই মুখখানা তোমার, রাকা!

রাকা কেঁপে উঠলো না, মূর্ছিত হয়ে পড়লো না, সে নিস্পন্দ মুখে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো।

ভুরু ও কপালে যথার্থ বিস্ময় ফুটিয়ে ইন্দ্রজিৎ বললো, আমি দারুণ চমকে উঠেছিলাম। এটা কী করে সম্ভব হলো? আমি তো তোমার কথা আগে সে রকমভাবে কখনো ভাবিনি, তোমাকে এখানে দু-চারবার দেখেছি, একটা বাচ্চা মেয়ে বলেই ভেবেছি, তুমি খুবই আকর্ষণীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি কখনো সে রকমভাবে··· মুকুলিকা আমার জেনুইন বন্ধু, কিন্তু তার মুখটা সরিয়ে দিয়ে তোমার মুখ··· তাহলে আমার মনের মধ্যে তোমার জন্য এতখানি জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছিল? আমি নিজে আগে কিছুই বুঝতে পারিনি! দু দিন ধরে এই কথাটাই ভেবেছি।

ঝট করে উঠে এসে ইন্দ্রজিৎ রাকার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো।

তার গলায় কোনো আবেগ নেই, রয়েছে সত্যভাষীর দৃঢ়তা। সে বললো, আমাকে ভুল বুঝো না, রাকা। আমার মনের মধ্যে তোমার একটা বিশেষ স্থান আছে, আমি অনুভব করেছি। আমি এখানে এসে অন্য একটা মেয়ে মুকুলিকার প্রসঙ্গ না টেনে বলতে পারতাম, তোমায় আমি খুবই পছন্দ করি, তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু মিথ্যে কথা আমি ঘৃণা করি, ভণ্ডামি দু চক্ষে দেখতে পারি না, যা ঘটেছে ঠিক তাই তোমাকে জানালাম।

রাকাও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার মুখমণ্ডল পলাশ ফুলের মতন রক্তবর্ণ।

ইন্দ্রজিৎ তার কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে বললো, তোমাকে আমি একটা চুমু

খেতে চাই, রাকা।

রাকার মুখ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো, ছিঃ !

নিজের ঠোঁট নিষ্পাপ রেখেছিল রাকা। তার স্বপ্ন ছিল, প্রথম যে আসবে, সেও তার জীবনে প্রথমবারই অমৃতের স্বাদ দেবার ও নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবে। তার বদলে এলো এক অভিজ্ঞ পুরুষ, এক ভালোবাসার জুয়াড়ি। রাকার যে কী কষ্ট হচ্ছে, তা এই মানুষটি কিছুই বুঝবে না।

ইন্দ্রজিৎ এক অবোধ বালিকাকে বোঝাবার ভঙ্গি করে বললো, এর মধ্যে ছিঃ ছিঃ কিছু নেই। তুমি এখন বড় হয়ে গেছ। এখন একটা চুমু খাওয়া তো অপরাধ নয়। যৌবনের এক একটি দিন চলে যাওয়া মানেই এক একটা দিন নষ্ট হওয়া, সে দিনটা আর ফিরে আসবে না।

রাকা বললো, আমি তো ইনহিবিশান ত্যাগ করে নিজে থেকে আপনার কাছে আসিনি !

ইন্দ্রজিৎ হাসবার চেষ্টা করে বললো, তার মানে তুমি ইনহিবিশানের মানে করেছো ভয়। দুটো এক নয় মোটেই। আস্তে আস্তে তোমার ভয় ভাঙাতে হবে।

—আপনি আমাকে ছেড়ে দিন '

বলার সঙ্গে সঙ্গে রাকা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল দরজার কাছে।

ইন্দ্রজিৎও অতি দ্রুত হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলো রাকার উড়ন্ত আঁচল। দু জনে পরস্পরের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

রাকা অচঞ্চল গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমার ওপর জোর করবেন ?

সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে প্রেমিক যুবাটি বললো, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী কক্ষনো কারুর ওপর জোর করে না। ভয়ের কিছু নেই, রাকা। আমি তোমাকে ব্যথা দেবো না, আর কিছু করবো না। শুধু একবার তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে··· এ জন্য আমার বুকটা হু-হু করছে।

রাকা বললো, আপনি কী চান বা চান না, তা জানার কোনো আগ্রহ আমার নেই। আপনি প্লিজ এ ধরনের কথা আর আমাকে বলবেন না।

এবার রাকা ছুটে চলে গেল দরজার বাইরে। ইন্দ্রজিৎও ধেয়ে এলো।

ভেতরের বারান্দায় এসে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলো না রাকা, ইন্দ্রজিৎ কোনাকুনি সেদিকে গিয়ে পথ আটকেছে। তারপর সে আবার ধরতে আসতেই রাকা এঁকে বেঁকে ছুটতে লাগলো বারান্দায়। ইন্দ্রজিৎ মনে করছে যেন এটা একটা খেলা। হাসতে হাসতে বলছে, ভয় নেই তোমার, আমি তোমার কোনো

ক্ষতি করবো না। সেটা প্রমাণ করতে দাও।

আর একবার ইন্দ্রজিৎ তার হাতটা শুধু ছুতেই রাকা পাশ কাটিয়ে উঠে পড়ল সিড়িতে, ইন্দ্রজিৎ বেশ চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও!

ছেলেটা পাগল নাকি? বুড়িমা রয়েছেন বাড়িতে। এখন তাঁর ঘুমের সময় হলেও চ্যাঁচামেচিতে জেগে উঠবেন, একটা নতুন মালি থাকে বাগানের পেছন দিকে, সে অলস বটে কিন্তু ডাকলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। কিন্তু সেরকম একটা ব্যাপার যে খুবই খারাপ হবে, তা কি ইন্দ্রজিৎ বোঝে না!

অসম্ভব ক্ষিপ্র ইন্দ্রজিতের শরীর। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেও রাকা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে পারলো না, দুই পাল্লার মধ্যে একটা পা গলিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বললো, পারবে না!

ঘরের মধ্যে এসে রাকাকে একেবারে দেয়ালের কোণে নিয়ে যাবার পর দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। মুখটা নামিয়ে আনতে আনতে বললো, ভয় নেই, ভয় নেই! কেন শুধু শুধু আজকের দিনটা চলে যাবে!

রাকা দু দিকে মুখ সরাতে সরাতে বললো, ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন।

ইন্দ্রজিৎ তাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে দিয়ে বললো, এই তো ছেড়ে দিলাম। আমি জোর করি না। এবারে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনো—

রাকা দাঁড়ালো না, জোরে ইন্দ্রজিৎকে ঠেলে দিয়ে একপাশ দিয়ে সে আবার দৌড়োলো। উঠে এলো ছাদে।

এবারেও সে দরজা বন্ধ করতে পারলো না পুরোপুরি। দু জনে ঠেলছে দু পাশ থেকে। রাকা জানে, সে গায়ের জোরে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে পারবে না। ঘাম এসে গেছে তার পিঠে, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে দুলছে তার মুখ।

সে আচমকা দরজাটা ছেড়ে দিতেই ইন্দ্রজিৎ হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো ভেতরে।

রাকা দৌড়ে পাঁচিলের ধারে গিয়ে একটা পা তুলে বললো, এবার যদি আপনি আমাকে ছুঁতে আসেন, আমি ঝাঁপ দেবো, ঠিক ঝাঁপ দেবো, খবর্দার, আর কাছে আসবেন না।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়লো। স্ফুরিতাধরা, এলো চুল, বিস্রস্তবেশিনী রাকার দিকে চেয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর তার চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, নাঃ, আর তোমার কাছে যাবো না। মূর্খ মেয়ে, পরে ঠিক তোমাকে এই দিনটির জন্য অনুতাপ করতে হবে, দেখো! শুধু শুধু এক দিন নষ্ট হতে দিলে।

দরজার কাছে চলে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল, আবার আমি আসব।

॥ ৫ ॥

বিকেলবেলা আদালত থেকে ফিরে বাড়ির সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে চা খাওয়াটা ছিল সোমনাথের খুব প্রিয় সময়। কত তাড়াতাড়ি মানুষজন কমে গেল এ বাড়ি থেকে।

এখন এক একদিন সোমনাথ একাই বসেন বাগানেব খড়ের ঘরটায়। জুলাই মাসের আকাশে অনেকক্ষণ আলো থাকে। আলোর রং বদলায়, তারই মধ্যে হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামে। সিমেন্টের গোল টেবিলটায় রাখা পট থেকে ঢেলে ঢেলে সোমনাথ কাপের পর কাপ চা খেয়ে যান, দূর থেকে কী করুণ দেখায় তাঁকে। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে রাকা চুপ করে চেয়ে থাকে। রাকা মাঝে মাঝে গিয়ে বসে বাবার কাছে, কিন্তু একটু পরেই কথা ফুরিয়ে যায়, সোমনাথ যেন চুপ করে থাকতেই ভালোবাসেন। এমন কি কুকুরটাও নিঃশব্দে বসে থাকে তাঁর পায়ের কাছে। কুকুরটাও বুড়ো হয়ে গেছে।

এবার রাকারও চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে সে। তার বদলে বর্ধমানে পড়ার কোনো মানে হয় না। সোমনাথ নিজেই জোর করছেন, রাকা হস্টেলে থাকবে, বর্ধমান থেকে প্রত্যেকদিন ট্রেনে যাতায়াতের ধকল তাকে সহ্য করতে হবে না। রাকারও খুব ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে থাকার, আবার অনিচ্ছেও যথেষ্ট, বাবাকে ছেড়ে, এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই তার বুক টনটন করে। যদিও যখন তখন আসা যায়, তবু তো ছেড়ে যাওয়া!

একদিন সোমনাথ সেখান থেকে ডাকলেন, রাকা, রাকা, বুড়িদি, রাকাকে পাঠিয়ে দাও তো!

রাকা বাথরুমে গা ধুচ্ছিল, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসে বারান্দায় গিয়ে দেখলো, তাদের গেটের কাছে থেমে আছে একটা গাড়ি, বাগানের ঘরটায় পেছন ফিরে বসে আছে এক আগন্তুক। পিঠটা দেখলেই চেনা যায়। চন্দ্রমৌলি।

রাকা খালি পায়েই দৌড়ে নেমে গেল বাগানে।

চন্দ্রমৌলির চেহারার বিশেষ বদল হয়নি, শুধু যেন রোদে পোড়া তামাটে হয়েছে মুখের বর্ণ। আগের মতনই বলিষ্ঠ আকৃতি, প্রশস্ত বক্ষ, মাথা ভর্তি

কাঁচা-পাকা চুল, জুলফি দুটো লম্বা, তিনি পরে আছেন অনেকগুলো পকেটওয়ালা একটা হলদে রঙের বুশশার্ট ও খাঁকি কর্ডের ট্রাউজার্স, হাতে চুরুট।

চন্দ্রমৌলিকে দেখেই অনতি অতীতের কথা ভুলে গিয়েছিল রাকা, মাতৃশোক জাগেনি, বরং একটা আনন্দের আতিশয্যের উচ্ছ্বাসে ছটফটিয়ে উঠেছিল। চন্দ্রমৌলি তার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন, বললেন, কী রে, খুকি, কত বড় হয়ে গেছিস !

একটু থেমে আবার বললেন, খুকি, ধরে রাখতে পারলি না মাকে ?

সঙ্গে সঙ্গে রাকা দমে গেল। বাষ্প হয়ে উড়ে গেল খুশির উচ্ছ্বাস, মনে পড়ে গেল মায়ের শেষ দিনের কথাগুলো, অভিমানে ভারী হয়ে গেল বুক।

চন্দ্রমৌলি মোটামুটি সব জেনেই এসেছেন। আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন ন দিন আগে, বম্বেতে নেমে ঘুরে এসেছেন বস্তার, কলকাতায় এসে হোটেলে উঠেছেন পরশু। কলকাতার দু-একজন চেনা মানুষ তাঁকে শুনিয়েছে এ খবর।

চন্দ্রমৌলি জিজ্ঞেস করলেন, শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল ? কিসে—

সোমনাথ মৃদু গলায় বললেন, ঘুমের মধ্যে···হার্ট···এমনিতেই দুর্বল ছিল।

চন্দ্রমৌলি দুদিকে মাথা নাড়লেন আস্তে আস্তে। তিনি সোমনাথের কথাটা অবিশ্বাস করলেন, না সেবন্তীর মৃত্যুর বাস্তবতাই অস্বীকার করতে চাইলেন, তা বোঝা গেল না।

বেশিক্ষণ দুঃখের ঘোর নিয়ে বসে থাকা চন্দ্রমৌলির স্বভাবে নেই। খানিকবাদে শরীর ঝাড়া দিয়ে তিনি বললেন, কফি, একটু কফি খেতে ইচ্ছে করছে। কফি বানিয়ে আনতে পারবি খুকি ? ওদেশে থাকতে থাকতে কফি খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে।

রাকা চলে যাবার পর সোমনাথ বাইরের গাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, গাড়িটা এনেছো, ওটা কার ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, ভাড়া করে এনেছি, ট্রেনের ওপর ভরসা করা যায় না।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, গাড়িটা ছেড়ে দেবে, না ড্রাইভার এখানে থাকবে ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, ছাড়বো না। কথা হয়ে গেছে, রাত্তিরে বর্ধমান টাউনে থাকবে, আবার রিপোর্ট করবে কাল সকালে, আমাদের লাগতে পারে।

সোমনাথ বললেন, তুমি যার হাতে তোমার বিজনেস দিয়ে গিয়েছিলে, সেই

ভগৎরাম নামে লোকটি প্রতি তিন মাস অন্তর আমাকে টাকা পাঠিয়েছে, সব হিসেব করা আছে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, ওসব পরে হবে। ভগৎরামের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, লোকটা অনেস্ট। আফ্রিকাতেও আমার অনেক টাকা জমে গেছে। আমার ছেলেটা কোথায় বলো তো? যাদবপুরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সে এখন এখানেই থাকে।

সোমনাথ বললেন, একটু পরে এসে পড়বে। ও তো পাশ করে বসে আছে, চাকরি-বাকরির অবস্থা খারাপ, অনেক এঞ্জিনিয়ার এখন বেকার, বড় বড় কম্পানিগুলো ওয়েস্টবেঙ্গল থেকে কারখানা আর হেড অফিস গুটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য স্টেটে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, আমার ছেলেটা নকশাল হয়নি তা হলে? আফ্রিকায় বসেও কিছু কিছু খবর পেতাম। 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে যে ছেলেছোকরার দল স্লোগান দিয়েছিল, স্বয়ং চীনের চেয়ারম্যান তাদের ধমকে দিয়েছেন, এরাও বিপ্লব ডেকে আনতে পারলো না। এদিকে বয়স্ক বামপন্থীরা কিছুদিনের জন্য ক্ষমতা দখল করে, রাইটার্স বিল্ডিংসের চেয়ারে বসে রক্ত চাটা বাঘ হয়ে গেছে, এখন আবার ঐ রাইটার্স বিল্ডিংসের চেয়ারগুলোতে বসবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। আর কংগ্রেসীরা এতকাল মৌরসীপাট্টা গেড়ে বসেছিল, হঠাৎ একবার চেয়ার হারিয়ে তাদের দিশেহারা অবস্থা। এখন আবার চেয়ার দখল করবার জন্য তারা ন্যায়-নীতি সব বিসর্জন দিয়েছে, ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোনো উপায়ে তাদের আবার ঐ চেয়ার চাই। আদর্শ-টাদর্শ সব চুলোয় গেছে। এখন চলছে শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য বর্বর লড়াই।

সোমনাথ বললেন, আমি সরকারি চাকুরে, আমার পক্ষে রাজনীতির আলোচনা উচিত নয়।

চন্দ্রমৌলি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, তুমি যে এখনো পুরোনোপন্থী রয়ে গেছো হে, সেই ব্রিটিশ আমলে। এখন সরকারি কর্মচারিরাই তো বেশি রাজনীতি করে। কয়েকটা কাজের জন্য আমাকে দু-দিন কিছু গভর্নমেন্ট অফিস আর ব্যাঙ্কে ঘুরতে হলো কলকাতায়। সব জায়গায় রাজনীতির আলোচনার মত্ততা। পলিটিক্স হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় এটা বেশ সুট করে। কারণ রাজনীতির একটা সুবিধে, এতে বেশি কথা, তর্ক, চ্যাঁচামেচি করলেই হয়, কাজ করার দরকার

নেই। রাজনৈতিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কিতে আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান। পৃথিবীর আজ কোনো দেশে সরকারি কর্মচারি, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, শিল্পী-লেখক, বৈজ্ঞানিকরা এত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। পৃথিবীর আর কোনো দেশের এতটা অবনতি হয়নি ভারতের মতন। গত দশ বছরে পার ক্যাপিটা ইনকাম ঝাঁ ঝাঁ করে নেমে যাচ্ছে, অথচ কাজের সময় কিংবা উৎপাদন বাড়াবার দিকে কারুর মন নেই। তুমি বিশ্বাস করো সোমনাথ, আফ্রিকার দেশগুলোও আমাদের তুলনায় অনেক বেশি জাগছে। কেনিয়া-উগান্ডায় এখন আর কোনো মেথরানি মাথায় করে গুয়ের টিন বয়ে নিয়ে যায় না। কলকাতার মতন মানুষ দিয়ে মানুষ-বওয়া রিক্সা টানায় না।

কথা ঘোরাবার জন্য সোমনাথ বললেন, সুকান্ত অবশ্য একটা চাকরি পেয়েছে। দেবিকার বর সুরঞ্জন ব্যবস্থা করে দিয়েছে, রাঁচিতেই পোস্টিং।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন চন্দ্রমৌলি, আরও রেগে গিয়ে বললেন, চাকরি? ক পয়সা পাবে চাকরি করে? অবুঝমারে আমার অতবড় ব্যবসা পড়ে আছে।

সোমনাথ বললেন, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে জঙ্গলে যাবে, সেখানে ওর বিদ্যে কোন্ কাজে লাগবে?

চন্দ্রমৌলি বললেন, যে-কোনো বিদ্যাই সব জায়গায় কাজে লাগানো যায়। বিদ্যা মানে তো মনের ক্ষমতা বাড়ানো। ইনটিউশানকে পারসেপশানে পরিণত করা। ঠিক আছে, ঐ বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে ও নিজস্ব প্রোডাকশন শুরু করুক, যদি একটা কারখানা খুলতে চায়, সে টাকা আমি দেবো!

সোমনাথ বললেন, বেশ তো, সে বিষয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করো।

এই সময় রাকা একটা ট্রেতে করে কফি, আলাদা দুধ-চিনি, আলুভাজা ও মাছের ডিমের বড়া নিয়ে এলো।

চন্দ্রমৌলি রাকার দিকে ভালোভাবে তাকালেন না, এখনো তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়নি, তিনি বললেন, এত কিছুর দরকার ছিল না, শুধু কফি—

দুধ চিনি ছাড়া শুধু কালো কফি নিয়ে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিলেন দুবার। বাগানের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, গেটের ধারে চাঁপা গাছটা নেই।

সোমনাথ মৃদু গলায় বললেন, এবারের ঝড়ে…খুব জোর ঝড় হয়েছিল।

চন্দ্রমৌলি যেন শুনতে পেলেন না সে কথা। আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন, কী জমজমাট বাড়িটা ছিল, যেবারে ময়ূরটা নিয়ে এলাম, তিনটে মেয়েই বাড়িটা মাতিয়ে রেখেছিল, মেয়েরা থাকলেই বাড়িতে প্রাণ থাকে…

তারপর রাকাকে চমকে দিয়ে চন্দ্রমৌলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কয়েক লাইন ইংরিজি কবিতা উচ্চারণ করলেন :

In the greenest of our Valleys
  By good angels tenanted,
Once a fair and stately Palace—
  Radiant Palace—reared its head.

রাকার ধারণা ছিল, যারা খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, যারা ডাকাতের মুখোমুখি দাঁড়ায়, ভোজালি তুলে সাপ মারতে যায়, তারা কবিতা পড়ে না। চন্দ্রমৌলির চিঠির হাতের লেখা সুন্দর ছিল, এবারে এই দ্বিতীয় বিস্ময়।

লাইনগুলো শুনে চিনতে পারেনি রাকা, কিন্তু লাইনটি তার মনে গেঁথে গিয়েছিল, In the greenest of our Valleys....অনেকদিন পর রাকা জানতে পারে যে কবিতাটি এডগার অ্যালান পো'র লেখা, তাঁর "The Fall of the House of Usher' নামে বিখ্যাত গল্পটির মধ্যে আছে।

রাকা জিজ্ঞেস করলো, মৌলিকাকা, তুমি কি আবার আফ্রিকায় ফিরে যাবে ?

চন্দ্রমৌলি রাকার মুখের দিকে পুরো এক মিনিট স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন, তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে বললেন, কী করবো বল তো ? ফিরে যাবো, না থাকবো ?

বাবার তুলনায় চন্দ্রমৌলির শরীর এখনো অনেক সুঠাম। পরিষ্কার ঝকঝকে চোখ। সোমনাথের পুরু লেন্সের চশমা, চশমা খুললে চোখ দুটো একেবারে কোঁচকানো ও স্তিমিত মনে হয়, কাঁধ দুটোও ঝুঁকে পড়েছে। সেবন্তী চলে যাবার পর রাকা দু-একবার বাবাকে ব্যাডমিন্টন খেলায় প্রবৃত্ত করতে চেয়েছিল, সোমনাথ আর কিছুতেই রাজি হন না। একদিন রাকা ভালোবাসাময় ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, বাবা, তুমি এমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছো কেন ? তোমার এমন কিছু বয়েস হয়নি। সোমনাথ বলেছিলেন, কোর্টে খালি মানুষের অভিযোগ শুনতে হয়, ভালো-মন্দ বিচার করতে হয়। যারা অনবরত বিচার করে, তারা তাড়াতাড়ি বুড়ো হবেই। বিলিতি ছবিতে দেখবি, জজদের মাথায় পাকা চুলের উইগ থাকে।

আফ্রিকায় গিয়ে চন্দ্রমৌলি যেন তাঁর শরীরটা আরও মজবুত করে এনেছেন।

রাকা বললো, তোমার কি ওদেশ খুব ভালো লেগেছে ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগে রে। উগাণ্ডা আর কেনিয়ায় ছিলাম, ওখানে ঘন জঙ্গল তেমন নেই, কিন্তু প্রকৃতি অনেকখানি আদিম, মানুষ বিশেষ নষ্ট করতে পারেনি এখনো। তুই বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' পড়েছিস ? সেই চাঁদের পাহাড় আছে উগান্ডায়।

—সেই পাহাড়টার নাম কিলিমাঞ্জারো ?

—না রে, কিলিমাঞ্জারো আরও অনেক দূরে। সেই পাহাড়েও আমি তাঁবু খাটিয়ে থেকেছি। একজনের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। সবই ভালো ছিল, কিন্তু দেশের জন্য বড্ড মন কেমন করতো। বাইরে গিয়ে বুঝেছি, আসলে আমি কত দুর্বল !

—তা হলে আর ওখানে থেকো না। এখানে চলে এসো।

—তুই থাকতে বলছিস ?

এরপর তিনি সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি পাকাপাকি ফিরি, তাহলেও পশ্চিমবাংলায় থাকতে পারবো না, মধ্যপ্রদেশেই সেট্‌ল করতে হবে। পশ্চিমবাংলার দিন দিন যা অবস্থা হচ্ছে, দেখলে আমার যেমন কষ্ট হয়, তেমন রাগও হয়। দেশ ভাগের পর থেকেই পশ্চিমবাংলার সব দিক থেকে পতন শুরু হয়েছে, কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামাচ্ছে না। কলকাতা শহরটাই দুর্গন্ধে ভরা।

সোমনাথ বললেন, তুমি এসে পশ্চিমবাংলার জন্য কিছু চেষ্টা করো।

চন্দ্রমৌলি গর্জে উঠে বললেন, আমার যদি বয়েস কম হতো, আমি নকশাল হতাম। সব কিছু ভাঙচুর করে দেখতাম শেষ পর্যন্ত কী টিকে থাকে। পচন রোধ করা যায় কিনা। পচা জিনিসগুলো নির্দয়ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। শরীরের কোনো অংশ পচতে শুরু করলেও কেটে বাদ দিতে হয়।

সোমনাথ বললেন, ভাঙচুর করা সহজ। কিছু গড়ে তোলাই শক্ত কাজ।

সেই রাতে চন্দ্রমৌলির সঙ্গে সুকান্তর প্রচণ্ড ঝগড়া হলো।

সন্ধের পর থেকেই শুরু হয়েছিল ঝড়-বৃষ্টি, তূণীর আর সুকান্ত ফিরলো ভিজে শপশপিয়ে। সুকান্ত বাবাকে দেখে খুশি বা বিস্ময়ের ভাব কিছুই দেখালো না, শুধু জিজ্ঞেস করলো, তুমি কখন এলে ?

চন্দ্রমৌলি তূণীরের সঙ্গে গল্প করলেন কিছুক্ষণ, তার পর সুকান্তর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটু পরে দু জনেরই কণ্ঠস্বর চড়তে লাগলো, চন্দ্রমৌলির গলা এমনিতেই গমগমে, সুকান্ত কোনোদিন এত জোরে কথা বলেনি, এ বাড়িতেই কেউ কখনো কথাবার্তা এত উচ্চগ্রামে তোলেনি।

তর্ক-বিতর্কের পর তর্জন-গর্জন, দু পক্ষই সমান, ঘরের দেওয়াল যেন ফেটে পড়বে, আশঙ্কা হতে লাগলো, পিতা-পুত্রে হাতাহাতি শুরু হয়ে না যায়। চন্দ্রমৌলি অনেক বেশি বলশালী, তাঁর কাছে কিছু না কিছু অস্ত্র থাকে, অবিমৃষ্যকারীর মতন হঠাৎ কিছু করে বসবেন না তো !

তূণীর আর রাকা সোমনাথের দিকে তাকায়। সোমনাথ মাথা নেড়ে বললেন, ওদের একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। তোমরা বাধা দিতে যেও না !

তূণীর আর রাকা আড়ষ্টভাবে বসে রইলো ওপরে। তাদের দু'জনেরই সহানুভূতি সুকান্তর দিকে। সোমনাথ কক্ষনো ছেলেমেয়েদের কঠোর কথা বলেন না, চন্দ্রমৌলি হঠাৎ আফ্রিকা থেকে এসে ছেলেকে এমন বকুনি দেবেন কেন ? এতদিন তো তিনি ছেলের কোনো খবরও নেননি।

ঝড়বৃষ্টি যেমন থামে, সেই রকমই এক সময় নীচের ঘরটি স্তব্ধ হয়ে গেল। চন্দ্রমৌলি দুমদাম করে ওপরে এসে একটা বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মাথায় একবার আগুন জ্বললে নিভে যাবার পর আসে বিষাদ ও অবসন্নতা। সুকান্ত ও চন্দ্রমৌলি দু'জনেই ঘোষণা করলেন যে, রাত্রে কিছু খাবেন না। সোমনাথ জোরজার করে তাঁদের এনে বসালেন খাওয়ার টেবিলে।

বড় গোল টেবিল, ছ'খানা চেয়ার। এক সময় এ বাড়িতে ঠিক ছ'জন একসঙ্গে খেতে বসত, বুড়িমা বরাবর আলাদা। তিনি টেবিলে খাওয়া পছন্দ করেন না, সকলের শেষ হলে তিনি মেঝেতে আসন পেতে বসেন। আজ সুকান্ত ও চন্দ্রমৌলি দু'জন অতিরিক্ত, তবু একটা চেয়ার খালি রইল, ঐ চেয়ারটা সেবন্তীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। চন্দ্রমৌলি যেবার সুকান্তকে নিয়ে প্রথম এসেছিলেন, সেই রাত্রে, রাকা খুব ছোট ছিল বলে তাকে আগে খাইয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল, রাকা কিছুতেই রাজি হয়নি, সে কান্নাকাটি করে বড়দের সমান মর্যাদা পেতে চেয়েছিল, তার স্পষ্ট মনে আছে। শেষ পর্যন্ত একটা টুল এনে দেওয়া হয়েছিল রাকার জন্য। সেবন্তী সেদিন পরিবেশন করেছিলেন, কত রকম কৌতুকের কথা হয়েছিল।

চন্দ্রমৌলি বসতে গিয়ে সেবন্তীর খালি চেয়ারটার দিকে একবার তাকালেন।

খানিকক্ষণ আগেকার ঝগড়ার কথা কেউ উল্লেখ করলেন না, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু বুড়িমা এ নিয়ম মানেন না। তিনি চন্দ্রমৌলির থালায় ভাত দিতে দিতে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, মৌলি, তুমি ছেলেটাকে অত বকছিলে

কেন ? ছেলে কি আর ছোট আছে, সে এখন কত বড়, এঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে, তাকে কি এমন করে বকতে হয়, ছিঃ !

চন্দ্রমৌলি একটা বেগুনভাজা ছিঁড়ছিলেন, থেমে গিয়ে মুখ তুলে চাইলেন। খানিকটা লজ্জা, খানিকটা অসহিষ্ণুতার সঙ্গে বললেন, আমি ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়েছি, তাই না ? আমার গলা একটুতেই উঁচুতে উঠে যায়। আমি অন্যায় করেছি, ক্ষমা চাইছি, বুড়িদি। তোমাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

সুকান্ত মুখ গোঁজ করে বসে আছে, টেবিলের দিকে চোখ। এবার সুকান্তর দিকে চেয়ে চন্দ্রমৌলি বললেন, তোমরা সবাই শুনে রাখো, আমি শেষকালে আমার ছেলের কাছেও ক্ষমা চেয়েছি। সত্যি চেয়েছি কি না, ওকে জিজ্ঞেস করো।

সুকান্ত কোনো উত্তর দিল না, সাড়াশব্দ করলো না।

চন্দ্রমৌলি আবার খানিকটা আত্মগ্লানির সঙ্গে বললেন, আমি আর ওকে বকবো না, সব সেটেলড্ হয়ে গেছে। ও আমার ব্যবসা দেখতে চায় না। অবুঝমারে আমার সব কিছু পড়ে আছে, ও সেখানে যাবে না। ও চাকরি করবে ! অন্যের চাকরি ! নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি দিয়ে অন্য একজন ব্যবসায়ীর সম্পদ বাড়াবে। সামান্য দু-চার হাজার টাকা মাইনে দিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে ! ওর যখন সেটাই একান্ত ইচ্ছে, তাই করুক !

সুকান্ত এবার কৈফিয়ত দেবার সুরে বললো, আমার জঙ্গল ভালো লাগে না।

চন্দ্রমৌলি আবার দপ করে জ্বলে উঠে বললেন, এখানে ও নিজে কোনো ব্যবসা করলে তার জন্যও আমি টাকা দিতে রাজি ছিলাম !

সোমনাথ বললেন, মৌলি, মৌলি, আর ও কথা তুলো না। তুমিই তো বললে, সব সেটেলড হয়ে গেছে !

চন্দ্রমৌলি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে বললেন, আই অ্যাম সরি !

বুড়িমা বললেন, রাঁচিতে চাকরি করতে যাবে, সেই তো ভালো। সুরঞ্জন দেবিকার কাছাকাছি থাকবে। তারপর সুরঞ্জনরা যদি ওখানেই একটি ভালো মতন পাত্রী দেখে...

সেবন্তীর মৃত্যুর পর সুকান্তর সঙ্গে রাকার বিয়ে সম্বন্ধ করার কথা বুড়িমা ভুলেও কখনো আর উচ্চারণ করেন না।

আগে চন্দ্রমৌলি এলে কত রকম হৈ-হল্লা ও আমোদ হতো অনেক রাত পর্যন্ত। রোমহর্ষক কাহিনীর স্টক চন্দ্রমৌলীর অফুরন্ত। এবার অফ্রিকা থেকে

নিশ্চয়ই ঝুলি ভর্তি করে এনেছেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু কেউ তা শুনতে চাইলো না। খাওয়ার একটু পরেই নিস্তরঙ্গ সারা বাড়ি। যে-যার নিজের ঘরে চলে গেছে।

চন্দ্রমৌলিকে দেওয়া হয়েছে দেবিকা-সুরেখার ঘরখানা। তিনি বিছানায় শুয়ে একখানা বই পড়তে লাগলেন।

নিজের ঘরে রাকাও জেগে রইলো অনেকক্ষণ। কোনো রাতেই সে সাড়ে বারোটা-একটার আগে ঘুমোয় না, সোমনাথ অনেকক্ষণ ধরে রায় লেখেন, তাঁর ঘরের বাতি নিভলে রাকা বই পড়া বন্ধ করে।

অবিরাম জল ঝরছে রাকার চোখ দিয়ে। মায়ের কথা আজ মনে পড়ছে খুব। মা যখন কথা বলতেন না, তখনও মায়ের উপস্থিতি ছিল সারা বাড়িতে বাঙ্ময়। সেবন্তী সকলেরই কথা কমিয়ে দিয়ে গেছেন। যে-সব দিনে সেবন্তীর মেজাজ ভালো থাকতো, সেইসব দিনের স্মৃতি রাকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৃষ্টি পছন্দ করতেন খুব সেবন্তী, মায়ের কাছেই রাকা জলের প্রতি ভালোবাসা পেয়েছে। যখন তখন তার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে। তাদের বাড়ির পেছন দিকে একটা পানাপুকুরে কেউ নামে না, রাকা সেখানে সাঁতার কাটে।

আকাশ আবার বর্ষণ শুরু করেছে, খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট নিচ্ছে রাকা, আর ফুলে ফুলে কাঁদছে। বাঁচার ইচ্ছে ছিল খুব সেবন্তীর, বারবার বলতেন, আমাকে যেতে দিস না, ধরে রাখ।

শেষদিনে মা যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো মনে পড়ে গেল রাকার। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখের জল মুছে ফেললো। বাগানের গাছগুলোতে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি, সেই শব্দ শুনলো কিছুক্ষণ। সে শব্দের মধ্যেই সে যেন একটা বার্তা পেল। মায়ের সেই কথাগুলোর উত্তর নিশ্চয়ই মৌলিকাকা জানেন!

ঝিমঝিম করে উঠলো রাকার সারা শরীর। এও কি সম্ভব? কেউ তো কোনোদিন সে রকম কিছু ইঙ্গিত করেনি, দিদিরা না, বুড়িমা না, বাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, তবু কেন রাকার একথা মনে হলো। এর আগেও এরকম একটা অস্পষ্ট চিন্তা তার মনে এসেছে কয়েকবার, আজ মৌলিকাকা এসেছেন বলেই সেটা দানা বেঁধেছে।

রাকা ঠিক করলো, আজই সে জানবে। পাতলা রাত-পোশাকের ওপর একটা হাউস কোট চাপিয়ে সে বেরিয়েএলো ঘর থেকে। সোমনাথের ঘরের আলো নিভে গেছে, তূণীর ঘুমকাতুরে, তার এখন মধ্যরাত। শুধু আলো জ্বলছে চন্দ্রমৌলির ঘরে, দরজা পুরো বন্ধ না, ভেজানো, চুলের মতো ফাঁক

দিয়ে আসছে আলোর রেখা। বৃষ্টির এখন খুব জোর, ঝমঝম শব্দ হচ্ছে চর্তুদিকে, এই শব্দকেও মনে হয় নিস্তব্ধতা।

আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল দরজাটা। দুই বোনের বড় খাটটায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এক বিশাল পুরুষ, ডোরাকাটা পাজামা ও শর্ট পরা, বোতাম খোলা, দেখা যাচ্ছে তাঁর লোমশ কপাট বক্ষ, একটা হাত বুকের ওপর, একটা হাত পাশে, চক্ষু বোজা, বেশ নাকডাকার শব্দ। বইখানা পড়ে গেছে মেঝেতে, জ্বলছে শিয়রের কাছে টেবল ল্যাম্প।

একটা জেদ নিয়ে চলে এসেছিল রাকা, এখন তাকে পেয়ে বসলো লজ্জা। ঘুম থেকে জাগিয়ে কি ওরকম একটা প্রশ্ন করা উচিত? না, এটা ঠিক সময় নয়।

আলোটা নিভিয়ে দেবার জন্য রাকা এলো ঘরের মধ্যে। বইখানা তুলে পাশে রাখতে যেতেই চন্দ্রমৌলি চোখ মেলে তাকালেন। আরও লজ্জা পেলো রাকা। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো, কেন সে লজ্জা পাচ্ছে? সহজভাবে এসে সুইচটা অফ করে দিয়ে যাওয়াই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা জেগেছে, সেটা কি ফুটে উঠছে তার মুখে?

সরল বিস্ময় নিয়ে চন্দ্রমৌলি বললেন, কী রে, রাকা?

রাকা বললো, কিছু না। টেবল ল্যাম্পটা জ্বলছিল।

ঘুম জড়ানো গলায় চন্দ্রমৌলি বললেন, লিট্‌ল প্রিনসেস....কত বড় হয়ে গেছে।

অন্ধকারের মধ্যে রাকা দৌড়ে চলে এলো ঘরের বাইরে। তার বুকটা ধড়ফড় করছে। কিসের এই উত্তেজনা, সে নিজেই বুঝতে পারছে না। যেন এই মুহূর্তে তার জীবনটা সম্পূর্ণ ওলোটপালট হয়ে যাবার কথা ছিল।

দরজার বাইরে, বৃষ্টিভেজা বারান্দায় সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

সেই প্রশ্নটা কিন্তু রাকার মন থেকে গেল না। সেটা দিনে দিনে একটা ছোট চারা থেকে বনস্পতির মতন বৃদ্ধি পেতে লাগলো, ডালপালা ছড়ালো, রাকার স্বস্তির অনেকখানি কখন দখল করে নিল।

এরপর দেখা হলেও চন্দ্রমৌলির কাছে প্রশ্নটা উত্থাপন করার সুযোগ হয়নি। এর সাত বছর পর, তখন রাকার বয়েস ছাব্বিশ, একটা গ্রামের মধ্যে, জলাশয়ের ধারে বসে, তখন বেলা এগারোটা, আকাশে রুপোর পাতের মতন রোদ, রাকার চোখে সানগ্লাস, চন্দ্রমৌলি কপালের কাছে একটা হাত উপুড় করে রোদ আড়াল করে ছিলেন, রাকা জিজ্ঞেস করেছিল, মৌলিকাকা, তুমি আমার

কে ?

তার আগে, এই সাত বছরে অবশ্য রাকা অনেক কিছু বুঝে গিয়েছিল, নিজের জীবন বিষয়ে তো বটেই, চন্দ্রমৌলি সম্পর্কেও, সে জেনেছিল কেন ছাত্রজীবনে সুকান্ত ছুটির সময়েও বাবার কাছে যেত না।

পড়াশুনো শেষ করে, কলকাতা ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গিয়েছিলেন নবীন যুবক চন্দ্রমৌলি, এক ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির চাকরি নিয়ে। আত্মবিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরপুর, অসামান্য সাহস ও জেদ, তাঁকে দেখে সকলেই বুঝেছিল, ছোট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবার মানুষ ইনি নন। দু' বছরের মধ্যে সেখানে তিনি টিকতেও পারেননি, রায়পুরের এক সম্পন্ন, বাড়ি-গাড়িওয়ালা অভদ্র ব্যক্তির সঙ্গে বচসা হওয়ায় চন্দ্রমৌলি ঘুঁষি মেরে তার নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। সেইদিনই সন্ধেবেলা ক্লাবে মদ্যপান করতে করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে বলেছিলেন, মিঃ দত্ত, এই শহর আপনার জন্য নয়। কালকের মধ্যেই আপনাকে অ্যারেস্ট করার অর্ডার এসে যাবে ওপরমহল থেকে, আপনি এখান থেকে সরে পড়ুন, আপনি এখানকার গুণ্ডা-বদমাইসদের সঙ্গে মাথাগরম করে লড়াই করতে পারেন, কোন্ দিন ওদেরই একটা ভাড়াটে খুনে পেছন থেকে রাইফেল চালিয়ে আপনার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। কিংবা পুলিশই ঐ কাজটা করবে। আমরা সরকারি অফিসারেরা সব জেনেশুনে সহাবস্থান করে আছি, নইলে আমাদেরও ঐ অবস্থা হতে কতক্ষণ।

এরমধ্যে ঐ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী তাঁর বোনের জন্য চন্দ্রমৌলিকে পছন্দ করে ফেলেছেন। সেই বোনের সঙ্গে চন্দ্রমৌলির আলাপ হয়েছে আগেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মৈথিলি ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকা বাঙালী, শ্যালিকাটির নাম কাবেরী। সে অনেকদিন আগেই, ঠিক করে রেখেছিল, তার প্রথম ছেলের নাম দেবে সুকান্ত।

শহর ছেড়ে চন্দ্রমৌলি জঙ্গলের ইজারা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। জগদীশপুরে তাঁর একটা আস্তানা থাকলেও তিনি অধিকাংশ সময় কাটাতেন জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে। একটা জিপগাড়ি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। কাবেরীও স্বামীর সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে বাস করতে রাজি হলে চন্দ্রমৌলি এক মনোরম সরোবরের ধারে টালির চালের বাংলো বানালেন।

কিন্তু কাবেরীর একটির বেশি সন্তান-ভাগ্য ছিল না। সুকান্তর জন্মের তিন বছর পর মশার কামড়ে তাঁর ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া হলো। জঙ্গলে কত লোক কাঠ কাটতে যায়। আদিবাসীরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের কারুর ঐ রোগ হয় না,

শুধু চলে যেতে হলো কাবেরীকে। সুকান্তকে তার মাসির কাছে রাখতে চেয়েছিলেন চন্দ্রমৌলি, কিন্তু সে বাবাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকবে না, বাবার ন্যাওটা ছিল সে খুবই। আট বছর বয়েস পর্যন্ত সুকান্তকে নিজে মানুষ করেছেন চন্দ্রমৌলি, সে বালকের কোনো অযত্ন হয়নি, তারপর তাকে জগদীশপুরের বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি করে দিতেই হল, তবু চন্দ্রমৌলি যখন তখন জিপ দাবড়ে ছেলেকে দেখতে যেতেন, উপহারে তার হাত ভর্তি করে দিতেন, একটু ছুটি হলেই ছেলেকে নিয়ে আসতেন নিজের কাছে। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দেবার পর চন্দ্রমৌলি এক আদিবাসী মহিলাকে রক্ষিতা করে আনেন জঙ্গলের বাংলোয়।

সেই মহিলার নাম ভোরি, ক্রিশ্চিয়ান, কিছুটা লেখাপড়াও জানেন, কষ্টিপাথরের মূর্তির মতন শরীর। ভোরিকে বিয়ে করতেই চেয়েছিলেন চন্দ্রমৌলি, কিন্তু তাঁর স্বামী যাবজ্জীবন জেল খাটছে, সেই অবস্থায় ডিভোর্স সম্ভব নয়, আদিবাসীদের কাস্টোমারি ল মানলে অসুবিধে ছিল না, ক্রিশ্চিয়ান বলেই মুশকিল হল, চন্দ্রমৌলি ভোরিকে আইনসঙ্গত স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারলেন না।

হাতের কাজ ও দৌড়োদৌড়িতে, প্রমোদে, দায়িত্বপালনে ভোরির তুলনা নেই, কিন্তু সুকান্ত তাঁকে দ্বিতীয় মা হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। বাবার সঙ্গে সেই থেকে তার বিচ্ছেদের শুরু। ভোরি সুকান্তকে আপন করে নেবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সুকান্ত তাঁর ধারেকাছে ঘেঁষেনি। প্রথমবার চন্দ্রমৌলি যখন সুকান্তকে নিয়ে এলেন ইটাচুনা স্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্য, তখন তাঁর জঙ্গলের বাংলোর কর্ত্রী ছিলেন ভোরি। সুকান্ত আর একবারও সেখানে ফিরে যায়নি।

অনেকদিন পর্যন্ত এসব জানতো না রাকা, যখন জানলো, ততদিনে নৈতিকতা সম্পর্কে তার ধারণার অনেক বদল হয়ে গেছে, তখন চন্দ্রমৌলির এরকম একটি রক্ষিতা পোষণ করা তার একটুও অসৎ বা অসমীচীন মনে হয়নি। বিয়ে করতে না করতেই স্ত্রীর মৃত্যু হল, তারপর সারাজীবন মানুষটি একা থাকবেন? স্বেচ্ছায় যদি কেউ সঙ্গিনী হয়, তাতে দোষের কী আছে? এই জন্যই বাবা-মা মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চন্দ্রমৌলির কাছে বেড়াতে যেতেন না? বাবার ব্যবহারে কখনো বোঝা যায়নি, তীব্র অপছন্দ ছিল তার মায়ের?

ছাব্বিশ বছর বয়েসে, সমস্ত লজ্জা ও জড়তা ঝেড়ে ফেলে রাকা চন্দ্রমৌলিকে জিজ্ঞেস করেছিল, মৌলিকাকা, তুমি আমার কে?

সামনে একটা তিন বিঘার বিরাট দিঘি, জলের মাঝে বড় বড় মাছ ঘাই মারছে। তার একদিকে কয়েকটা কদমফুলের গাছ, বেলা এগারোটায় দুজনেই বসেছিল ঘাসের ওপর, একটু আগে ওরা এখানে বসে চা খেয়েছে, সামনে পড়ে আছে দুটো শূন্য কাপ, চা খেতে খেতে ওরা সুন্দরবনের মাছচাষ বিষয়ে কথা বলছিল, কয়েকদিন আগেই দলবেঁধে ঐ এলাকার খাঁড়িতে মৎস্যজীবীদের কো-অপারেটিভ কাজকর্ম দেখতে গিয়েছিল ওরা।

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় যেন একটা জোর ধাক্কা খেলেন চন্দ্রমৌলি। মুখখানা পাণ্ডুবর্ণ। তিনি প্রায় নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী বললি, রাকা ?

সেই সাত বছরে আরও দু জায়গায় বদলি হতে বাধ্য হয়ে বর্ধমান ছেড়েছিলেন সোমনাথ। তারপর শেষ পর্যন্ত যখন কলকাতা পৌঁছোলেন, তখন আর রাকা কলকাতায় থাকে না। বিলম্বিত চূড়ান্ত প্রমোশন ভোগ করার মতন শরীর ও মনের জোর আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর। সোমনাথ একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন, তার মৃত্যুর সময় শুধু তৃণীর ছিল পাশে।

সোমনাথ আর নেই বলেই রাকা সমস্ত দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়েছিল, সোমনাথের কোনো রকম আঘাত লাগার প্রশ্ন নেই।

তাই সে পাশ ফিরে, সোজাসুজি চন্দ্রমৌলির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, মৌলিকাকু, তুমি আমাকে বলো, সত্যি করে বলো, তুমি আমার কে ? এতদিন যা জেনেছি

অতবড় শরীরটা নিয়েও যেন চন্দ্রমৌলি ভয়ে কেঁপে উঠলেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, তুই কী বলছিস, রাকা ? তোর মাথায় এরকম চিন্তা এলো কী করে ?

রাকা বললো, আমার মাকে তুমি ভালোবাসতে ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, নিশ্চয়ই ভালোবাসতাম ! যেমনভাবে আমি তোকে, দেবিকা-সুরেখাকে ভালোবাসি। কিন্তু তুই যা ভাবছিস, সেরকম কোনো কিছু, না, না, না, কে তোর মাথায় এরকম অদ্ভুত কথা ঢোকালো ?

রাকা চোখের পলক না ফেলে বললো, আমি সহ্য করতে পারবো, আমার সে বয়েস হয়েছে, তুমি আমার কাছে গোপন করার চেষ্টা করো না।

—কেন গোপন করবো ? গোপন করার মতন কিছু ঘটেনি !

—আমি আরও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করছি, আমার বাবা, তিনিই কি আমার বাবা ছিলেন, না তুমি ?

—আমি তোর বাবা নই। সোমনাথই তোর বাবা, এর মধ্যে কোনো প্রশ্নই

উঠতে পারে না!

—তুমি ঠিক বলছো?

—রাকা, তুই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস কিনা জানি না। আমি করি। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, তোর মায়ের সঙ্গে আমার কোনোদিন কোনো অবৈধ সম্পর্ক হয়নি। একথা যদি আমি মিথ্যে বলি, তা হলে আমার জিভ খসে পড়বে।

রাকা এবারে খানিকটা দমে গেল। ঈশ্বরের নামে শপথকে সে তেমন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু চন্দ্রমৌলির শেষ কথাগুলোর মধ্যে সত্য ও আন্তরিকতার ধ্বনি আছে। অতিবড় অভিনেতাও এ ধ্বনি চট ক'রে আনতে পারে না।

সে চুপ করে রইলো। মনের মধ্যে এই কথাটা এতদিন সে পুষে রেখেছে যে, এক সময় সেটা বাস্তব হয়ে গেছে। সে মিলিয়ে দেখেছে যে চন্দ্রমৌলি যখনই আসতেন, তখনই তার মা অন্য রকম হয়ে যেতেন। দিদি কিংবা দাদাকে নয়, রাকাকেই কেন ভয় পেতেন মা?

তা হলে এ ধারণাটাও ভুল? সংশয়ের যন্ত্রণা রয়েই গেল!

চন্দ্রমৌলি রাকার একটা হাত তুলে নিয়ে খুব কাতর গলায় বললেন, রাকা।

রাকা সঙ্গে সঙ্গে তীব্র স্বরে বললো, তুমি আর একটা উত্তর দাও। আমি কথাটা জিজ্ঞেস করামাত্র তুমি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলে কেন? হওনি?

চন্দ্রমৌলি ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, হয়েছিলাম, এটা মিথ্যে নয়। এরকম একটা কথা তোর মনে এসেছে বলেই আমি ভয় পেয়েছিলাম। মিথ্যে সন্দেহের মতন খারাপ বিষ আর হয় না। মনের সমস্ত রং জ্বলিয়ে দেয়। পোকায় খাওয়া ফলের মতন একটা সুন্দর হৃদয়কে নষ্ট করে দিতে পারে। সেই জন্য আমি ভয় পেয়েছিলাম, রাকা। এটা একেবারেই মিথ্যে সন্দেহ, তোর মন থেকে মুছে ফেল।

রাকা আর চোখের জল সামলাতে পারছে না। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বাষ্পময় গলায় বললো, তা হলে আমার মা ওরকম হয়ে গেল কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্রমৌলি বললেন, তা নিয়ে কি আমরাও কম ভেবেছি? তোর মায়ের মনটা খুব সূক্ষ্ম ছিল, বড় বেশি অনুভূতিশীল, এমন সূক্ষ্ম মন নিয়ে বোধহয় বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না।

—আমাদের বাড়িতে....অন্য কত বাড়িতে দেখি কত রকম সমস্যা থাকে, সে তুলনায় আমাদের বাড়িতে কিছুই ছিল না, তবু কেন

—তা ঠিক। কিন্তু উনি কল্পনার জগতে চলে যেতেন।

—আমার ওপর কেন মায়ের একটা অভিযোগ ছিল ? আমি কী করেছি ?

—তুই কিছু করিসনি, তোর কোনো দোষ নেই।

—আর তো কারুকে মা কোনোদিন কিছু বলেননি, শুধু আমাকে, যেন, আমি না জন্মালেই ভালো হতো, আমি না জন্মালে মায়ের কোনো কষ্ট থাকতো না।

—না, না, না, রাকা। তুই বুঝতে পারিসনি, সেবন্তী তোকেই বেশি ভালোবাসতেন। তোর প্রতি ছিল বেশি দুর্বলতা, তবু তোকে কেন আঘাত দিতেন, তার উত্তরটা তোকে এখনো খুঁজতে হবে, হয়তো একদিন পেয়ে যাবি।

রাকা হঠাৎ উঠে দৌড়ে চলে গেল, বড় দিঘির পাড়টা ঘুরে সে ছুটছে, যেন ক্ষোভ ও অভিমান তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, দিঘির উল্টোদিকে একটা লাল টালি ছাওয়া সুদৃশ্য বাংলোর মধ্যে সে ঢুকে গেল।

চন্দ্রমৌলি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।....

সাত বছর আগে, চন্দ্রমৌলি যেদিন ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, তার পরের দিনই তিনি বর্ধমান ছেড়ে চলে যান। চারদিন পরেই সেবন্তীর বার্ষিক কাজ, সোমনাথ এসে অনুরোধ করেছিলেন সেই কটা দিন চন্দ্রমৌলিকে থেকে যেতে, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে জরুরি কাজ আছে এই অজুহাত দেখিয়ে চন্দ্রমৌলি রইলেন না। সেবন্তীকে তিনি যে-পর্যন্ত দেখে গিয়েছিলেন, সেই ছবিটাই তিনি মনে রাখতে চান, মৃত সেবন্তী এখনো যেন তাঁর কাছে সত্য নয়।

সেবন্তীর বার্ষিক কাজে দেবিকা আসতে পারেনি, সে তখন আসন্ন প্রসবা, ন' মাসের গর্ভ, সুরেখা এসেছিল সিউড়ি থেকে। সেবারেই প্রথম রাকা একটা নতুন কথা জানলো। সুরেখা বিশেষ আসতে পারে না, কিন্তু তার সঙ্গে সুকান্তর প্রায়ই দেখা হয়। সকালবেলা বেরিয়ে যায় সুকান্ত কিন্তু প্রত্যেকদিন সে কলকাতায় যায় না, উল্টোদিকের ট্রেনে চেপে সিউড়ি পৌঁছে যেতে এমন কিছু সময় লাগে না। সুরেখার প্রতি কবে থেকে সুকান্তর এই টান শুরু হয়েছিল, তা কিছুই জানতো না রাকা। হঠাৎ সন্ধেবেলা ছাদে উঠে রাকা দেখতে পেল আলসের ধারে, অন্ধকারে আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন নারী-পুরুষ, যেমনভাবে সিনেমার প্রেমিক-প্রেমিকারা দাঁড়ায়, বাংলা সিনেমার চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ, সুকান্ত আর সুরেখা।

বিদ্যুতের তরঙ্গ বুঝি একেই বলে, রাকা সর্বাঙ্গে কেঁপে উঠেছিল, ততটা

অন্ধকার নয় যে বোঝা যাবে না, রাকা দেখলো তার দিদির বুকের জামা খোলা, সেখানে সুকান্তর মুখ, সে পাগলের মতন ছটফট করছে।

দারুণ লজ্জা পেয়ে রাকা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিল, তারপরেও অনেকক্ষণ তার শরীরের কাঁপুনি থামেনি, তার সমস্ত অন্তরাত্মা ছি ছি করছিল, তিন বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে সুরেখার, তবু সে অন্য পুরুষের কাছে নিজেকে খুলে দেয় ? এরকমও যে সম্ভব, রাকার ধারণাই ছিল না, বাথরুমে গিয়ে বারবার চোখে জল দিয়ে রাকা দৃশ্যটা মুছে দিতে চাইলো। সুরেখার তুলনায় সুকান্তকেই মনে হল তার বেশি পাপী, সে সুরেখাকে ভালোবেসেও তার বিয়ে হতে দিয়েছিল, তারপরেও সে দাবি ছাড়েনি, সুকান্ত যেন তাপসীর সেই গণাদার মতনই একজন। সুরেখার বুকেও কি নোখের দাগ থাকবে ?

॥ ৬ ॥

ছোট্ট একখানা ঘর, পাশাপাশি দুটো খাট পাতা, মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলার জায়গাই নেই, একটামাত্র জানলা। কারা এমন বাড়ি বানায়, ঘরে একটা জানলা থাকলে যে হাওয়া ঢোকে না তা জানে না ? সে জানলাতেও পর্দা টাঙিয়ে রাখতে হয়, না হলে রাস্তা দিয়ে দেখা যায়, সেটা একটা ভয়ঙ্কর কথা, রাস্তার লোকের কাছে দেখা দিতে নেই।

বড় জায়গায় এলে ছোট জায়গায় থাকতে হয়। বর্ধমানের সেই বাড়ি, সঙ্গে বাগান, লম্বা-চওড়া ঘরগুলি, দু' একটা ঘর কাজেই লাগে না, সেরকম কলকাতায় পাওয়া যাবে কী করে ? রাকার খুব ইচ্ছে ছিল অন্তত একলা একটা ঘরে থাকার। কিন্তু কোনো হস্টেলেই সে ব্যবস্থা নেই। রাকার রুমমেট শিখা, যেন লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাবার মতন রাকা ওকে পেয়েছে, অন্য যে-কোনো মেয়েও তো হতে পারত !

শিখার বাবা কিছুদিন আগে দিল্লিতে বদলি হয়েছেন বলে শিখা এই হস্টেলে থেকে তার পড়াশুনো শেষ করছে, রাকার চেয়ে আড়াই-তিন বছরের বড়, বিজ্ঞানের ছাত্রী। প্রথম পরিচয়ের পরই সে রাকাকে বলেছিল, তুমি যে একটা সবুজ কলি, এখনো ফোটোনি ঠিক মতন।

বর্ধমানের বাড়ির সেই ঘেরাটোপ, ভাষা সম্পর্কে শুচিতা, বাঁধাধরা নীতিবোধ সব তছনছ হয়ে যেতে লাগলো এখানে এসে। যেন গভীর অরণ্যের একটা প্রাণী হঠাৎ শহরে এসে পড়েছে, এরকমই উদভ্রান্ত ভয়ার্ত ছিল রাকা প্রথমদিকে,

অথচ সে যে আগে কলকাতা দেখেনি তা নয়, চন্দননগরে তার মামাবাড়ি, আগে কলকাতায় আসতো সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, রাশিয়ান ব্যালে দেখেছে, একবার আইস স্কেটিং রিংকে বরফের ওপর মেমদের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু আসলে এই শহরকে কিছুই চেনেনি, শিখাই তাকে প্রথম চেনালো।

শিখা পড়াশুনোর ব্যাপারে খুবই মনোযোগিনী, খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে যখন পড়তে শুরু করে, তখন পাগলের মতন পড়ে, সে ঠিক করেই রেখেছে এম এস সি কেমিস্ট্রিতে তাকে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে, তারপর পি এইচ ডি করতে যাবে বিদেশে, এখন থেকেই জার্মান ভাষা শিখছে। পড়ার সময় যেন তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, পরনের শাড়ি আলু থালু হয়ে যায়, উপুড় অবস্থায় নাচায় দুটো পা, শাড়ি নেমে আসে হাঁটুর কাছে, খুব গরমের সময় শাড়িটা একটানে খুলে ফেলে শুধু সায়া-ব্লাউজ পরে থাকে।

আবার হঠাৎ বিকেলের দিকে দ্রুত সাজ পোশাক পরে নেয়, দ্রুত চুল আঁচড়ায়, চট করে একটু লিপস্টিক ঘষে ঠোঁটে, তারপর চটি জোড়া পরবারও যেন সময় পায় না, কোনো রকমে পায়ে গলিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

তুমি থেকে তুই-এ নামতে দু'দিনও সময় লাগেনি, রাকা ওকে শিখাদি বলে ডেকেছিল, শিখা ধমকে বলেছে ওসব দিদি ফিদি আবার কী, আমরা সবাই সমান।

ছিপছিপে গড়ন, রংটা চাপা, শরীরের রেখায় তরঙ্গ আছে, একটু সাজলেই শিখাকে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়, কথা বলে খুব তাড়াতাড়ি, এক একটা বিশেষ শব্দের ওপর জোর দিয়ে। প্রথমবার হঠাৎ পড়াশুনো ছেড়ে শিখাকে এমন হন্তদন্ত হয়ে বেরুতে দেখে, রাকা জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাচ্ছো ?

ফট করে একটা জানলা খোলার মতন সন্দর দাঁতের আলো দেখিয়ে হেসে শিখা বলেছিল, খেলতে !

শিখা একটা কথা প্রায়ই বলে, কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা !

খেলা মানে স্পোর্টস নয়, শিখা সকালে উঠেই খানিকটা ফ্রি-হ্যান্ড এক্সসারসাইজ করে খাটের ওপর দাঁড়িয়ে, আর কোনো খেলাধুলো করার সময় নেই, তার খেলা মানে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা। শিখার অনেক বন্ধু। রাত আটটার মধ্যে ফিরে আসার একটা বাধ্যবাধকতা আছে, শিখা প্রায়ই মানে না।

পড়ার সময় প্রায়ই সিগারেট লাগে শিখার, সে সিগারেটের প্যাকেট কিনে আনে। রাকার তখন নিজেকে গাঁইয়া মনে হয়, সে আগে কোনো মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখেনি, ইংরিজি সিনেমায় ছাড়া। এইটুকু ঘরের মধ্যে

সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অস্বস্তি হয়, সে দু'একবার কাশতেই শিখা বলেছিল, তোর কষ্ট হচ্ছে জানি, কী করবো, আমার যে অভ্যেস হয়ে গেছে, পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর ছেড়ে দেবো। তুই যেন সিগারেট ধরিস না, বড্ড পাজি নেশা। আমাকে জোর করে সিগারেট ধরিয়েছিল অন্তু হারামজাদাটা, ও যে সারাদিন চিমনির মতন সিগারেট ফোঁকে, ওকে চুমু খেতে গেলে বিচ্ছিরি গন্ধ লাগতো, তারপর আমাকে নিজের সিগারেট থেকে দু'এক টান দেওয়াতো, অমনি গন্ধটা চলে যেত!

রাকা তার বয়েসের তুলনায় আরও বালিকা হয়ে গিয়ে এই সব শুনেছে বিস্ফারিত চোখে। সিগারেট আর চুমু এক নিশ্বাসে বলার মতন তুল্যমূল্য, আর যাকে চুমু খাওয়া যায়, সে 'হারামজাদা' হতে পারে! তাছাড়া অন্তুর প্রসঙ্গে এসে শিখা অতীত ক্রিয়াপদ দিয়ে কথা বলে, যেন ঐ পালাটা চুকে গেছে, তারপরেও শিখা অন্যদের সঙ্গে খেলতে যায়।

একদিন পড়তে পড়তে মুখ ফিরিয়ে শিখা জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে, রাকা, তুই জীবনটা নিয়ে কী করবি ঠিক করে ফেলেছিস?

রাকা দু'দিকে মাথা নাড়লো। না, সে তো সে রকম কিছু ভাবেনি!

শিখা উঠে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, আমি ফর্মুলাটা বলে দিচ্ছি। মোটামুটি অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে বোঝাই যায়। মফঃস্বল থেকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে একটু চাকচিক্য বাড়াবার জন্য, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছিস, সেটা একটা গর্ব করার বিষয়, যদিও ইংলিশ অনার্স নিয়েছিস, যেটা একটু ফালতু ব্যাপার, বাঙালির মেয়ে ইংরিজি সাহিত্য গবেষণা করে তো আর নতুন কোনো তত্ত্ব দিতে পারবে না, সেই চেষ্টা করাটাই বোকামি, তবু ইংরিজি পড়া মেয়ে, সোসাইটিতে কদর আছে, বিয়ের বাজারে দর বাড়বে, ম্যানেজারিয়াল গ্রেডের অফিসারের আদর্শ বউ হবি, স্বামী পার্টি দেবে মাঝে মাঝে, দিতে হয়, সেখানে সবাই বলবে, বউটা দেখতে শুনতে যেমন ভালো, তেমনই অ্যাকমপ্লিসড্! স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে, বস্-জাতীয়দের সঙ্গে একটু ফস্টি নষ্টি করতে শিখতে হবে, নইলে স্বামীই বলবে, তুমি সকলের সামনে এমন আন স্মার্ট হয়ে থেকো না, ভালো করে কথা বলো—। মেয়েরা হচ্ছে পুরুষদের খাদ্য। কেউ কামড়ে খায়, কেউ চোষে, কেউ চাটে, কেউ শুধু চোখ দিয়ে গেলে।

—তোমার তো বিয়ে হয়নি, তুমি আগের থেকেই এত জেনে বসে আছো, কী করে?

—আমার বাবা একজন বড় অফিসার। আমার মাকে ঠিক এই জিনিস করতে দেখেছি যে! অন্য অফিসারের ‘উদের দেখেছি! আমরা যখন ছোট ছিলাম, বাড়িতে যেদিন পার্টি থাকতো, আমাকে আর ভাইকে আগে থেকে খাইয়ে দাইয়ে একটা ভেতরের ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখা হতো, আমি একদিন দেখেছিলাম, তখন আমার ন' দশ বছর, আমার বাবা একজন বন্ধুর বউয়ের বুকে মুখ ঠেকিয়ে নাচছে, হঠাৎ আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো...মাইন্ড ইউ, আমি কিন্তু বাবা-মায়ের নিন্দে করছি না, এখন ইমপারসোনালি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারি, ছোটবেলায় আমরা বাবা-মায়ের যে-সব ব্যবহার দেখে শক্ড হয়েছি, বড় হয়ে আমরাও সেইগুলোই করবো, হয়তো তার চেয়ে বেশিই করবো, কারণ সোসাইটি ক্রমশ পারমিসিভ হচ্ছে...তোর ফর্মূলাটা ঠিক বলিনি? কোনো একটা বড় অফিসারের বউ হবার জন্য তৈরি হচ্ছিস তো! তুই যেমন গুডি গুডি টাইপ, সম্বন্ধ টম্বন্ধ আগে থেকেই ঠিক করা আছে নাকি?

রাকা আঙুল দিয়ে বিছানার চাদরের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললো, তুমি বললে, মেয়েরা পুরুষদের খাদ্য। ভালোবাসা বলে বুঝি কিছু নেই? সবাই বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে, কেউ ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করে না?

শিখা একটু থমকে গেল। তারপর তার চোখ দিয়ে ঝরনার মতন ঝরে পড়লো হাসি। সে গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলো, 'তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী, ভালোবাসা কারে কয়? সে কি এমনি যাতনাময়?'

বেশ গানের গলা শিখার, সে কোনোদিন চর্চা করেনি, তবু সহজাত সুর আছে। মাঝে মাঝেই সে পড়তে পড়তে গান করে, কিন্তু এক লাইন দু' লাইনের বেশি নয়।

গান থামিয়ে শিখা বললো, হ্যাঁ, ভালোবাসা নামে একটা ব্যাপার ছিল বটে, কবিতা-টবিতায় দেখা যায়, হয়তো এখনো ব্যাপারটা আছে, কিন্তু খুবই দুর্লভ, কোটিতে একজন পায় কিনা সন্দেহ, তবু ভাবতে ভালো লাগে, আমারও ভাবতে ভালো লাগে, কোনোদিন পাবো না জানি। যেমন ধর, আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্রী, আমি জানি স্বর্গ বলে কিছু নেই, আমি কোনোদিন স্বর্গ দেখবো না, তবু মৃত্যুর পরে স্বর্গের মতন একটা জায়গায় যাবো, একথা ভাবতে ভালো লাগে না? যদি ভালোবাসার প্রতীক্ষায় কেটে যায় সারাজীবন...

আবার গলার স্বর বদলে তীক্ষ্ণভাবে শিখা বললো, তবে শোন, তুই ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করতে চাস তো কর, কিন্তু আগেই সাবধান করে

দিচ্ছি, অনেক ছেলেই আগে ভালোবাসার কথা বলবে, তা কিন্তু ভালোবাসা নয়, এক ধরনের মতলব, অত শস্তা নয় ভালোবাসা, যে-সে দিতেই পারে না, আসলে ভালোবাসা কাকে বলে জানেই না, চট করে বিশ্বাস করবি না। আমিও একবার একজনের প্রেমে পড়েছিলুম, তোর থেকেও একটু ছোট বয়েসে, সেও আমাকে খুব ভালোবাসি ভালোবাসি বলতো, তারপর দেখি যে, সবটাই বিছানায় নিয়ে যাবার প্রস্তাবনা। না, না, বিছানায় যাওয়াটা আমি খারাপ বলছি না, একসঙ্গে শুয়েও দিব্য আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোন্‌টা আমার অসহ্য লাগে জানিস ? সব জায়গায় পুরুষের অধিকারবোধ, এমন কী বিছানাতেও, সে বুঝিয়ে দেবে যে সেই প্রভু, তুমি মেয়ে, তুমি ভোগ্য, আর পুরুষ ভোক্তা। ছেলেরা ভুলিয়ে ভালিয়ে মেয়েদের বিছানায় নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু কোনো মেয়ে যদি নিজে থেকে কোনো পুরুষকে নিজের বিছানায় ডাকে, তাহলে ছেলেরাই রে-রে করে উঠবে। তারা বলবে, ঐ মেয়েটা নির্লজ্জ-বেহায়া, ছেনাল, দুশ্চরিত্রা, বেশ্যা এই রকম কত কী ! বাচ্চা বয়েস থেকে শেখানো হয় যে মেয়েদের হতে হবে নম্র, লাজুকলতা, চোখ তুলে তাকাবে না, সব সময় সতীত্বের জপ করবে, কেন এই সব নিয়ম বানানো হয়েছে জানিস তো ? কোন্ মেয়ে কার সঙ্গে শোবে কিংবা না-শোবে তা পুরুষরাই ঠিক করে দেবে !

রাকা এক সঙ্গে এতটা সহ্য করতে পারে না, সে উঠে পড়ে।

তবু রাকার অমলিন, অস্পর্শিত হৃদয়ে শিখার কথাগুলো তীরের মতন বিঁধে যায়। শিখা যা বলে, সে সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, বইয়ের পৃষ্ঠার বাইরে প্রাপ্তবয়স্কদের জগৎটাকে সে এখনো প্রায় কিছুই চেনে না। তার অবাক লাগে, দেবিকা-সুরেখার যখন শিখার মতন বয়েস ছিল, তখন তারা তো এরকম কিছুই ভাবতো না, তাদের ব্যবহার ছিল আরও বাচ্চাদের মতন, তার কারণ তার দিদিরা ছিল মফঃস্বলের মেয়ে ?

তাপসীর কথা তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তাপসী এমন দু'একটা কথা বলতো, যা ছিল রাকার সেই বয়েসের বোধের বাইরে। দারিদ্র্য, একেবারে খেতে না পাওয়া অবস্থায় এসে তাপসী রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছিল, বইপত্র সরিয়ে তাকে খুঁজতে হয়েছিল জীবিকা, তাই তার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিখার তো সে রকম অবস্থা নয়, সে এসেছে বেশ সচ্ছল পরিবার থেকে, বাবা-মা দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত, শিখা তার সমাজের অন্য মেয়েদের মতনই সংরক্ষিত অবস্থায় স্কুল থেকে কলেজে এসেছে, তবু সে এরই মধ্যে জীবন সম্পর্কে এমন নির্মম সব সত্য শিখলো কোথায় ?

এই হস্টেলে আছে মোট বত্রিশটি মেয়ে, তার মধ্যে কোনো কোনো বড় ঘরে এক সঙ্গে চারজনও থাকে, আস্তে আস্তে সবার সঙ্গেই আলাপ হলো, কিন্তু রাকা বুঝতে পারে, শিখার মতন আর কেউ নয়, অনেকেই সাধারণ ভাষায় ভালো মেয়ে, শুধু পড়াশুনো নিয়ে থাকে, কেউ কেউ সিনেমার নায়কদের নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখিয়ে পুরুষ-ভোগ চরিতার্থ করে, বাস্তব ছেলেদের সঙ্গে মেশে না, দু'চারজন অসভ্য কথা বলে, দু' চারজন আবার তাতে লজ্জা পেয়ে প্রতিবাদ জানায়, দু' চারজনের মন কেমন করে বাড়ির জন্য, কেউ কেউ খেতে ভালোবাসে, খাওয়ার জিনিস নিয়ে ঝগড়া করে।

খাওয়ার ঘরেই সকলের সঙ্গে দেখা হয়। শিখা অন্যদের সঙ্গে তেমন মেশে না, আলগা-আলগা কথা বলে, কোনো রকম নারী-আন্দোলন করার ইচ্ছে তার নেই, বরং রচনা নামে আর একটি মেয়ে নারী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ নিয়ে বক্তৃতার সুরে চ্যাঁচায়, কিন্তু তাতে যেন আন্তরিক বিশ্বাসের সুর নেই। শিখা ঘরের মধ্যেই বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করে, প্রথম প্রথম অন্য মেয়েরা যখন তখন তাদের ঘরে এসে পড়তো কোনো একটা মজার কথা বলতে, কিংবা সুপারিনটেনডেন্ট জয়াদিকে জব্দ করার জন্য কিছু একটা ষড়যন্ত্র করতে, শিখা বিশেষ পাত্তা দেয়নি, বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে হুঁ-হাঁ করেছে।

শিখার কথা মিলিয়ে দেখেছে রাকা, প্রায় সব মেয়েই লেখাপড়া শেষ করে বিয়ের কথা ভাবে। লেখাপড়াটা শিখে রাখা হচ্ছে যদি চাকরির প্রয়োজনে লাগে। যদিটা বেশ বড় যদি। কেউ কেউ ঠোঁট উল্টে বলে ফেলে, আমার ভাই চাকরি-টাকরি করার একেবারেই ইচ্ছে নেই। অর্থাৎ সে রকম নির্ভরশীল স্বামী পেলে চাকরি করার দরকার কী ? কেউ কেউ বিয়ের পরেও চাকরি করে, একটা নিজস্ব উপার্জনকেই চূড়ান্ত স্বাধীনতা মনে করে। রাকাও তো এই সবই খুব স্বাভাবিক মনে করতো। শিখা তার সব গুলিয়ে দিয়েছে।

একদিন সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি অন্য মেয়েদের সম্পর্কে ফর্মূলা তৈরি করে রেখেছো, কিন্তু তুমি তোমার জীবনটা নিয়ে কী করবে ঠিক করেছো, শিখা ?

শিখা বললো, লেখাপড়া করছি মন দিয়ে, দেখছিস তো, ফাঁকি দিই না। তবে আমি চাকরির জন্য লেখাপড়ার কথা ভাবি না। অন্য অনেক মেয়ের তুলনায় আমি ফরচুনেট, আমার বাবা-মায়ের যা টাকা কড়ি আছে, সেটা আমরা দুই ভাই-বোন ভাগ করে নিলে আমাদের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। বাবার সম্পত্তি পেলে আমি এক পয়সা ছাড়বো না, এটা আমি আগেই ঠিক করে নিয়েছি, এটা

আমার স্বাধীনতার প্রথম স্টেপ।

—চাকরির যদি চিন্তা না করতে হয়, তাহলে এত কষ্ট করে সায়েন্স পড়ার দরকার কী ?

—চাকরির জন্যই পড়াশুনো করতে হবে, এটা হচ্ছে পরাধীন চিন্তার প্রথম লক্ষণ ! অনেক মেয়ে পড়ে, ভালো রেজাল্টও করে, কিন্তু সাবজেক্টটাকে ভালো বাসে না। আমার এক দিদি ফিলজফিতে এম-এ, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, কিন্তু তার মুখে আমি একটাও দার্শনিক চিন্তার কথা শুনিনি। শাড়ি-গয়না কী ভালোই না বাসে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের আরও স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত। বেশিরভাগ মেয়েই তো শিক্ষাটাকে কোনো কাজেই লাগায় না। বিয়ে-থা করে সব ভুলে যায়। শুধু শুধু টাকা নষ্ট !

—ছেলেরা বুঝি সব বিদ্যে কাজে লাগায় ?

—আরে ছেলেরাই তো সব নিয়ম তৈরি করেছে, তারা যা খুশি করবে ! তুই আমার কথা জিজ্ঞেস করছিলি, আমি বিজ্ঞানকে ভালোবেসে ফেলেছি, কেমিস্ট্রির মধ্যে রস আর রহস্য দুটোই পেয়েছি, সেইজন্য আমি পড়বো, আরও পড়বো। বিদেশে যাবো। পণ্ডিত পণ্ডিত ব্যাটাছেলেদের কাছ থেকে যতটা শেখা সম্ভব শিখে নেবো, তারপর নিজের মাথা খাটাবো। ওষুধ, ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড এই সব নিয়ে আমাদের দেশে অনেক কিছু কাজ করবার আছে। যদি নিজে একটা কিছু বার করতে পারি, তা হলে কতটা আনন্দ হবে বল তো ? যদি শেষ পর্যন্ত সে-রকম কিছু নাও পারি, তবু চেষ্টা যে করেছিলাম, তারও তো একটা সার্থকতা থাকবে নিজের কাছে !

—তুমি আবিষ্কারক হবে ?

—ঠাট্টা করছিস নাকি ? অসম্ভব ভাবছিস ? আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের দোষ কি জানিস, ঠিক মেয়েদের দোষ নয়, পারিবারিক আবহাওয়া আর সামাজিক পরিবেশই এমন যে মেয়েরা বড় কিছু চিন্তাই করতে পারে না। জীবনের সম্ভাবনা যতখানি, তার সিকিভাগ মেয়েরা পেলেই যথেষ্ট। তুই যে ইংরিজি পড়ছিস, তুই কতটা যেতে পারবি ? তোকে ইংরিজি পড়তে কে বলেছে ?

—আমি নিজেই ঠিক করেছি। আমি অন্য কিছু পড়তে চাইলেও...আমার বাবা আমার কোনো ইচ্ছেতেই বাধা দেন না।

—মোটেই তুই নিজে ঠিক করিসনি। তুই তোর বাবা-মায়ের আদুরে মেয়ে,

সেই আদরটাই বারবার তোকে বলে দিয়েছে, বেশি দূর যেও না, বেশি দূর যেও না মামণি, অজানা রাস্তায় যেতে চেও না, জুজু আছে! তাই আদুরে মেয়েরা ইংরিজি, হিস্ট্রি, ফিলজফি, বাংলা এই সব পড়ে। ধরাবাঁধা পথ, নিশ্চিন্ত!

—ইংরিজি পড়াটা আমার ভুল হয়েছে?

—অফ কোর্স ভুল হয়েছে। কলোনিয়াল হ্যাঙ্গ আপ। ইংরিজি শিখতে হবে, তা ঠিক, এই নড়বড়ে দেশটায় আর কোনো লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা নেই, আমিও তো ইংরিজি ভাষাটা মোটামুটি শিখেছি, না হলে বিজ্ঞানও পড়া যাবে না। কিন্তু ওসব শেক্সপীয়ার-টেক্সপীয়ার পড়ে কী হবে?

—কাব্য সাহিত্য পড়ার আর দরকার নেই, সবাই এখন বিজ্ঞান পড়বে!

—ক্লাস রুমে কাব্য পাঠ! এই কবিতাটির ভাবার্থ লিখ। শেষ দুই লাইনে কবি কী বলিতে চাহিয়াছেন? রবীন্দ্রনাথ জীবন দেবতা বলিতে কী বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন? বাপ রে বাপ, ভাবলেও এখন আমার ভয় করে!

হঠাৎ হেসে ফেলে শিখা আবার বললো, তুই বুঝি ভাবছিস, আমার কোনো রস কষ নেই? না রে, তুই যখন কবিতা পড়িস, মাঝে মাঝে আমার শুনতে ভালোই লাগে। কবিদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কোনো ঝগড়া নেই। তবু তোকে একটা কথা বলি, ইংরিজি সাহিত্যে কোর্স নিলেও কি অন্য কিছু পড়া যায় না? সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা এই যুগেও বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু খবর রাখে না, দ্যাট্স আ পিটি! কফি হাউসে আর্টস ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা লম্বা-চওড়া কথা বলে, কিন্তু ক'জন জানে স্টিফেন হকিং-এর অত্যাশ্চর্য কীর্তির কথা?

রাকা বললো, তুমি নতুন কিছু আবিষ্কার করলে আমার খুব গর্ব হবে। অন্য মেয়েদের বিয়ের চিন্তা নিয়ে তুমি ঠাট্টা করো, তুমি নিজে বুঝি বিয়ে করতে চাও না?

শিখা বললো, একদম চিন্তা করি না। আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে-রকম বাড়ছে, তাতে বেশ কিছু মেয়ের এখন বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞা করা উচিত।

—হঠাৎ যদি কেউ তোমাকে সত্যিকারের ভালোবেসে ফেলে? সে রকম ভালোবাসা এলে ঐসব প্রতিজ্ঞা ট্রতিজ্ঞা ভেসে যাবে!

—তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, রাকা! ভালোবাসা পেলে আর কী চাই! কেউ সত্যিকারের ভালোবাসলে আমি তার সেবাদাসী হতেও রাজি আছি! আত্মত্যাগের মধ্যেও যে একটা সুখ আছে, তা কি আমি জানি না? ভালোবাসার জন্য সব করা যায়। কিন্তু এই সমাজ যখন আমাদের আত্মত্যাগ করতে বাধ্য করে, আমাদের মা-মাসি-পিসিরা যা করেছে, এবং সেটাকেই গ্লোরিফাই করা হয়,

তাতেই আমার গা জ্বলে যায়। তখন ইচ্ছে করে, পুরুষ মানুষদের দিয়ে আমার পা টেপাই রোজ!

—পুরুষদের ওপর তোমার এমন রাগ! আমি এরকম আগে কখনো শুনিনি! আমার বাবা, তোমার বাবাও তো পুরুষ!

—আমার বাবা মোটেই আমার কাছে পুরুষ নন! আমার বাবা আমার মায়ের কাছে, আমার মায়ের জেনারেশানের মহিলাদের কাছে পুরুষ। আমার কাছে তিনি শুধু বাবা। আমরা যখন নারী পুরুষের সম্পর্কের কথা বলি, তখন তার মধ্যে আমাদের বাবা, দাদা বা খুব নিকট-আত্মীয়দের কথা আসে না। কিছু কিছু ন্যাকা লোক আছে, দেখবি যারা খবরের কাগজে চিঠি লেখে, তারা কোনো মেয়ে কখনো পুরুষদের সমালোচনা করলেই হাঁদারামের মতন বলে, তোমাদের বাবা-দাদা-ভাইরাও তো পুরুষ, তারাও কি তবে খারাপ? ওরা ভুলে যায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সব সময় যৌনতার প্রশ্নটা থাকেই! যৌন বিভেদেই তো নারী পুরুষের মধ্যে আসল বিভেদ! যাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হয় না, তারা এই আলোচনাতেই আসে না। একজন পুরুষ যখন নারী শব্দটি উচ্চারণ করে, তখন সে তার মায়ের কথা মোটেই চিন্তা করে না। মা আর নারী এক নয়।

—তুমি পুরুষদের বাদ দিয়ে জীবন কাটাতে চাও, তবে কেন ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাও?

—কে বলেছে আমি পুরুষদের বাদ দিয়ে চলতে চাই? পাগল নাকি? পুরুষরা খুব চমৎকার প্রাণী, প্রায় মেয়েদেরই মতন। অনেক পুরুষের মধ্যে আধখানা মেয়ে থাকে, অনেক মেয়ে পুরুষালি হয়। মানুষ যদি অর্ধনারীশ্বর হতো, ইচ্ছে মতন যে-কোনো একটা ভূমিকা নিতে পারতো, তা হলে বোধ হয় আর কোনো সমস্যাই থাকতো না। নাঃ, নারী আর পুরুষ কেউ কারুকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। গায়ের জোর বেশি বলে পুরুষরা এতদিন একচেটিয়া ভাবে পৃথিবীটা শাসন করেছে, আমরা তো তারই বিরোধী। গায়ের জোরের যুগ শেষ হয়ে গেছে!

—তোমার কথার মধ্যে কেমন যেন কনট্রাডিকশান আছে।

—কোনো কনট্রাডিকশান নেই। ওরে খুকি, অমৃত পাবো না বলে কি মধুও পাবো না? মধুও যদি না পাই, তা হলে কি গুড় দিয়ে কাজ চালাতে হবে না? ভালোবাসা না পেলে ভালোবাসার অভিনয়ই যথেষ্ট। ছেলেরা ভালোবাসার নামে যত মিথ্যে কথা বলে আমিও তত মিথ্যে কথা বলি। এইটাই তো খেলা!

—সবাই ভালোবাসার নামে মিথ্যে কথা বলে।

—জেনে শুনে হয়তো বলে না। তারা কেউ কেউ ভাবছে, সত্যিই ভালোবাসছে। খানিকটা সময়ের জন্য হয়তো সেটাই সত্যিকারের ভালোবাসা। ভালোবাসা এমনই সূক্ষ্ম ব্যাপার যে বেশিদিন ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না। হয়তো দু' একজনের থাকে। এত হয়তো হয়তো বলছি কেন জানিস, ভালোবাসা তো আর বিজ্ঞান নয় যে প্রমাণ করা যাবে? ওরে, সারা জীবন খাঁটি ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকলে হয়তো সারা জীবনটা শূন্যই থেকে যাবে! আর একটা কথা তোকে বলি, এটা আমি নিজে ফিল করি, জেনারাল ট্রুথ কিনা জানি না, আমার মনে হয়, মাথার কাজ বেশি করতে হলে মাঝে মাঝে শরীরটাকেও ব্যবহার করা দরকার। যেমন ব্যায়াম করতে হয়, তেমনি ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে ব্যাপারটা, সেই আনন্দটা কি ছাড়া যায়? আমি লেসবিয়ান-হোমোসেক্সুয়ালদের ঠিক বুঝি না, কিন্তু নারী ও পুরুষের শরীরের খুব কাছাকাছি আসাটা যেন নিয়তির মতন, সেইজন্য কেউ কারুকে ছাড়তে পারবে না।

—ভালোবাসা না থাকলেও, শুধু শরীর।

—তোর দেখছি বড্ড ভালোবাসার বাতিক। এখনো ছেলেমানুষ আছিস তো! শোন, বিছানাটা হচ্ছে এমন একটা মঞ্চ, যার কোনো দর্শক নেই। দু'জন মাত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী। সেখানে ভালোবাসার অভিনয় হোক না যত খুশি। অভিনয় জিনিসটাই বা খারাপ কী? অভিনয়ও তো একটা শিল্প। ভালোবাসার জন্য কাঙালপনার চেয়ে ভালোবাসার অভিনয় অনেক ভালো।

মাঝে মাঝেই ঘুরে ফিরে এই সব আলোচনা হয়। ওরা অধিকাংশ সময়ই ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে। অন্য মেয়েদের ধারণা, ওরা বইয়ের পোকা, পড়াশুনো ছাড়া আর কিছু জানে না। কেউ কেউ একটা অন্য ইঙ্গিতও করে। যে ব্যাপারে তারা ইঙ্গিত করে, বোঝা যায় অন্য কোনো কোনো ঘরে সেই ব্যাপারটা একটু আধটু চলে।

শিখা একদিন বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল রাকাকে।

মাঝে মাঝেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শিখা একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে। ঠোঁট দুটোকে গোল করে জিভটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুলোয়। মিনিটের পর মিনিট আয়নার দিকে তাকিয়ে এরকম করতেই থাকে। তখন ওকে অদ্ভুত দেখায়।

একদিন আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে রাকা ওর পাশে গিয়ে

দাঁড়ায়, ওর পিঠে হাত রাখে, তবু যেন শিখার চৈতন্য নেই, রাকা জিজ্ঞেস করে, এটা কী করছো তুমি ?

শিখা মুখ ফিরিয়ে জ্বলন্ত চোখে রাকার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি একটা রাক্ষুসী, আমাকে দেখে ভয় করে না তোর ?

এতে ভয় পাবার কিছু নেই, যতই মুখ বিকৃত করুক শিখার একটা আলগা লাবণ্য আছে, এই কথাটাকে ইয়ার্কি মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু রাকা চমকে গেল এর পরের কথাটা শুনে, যার মধ্যে শিখার একটা ভয়ংকর ইচ্ছে প্রকট হলো।

শিখা বললো, সেই রূপকথার গল্পে আছে না, একজন রানী দিনের বেলা সুন্দরী সেজে থাকে আর রাত্তির বেলা রাক্ষসী হয়ে মানুষ খেতে বেরোয় ! আমারও ইচ্ছে করে সেই রকম রাক্ষসী হই, পুরুষদের রক্ত খাই !

রাকা তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, এসব কী বলছো, শিখা ! থামো ! মুখটা ওরকম করো না। পুরুষ বিদ্বেষী হতে হতে শেষ কালে কি তুমি পাগল হয়ে যাবে নাকি ?

শিখা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, একটা সিগারেট ফস করে জ্বেলে খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, শোন, কেন এরকম বলছি শোন ! কালকেই একটা ব্যাপার হয়েছে, একটা লোকের কাছে আমি প্রত্যেক মাসে টাকা আনতে যাই। সে নিজের থেকে দেয় না, আমার বাবার টাকা। মাইনে ছাড়াও আমার বাবার বেশ কিছু উপরি রোজগার আছে। ব্যাঙ্কের হোয়াইট মানি খরচ না করে বাবা সেই উপরি রোজগারের ব্ল্যাক মানির কিছুটা আমার জন্য খরচ করে, সেটাই একজন লোকের মারফত পাঠায়।

—থাক আর বলতে হবে না। তুমি নিজের বাবা সম্পর্কে ঐ রকমভাবে কথা বলবে না আমার সামনে।

—আচ্ছা ন্যাকা মেয়ে তো ! রিয়েলিটিকে অস্বীকার করলেই সেটা আনরিয়েল হয়ে যায় ! আজকাল কে না উপরি নেয় ? বড় বড় অফিসারদের যা লাইফ স্টাইল, শুধু মাইনের টাকা দিয়ে তা চলতে পারে ? অন্যরা নেয় দেখতে পাচ্ছিস, আর নিজের বাবা সম্পর্কে চোখ বুজে থাকবি ? উপরি নেওয়াটাকে আমি দোষেরও মনে করি না ! বেশ করবে নেবে ! যারা ঘুষ দেয়, আসল অন্যায় করে তারা ! একজন সুইডিস ইকোনমিস্ট বলেছেন না যে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে ঘুষটুষ বন্ধ হলে সব কাজও বন্ধ হয়ে যাবে ! তোর বাবা কী কাজ করেন রে, রাকা ?

—আমার বাবার ওসব কোনো ব্যাপার থাকতেই পারে না। উনি ডিস্ট্রিক্ট জজ!

—ইউ নেভার নো! আজকাল জুডিশিয়ারিতে প্রচুর করাপশান ঢুকে গেছে। খুনের আসামীরা ঘুষ দিয়ে খালাস পেয়ে যায়। কোনো বড়লোকের কখনো ফাঁসি হয় শুনেছিস? খবরের কাগজে দেখবি শেখ ইদ্রিস, কাল্লু মিঞা কিংবা পাঁচু দাস টাইপের লোকদের ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন জেল হয়, কিন্তু ভদ্দরলোক-বড়লোকদের এরকম শাস্তি হয়! বড়লোকরা বুঝি খুন করে না? বউকে পুড়িয়ে মেরেও স্বামী-শ্বশুর বড়জোর দু বছর জেল খেটে ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়। অধিকাংশ জজই যে পুরুষ!

—আমার বাবার নামে এরকম দোষ কেউ কখনো দেয়নি!

—মা-বাবাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি রে! মা-বাবারাও আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে না। আমি ভালোরেজাল্ট করি, তাতেই বাবা-মা খুশি, আমি সন্ধের পর কবে কী করছি, তা কি ওরা জানে? তেমনি আমরাও কি জানি, আমাদের বাবা-মা বয়েসকালে ছুটকো-ছাটকা আলাদা প্রেম করেছে কিনা? বাবা-মাদের জেনারেশানের সবাই পূত-পবিত্র চরিত্র, এটা ভাবাটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না!

রাকার অমনি সেবন্তীর মুখটা মনে পড়লো, এমনি যেন ঢেউয়ের মতন একটা ভালোবাসার ঝাপটা লাগলো তার শরীরে। শিখা যতই যুক্তি দিয়ে কথা বলুক, সেবন্তী ও সোমনাথ সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা চিন্তাই করতে পারে না রাকা। একটা শুধু সন্দেহ আছে, কিন্তু সেটাও...

সে উঠে যেতে চাইলেও শিখা তার হাত ধরে জোর কবে বসিয়ে দিয়ে বললো, শুনে যা বাকিটা। কালকের ঘটনাটাই বলতে দিলি না, অন্যদিকে চলে গেলি। আমার বাবা এক শেঠজীর মারফত টাকা পাঠায় প্রতি মাসে, ক্যাশ। এতদিন একটা বুড়ো লোক ছিল, কাল দেখলাম, শেঠের ছেলে, বছর তিরিশেক বয়েস, মোটামুটি হ্যান্ডস্যাম, কিছু লেখাপড়াও শিখেছে মনে হলো, এয়ারকন্ডিশান্ড অফিসঘর, দরজা-জানলা সব বন্ধ, ড্রয়ার থেকে টাকাগুলো বার করে গুনতে গুনতে আমার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো, আমি কী পড়ি, কোথায় থাকি, হস্টেল কেমন লাগে, খাওয়াদাওয়ার কষ্ট আছে কিনা ইত্যাদি। এসব ঠিকই আছে। হঠাৎ ও বললো, ও এক সময় জার্মানির স্টুটগার্টে ছিল, সেখানকার ছাত্রীরা অনেক এক্সট্রা টাকা রোজগার করে, সন্ধেবেলা বিভিন্ন বিজনেসম্যানদের সঙ্গ দেয়, তাদের সঙ্গে পার্টিতে যায়, ক্লাবে যায়, নাচে....হঠাৎ

ভয়ানক অপমানবোধ হলো, লোকটা যা বলছে তা আপাতত দোষের কিছু না, আমাকে সরাসরি কোনো ইঙ্গিত দেয়নি, কিন্তু জার্মানির ছাত্রীরা কীভাবে অনেক টাকা রোজগার করে, সে কথা আমাকে শোনাবার ওর কী অধিকার আছে? দু-চারটি ছাত্রীই হয়তো এরকম করে থাকে, কিন্তু জার্মানির পুরো ছাত্রী-সমাজকে ও বেশ্যা বানিয়ে তুললো। টাকাগুলো গোনা হয়ে গেলেও হাতে রেখে ও তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। ও আমার সঙ্গে অসভ্যতা কিছু করেনি, ওর নামে নালিশ জানানো যায় না, কিন্তু এই হচ্ছে চূড়ান্ত মেল শোভেনিজ্‌ম। ক্ষমতা দিয়ে যে মেয়েদের ভোগ করা যায়, সেই কথা ও আমাকে জানিয়ে আনন্দ পাচ্ছে। আমার তখন কী ইচ্ছে হয়েছিল জানিস! বুকের আঁচলটা ফেলে দিয়ে, চোখেমুখে হাতছানির হাসি হেসে বলি, এসো না শেঠ, আমরাও একটু ফূর্তি করি। তারপর ও যখন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, আমি ওর ঘাড়ে দাঁত বসিয়ে সব রক্ত শুষে নেব! আমার রাক্ষুসী কিংবা ভ্যাম্পায়ার হবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তখন!

রাকা ফিসফিস করে বললো, একবার ভ্যাম্পায়ার হলে তুমি যদি আর মানুষ হতে না পারো?

শিখা আর রাকা দুজনেই সকাল দশটার মধ্যে বেরিয়ে যায়, ক্লাস থাক বা না থাক। ওরা দুজনেই লাইব্রেরিতে অনেকটা সময় কাটায়। এটা রাকাকে শিখিয়েছে শিখা, প্রথমদিনেই সে বলেছে, কিছু পড়তে ইচ্ছে না করলেও লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা বই খুলে বসে থাকবি, শীতকালে রোদ পোয়াতে যেমন আরাম হয়, সেই রকম অতীতের মানুষদের মেধা আর মনীষার ভাইব্রেশান টের পাবি শরীরে।

কলেজে প্রথম বছরে বিশেষ কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়নি রাকার। সে নিজেই বুঝতে পারে যে সে অন্যদের সঙ্গে মিশতে পারে না। শিখার মতন মেয়েকে রুমমেট হিসেবে না পেলে তাকে নিঃসঙ্গ থাকতে হতো।

কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় দেওয়ালে দেওয়ালে এখনো লেখা আছে, সত্তরের দশক মুক্তির দশক। কোথায় সেই মুক্তি? লিন পি আও নামে চীনের এক তাত্ত্বিক নেতার উদ্ধৃতিও দেখতে পাওয়া যায়, এখন অনেকে লিন পি আও নামটা শুনলে চিনতেই পারে না। নকশালদের আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। সকলের দৃষ্টি ফিরে গেল সেদিকে। সেই সুযোগে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী বিপ্লবীদের নির্মূল করার কাজে লেগে পড়লো। নকশালরা ঠিক মতন অস্ত্রশিক্ষা না নিয়েই নেমেছিল

লড়াইতে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতেই পারলো না, তারা চোরাগোপ্তা পুলিশ খুন শুরু করেছিল বলে পুলিশও হয়ে উঠলো নির্মমভাবে প্রতিশোধপরায়ণ। যাদের বলা যায় সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে, ভালো ভালো পরিবারের মেধাবী ছাত্র ও কিছু ছাত্রী তারা এক দর্শনহীন রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখে মিশে যেতে লাগলো ধুলোয়। বাবা-মায়ের বুক খালি করে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রাণ দিল গুলিতে, পচতে লাগলো কারাগারে, অনেকে পালালো বিদেশে, কেউ কেউ নাক-কান মুলে ভোল বদলে কনট্রাক্টরির ব্যবসায় পয়সা বানাতে মন দিলো।

নকশালরা ছাত্র আন্দোলনের একটা বড় ক্ষতি করে গেল। কলকাতার ছাত্রসমাজ বারবার সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই সময় নকশালদের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় অধিকাংশ ছাত্র রাজনীতিতেই বিমুখ হয়ে গেল। ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা আর কোনো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা তো দূরে থাক, রাজনীতি থেকেই সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলে, তারা তাদের ভবিষ্যতের কেরিয়ার গুছোতে ব্যস্ত। যে কলেজ স্ট্রিট ছিল প্রায় প্রতিদিনের রণক্ষেত্র, যেখানে পুলিশও যখন তখন ঢুকতে সাহস পেত না, সেই কলেজ স্ট্রিট এখন নিস্তরঙ্গ। যারা পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এখানে লেখাপড়া করে প্রবাসে গেছে, তারা সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে এখানে ফিরে এসে জায়গাটা যেন চিনতেই পারে না। ওদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারের পতন পর্যন্ত ঘটিয়ে দিচ্ছে, কলকাতার ছাত্ররা প্রায় নীরব। নকশালপন্থীরা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা জানিয়ে বাংলা স্কুলগুলোতে আগুন লাগিয়েছে, সাধারণ কলেজগুলোতে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে হাত ছোঁয়ায়নি, সেইজন্য নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এখন থেকে যেতে শুরু করলো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠলো আরও ঐ ধরনের স্কুল, চালু হয়ে গেল এক ধরনের ট্যাঁস শিক্ষা। এরা বাংলা বই পড়ে না, বাংলা গান শোনে না, বাংলা ফিল্ম দেখে না। চীনের চেয়ারম্যান জানতেও পারছেন না যে তিনিই অপ্রত্যক্ষভাবে বহু বাঙালী ছেলেমেয়ের কাছ থেকে বাংলা সংস্কৃতি কেড়ে নিয়েছেন!

রাকার জীবনে কোনো রাজনীতির প্রভাব পড়লো না।

ষাটের দশক পর্যন্ত ছাত্রসমাজে রাজনৈতিক মত্ততার জন্য কলেজ-ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসগুলোতে একটা নৈতিকতার আবহাওয়া ছিল। বিপ্লবীরা কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে, তাদের মনে প্রেমের অনুভূতি জাগলেও

তা থাকে সন্তর্পণে চাপা অবস্থায়, ব্যভিচার-লাম্পট্যের প্রতি তাদের প্রবল ঘৃণা থাকে। যে-সব ছাত্র-ছাত্রী সোজাসুজি বিপ্লবী বা সংগ্রামী হয়নি, তাদেরও সহানুভূতি ছিল এইদিকে, সেইজন্য তাদের ব্যক্তিগত জীবনেও সংযম ছিল। সত্তরের দশকের শেষ দিকে যখন একটা রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হলো, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরা নিয়ে এলো মার্কিন ধাঁচের সংস্কৃতির অনুকরণ, সেই সঙ্গে এলো ড্রাগের নেশা ও নির্বিকার যৌনতা। দশ বছর আগে একটি ছাত্র সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের মাঠে-জঙ্গলে জল-কাদার মধ্যে লুকিয়ে থেকে, গাদা বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। দশ বছর পরে ঠিক তার বয়েসীই একটি ছাত্র ম্যানড্রাক্স-এর নেশায় বুঁদ হয়ে, ফাঁকা ফ্ল্যাটে তার এক সহপাঠিনীর কোমর জড়িয়ে ধরে কী দুঃস্বপ্ন দেখছে কে জানে!

রাকা শুনতে পায় যে, প্রায়ই কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রী দলবেঁধে কারুর বাড়িতে কিংবা কাছাকাছি কোনো বাংলোতো যায়, সেখানে অনেক রকম মজা হয়। রাকাকে অনেকে সাধাসাধি করলেও সে যেতে চায় না কিছুতেই। এখনো তার মনের মধ্যে পারিবারিক ছোট গণ্ডিটা রয়ে গেছে। বেশ কয়েকটি ছেলে তার সম্পর্কে উৎসাহী, কলেজের যে-কয়েকটি মেয়ে বিশেষ সুন্দরী হিসেবে গণ্য, রাকা তাদের অন্যতম, তার নাম হয়েছে মিস ইং ডিপ অর্থাৎ ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে সে অতুলনীয়া, পুরো কলেজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মেয়েটির নাম শিরিন আখতার। শিরিন বেশ খোলামেলা, তার নেকনজর এক এক সপ্তাহে এক একটি ছেলের দিকে পড়ে। রাকা কিন্তু নিজেকে এখনো গুটিয়ে রেখেছে। হস্টেলের ঘরেই তার সময় কাটাতে ভালো লাগে, শিখা যতই চমকপ্রদ কথা বলুক, তবু তার সান্নিধ্যেই রাকা স্বচ্ছন্দ বোধ করে সবচেয়ে বেশি।

একতলায় একটা লম্বাটে ঘর আছে ভিজিটারদের জন্য। সোফাগুলো ছেঁড়াখোঁড়া, মান্ধাতার আমলের একটা পাখা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে, রান্নার ঠাকুর-চাকরেরা যাতায়াত করে এই ঘরের মধ্য দিয়ে, এটা কোনোক্রমেই গোপন কথা বলার জায়গা নয়। তবু কোনো কোনো মেয়ের কাছে মাসতুতো দাদারা এসে এখানে বসেই ফিসফিস করে কথা বলে। রাকার সেরকম কোনো দাদা নেই, তার নিজের দাদা তূণীর এসেছিল একবার মাত্র, মাঝে মাঝে আসেন সোমনাথ।

একদিন রাকা কলেজ থেকে ফিরে দেখলো সেই ঘরে অপেক্ষা করছেন

চন্দ্রমৌলি। চন্দ্রমৌলির বেশির ভাগ আসাই আকস্মিক। সুকান্তর সঙ্গে ঝগড়া করে সেবারে যে চলে গেলেন, তখন মনে হয়েছিল পশ্চিমবাংলা সম্পর্কেই তাঁর একটা তিক্ততা জন্মে গেছে, তিনি এখানে আর আসতেই চান না।

প্রাচীন কালের নাইটদের কায়দায় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, দুটো হাত ছড়িয়ে, মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হাউ ইজ মাই প্রিনসেস ?

চন্দ্রমৌলিকে প্রত্যেকবার দেখলেই রাকা একটা চমকিত বিস্ময় বোধ করে। সে হাসিমুখে বললো, মৌলিকাকা, তুমি কবে এলে ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, কাল রাত্রে পৌঁছেছি।

এর মধ্যেই চন্দ্রমৌলি কী করে রাকার হস্টেলের ঠিকানা জেনে ফেললেন, সে প্রশ্নটা রাকার মনে জাগলেও সে জিজ্ঞেস করলো না। চন্দ্রমৌলির পক্ষে সবই সম্ভব।

চন্দ্রমৌলির সঙ্গে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ। তার ভেতর থেকে বাজারের থলির সাইজের একটা কাপড়ের ব্যাগ বার করে বললেন, তোমার জন্য এনেছি।

রাকা মুখটা খুলে দেখলো তার মধ্যে অন্তত গোটা চল্লিশেক চকোলেট বার এবং রাশি রাশি অ্যাসর্টেড টফি। রাকা হেসে ফেললো। চন্দ্রমৌলির স্বভাব সে জানে। কোনো দোকানে গিয়ে পুরো দোকানটাই কিনে নিতে পারলে তিনি খুশি হন।

রাকা বললো, এগুলো কি আমি সারা বছর ধরে খাবো নাকি ? এখানে ফ্রিজ নেই, এগুলো রাখব কোথায় ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, শুধু তোমার একার জন্য আনিনি তো। হস্টেলে কত মেয়ে থাকে, সবাইকে দেবে ! তার বদলে আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াবে ?

রাকা জিভ কেটে বললো, এই রে, আমাদের এখানে যে ভিজিটরদের কিছু খাওয়াবার নিয়ম নেই ! বিচ্ছিরি নিয়ম !

চন্দ্রমৌলি বললেন, তা হলে বাইরে কোনো দোকানে গিয়ে খাওয়া যেতে পারে। তুই বেরুতে পারবি এখন ?

রাকা বললো, হ্যাঁ, তা পারি। বই-টইগুলো ওপরে রেখে আসি !

চন্দ্রমৌলি বললেন, ওয়েট আ মিনিট ! তুই এইমাত্র কলেজ থেকে ফিরলি, নিশ্চয়ই টায়ার্ড, মুখ-হাত ধুবি, আমারও আজ একটা জায়গায় যেতে হবে, হাতে বেশি সময় নেই, এক কাজ করা যাক, কাল সন্ধেবেলা তুই আমার সঙ্গে বাইরে

কোথাও যাবি ? আমি একটা হোটেলে উঠেছি, সেখানেভালোইখাবার দেয়। হস্টেলের খাবার রোজ খাচ্ছিস তো, একটু মুখ বদলানো হবে। কাল সন্ধেবেলা তুই ফ্রি ?

রাকা মাথা নাড়লো।

চন্দ্রমৌলি একটু হেসে বললেন, আজ সন্ধেবেলাতেও যাওয়া যেতে পারত, কিন্তু দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইদিনই নেমন্তন্ন করতে নেই। তা হলে লেডিদের ঠিক সম্মান জানানো হয় না, অন্তত একদিন সময় দিতে হয়। তা হলে কথা রইলো,কাল আমার সঙ্গে ডিনার। আমি সাতটার সময় এসে তুলে নিয়ে যাবো। এখানে খুব কড়াকড়ি নেই তো ? ক'টার মধ্যে ফিরতে হয় ?

রাকা বললো, কাল শনিবার, স্পেশাল পারমিশন নিয়ে দশটার মধ্যে ফিরলেই হবে।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে শিখা বাইরে থেকে এসে ঝড়ের মতন চলে গেল ভেতরে। রাকা ভাবলো, চন্দ্রমৌলির সঙ্গে শিখার আলাপ করিয়ে দেবে, কিন্তু শিখা সে সময় দিলো না। যদিও ওরই মধ্যে শিখা চন্দ্রমৌলিকে লক্ষ করেছে।

রাকা ওপরে আসবার পর শিখা জিজ্ঞেস করলো, তোর কাছে কে এসেছিলেন রে ? আগে তো কোনোদিন দেখিনি। দারুণ হ্যান্ডসাম, ঠিক যেন ক্লাসিকাল চেহারা। দেখলেই মনে হয় বিশেষ কেউ একজন।

রাকা খানিকটা গর্বের সঙ্গে বললো, উনি চন্দ্রমৌলি দত্ত, সে রকম বিখ্যাত কেউ নন, কিন্তু দুর্দান্ত শিকারী, মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে থাকেন। আমার বাবার খুব ছেলেবেলার বন্ধু। দ্যাখ, আমাদের জন্য কত চকোলেট এনেছেন।

শিখা বললো, শিকারী, জঙ্গলে থাকেন, সাউন্ডস ভেরি রোমান্টিক। মোর অ্যাট্রাকটিভ।

তারপর একটা চকোলেটে কামড় দিয়ে সে চোখে দুষ্টমি খেলিয়ে বললো, তুই তো খুব ভাগ্যবতী রে, রাকা। এরকম একজন প্রেমিক পেয়েছিস। আবার এতো চকোলেট দেয়।

রাকা দারুণ চমকে উঠে, রাঙা মুখ করে বললো, অ্যাই, কী হচ্ছে ! বললাম না আমার বাবার বন্ধু ! ওঁর কত বয়েস !

শিখা বললো, বাবার বন্ধু তাতে কী হয়েছে ! বাবার বন্ধুর সঙ্গে প্রেম হতে পারে না ? তোদের ইংরিজিতে একটা কথা আছে না, আংকল্স আর দা বেস্ট টারগেটস ! ওঁর কত বয়েস, বড়জোর বাহান্ন-চুয়ান্ন, পুরুষ মানুষদের কি এটা

আবার বয়েস নাকি ? এই বয়সের লোকদের সঙ্গেই প্রেম-প্রেম ব্যাপারটা ভালো জমে।

রাকা এবারে রেগে উঠে বললো, না শিখা, এই ধরনের কথা আমাকে বলবে না। আমার শুনতে খুব খারাপ লাগে।

রাকার একঝলক মনে পড়লো, মৌলিকাকাকে যেদিন সে প্রথম দেখে, তখন সে ছ-সাত বছরের একটা পুঁচকি মেয়ে, সেদিন চন্দ্রমৌলি তাকে দু' হাতে তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। সেই মানুষের সঙ্গে প্রেম, কী অদ্ভুত চিন্তা !

শিখা বললো, ঠিক আছে, ওঁর সম্পর্কে কিছু বলবো না। বুঝতে পারিনি, কিছু একটা টাচি ব্যাপার আছে। কিন্তু তুই ছেলেদের সঙ্গে মিশিস না কেন রে ? তা হলে পুরুষ মানুষদের চিনবি কী করে ? পৃথিবীর অর্ধেকটাই তোর জানা হবে না।

পরদিন সন্ধেবেলা রাকা বিশেষ একটু সাজগোজ করছে দেখে শিখা জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার, কোথায় যাচ্ছিস রে ? তা হলে শেষ পর্যন্ত কোনো প্রেমিক-ট্রেমিকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে ?

রাকা মিথ্যে কথা বলতে জানে না। সে বললো, ওসব কিছু নয়। মৌলিকাকা আমাকে আজ ডিনার খাবার নেমন্তন্ন করেছেন ওঁর হোটেলে।

শিখা চক্ষু নাচিয়ে পুনরায় ফচকেমির সুরে বললো, সেই গ্রীস যোদ্ধাদের মতন দুর্দান্ত চেহারার ভদ্রলোক ? কাল তুই ওঁকে বাবার বন্ধু বলে খুব ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছিলি ! হোটেলে ডিনার ! রাকা দেবী, আজ থেকে তোমার জীবনে একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু হতে যাচ্ছে। শুধু একটা কথা মনে রাখিস, নিজের মন সায় দিচ্ছে কি না, সেটাই বড় কথা। অন্য একজন কাকুতিমিনতি করলো কিংবা তোষামুদিতে ভুলিয়ে দিলো, তাতেই রাজি হয়ে যাওয়াটা নারীত্বের চরম অপমান।

রাকা ওর পিঠে একটা কিল মেরে বললো, সব সময় এই সব কথা ! ফ্রয়েড তোমার মাথা খেয়েছে। নারী-পুরুষের আরও অনেক রকম সম্পর্ক হয়, সেটা তুমিও বুঝতে শেখো শিখা দেবী !

চন্দ্রমৌলি এলেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। ট্যাক্সি দাঁড় করানো। রাকাকে তিনি নিয়ে এলেন গ্র্যান্ড হোটেলে। এত বড় হোটেলের ভেতরে রাকা আগে কখনো আসেনি। অনেকেই তাকাচ্ছে তার দিকে। লবি দিয়ে যেতে যেতে রাকার একটা কথা মনে পড়লো। ইংরিজি উপন্যাসগুলো পড়লে ধারণা

হয় যে, কোনো পুরুষের সঙ্গে নিভৃত হোটেল কক্ষে যেতে যদি কোনো মেয়ে রাজি হয়, তা হলে ধরেই নিতে হবে যে পুরুষটির সঙ্গে তার সহবাসে সম্মতি আছে। না হলে কেউ ঘর পর্যন্ত যায় না, বাইরে কথা বলে। কিন্তু সে তো সাহেব-মেমদের ব্যাপার। চন্দ্রমৌলি তাকে সেরকম কোনো মতলবে নিজের রুমে নিয়ে গিয়ে বর্বর পুরুষদের মতন আচরণ করবেন, তা রাকা মরে গেলেও বিশ্বাস করতে পারবে না।

বরং ভালোই হলো, যে প্রশ্নটা প্রায়ই তার মনে জাগে, এক বৃষ্টিময় কান্নায় রাত্তিরে চন্দ্রমৌলির ঘরের দরজার কাছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে দেখে আর কিছু বলা হয়নি, আজ নিরিবিলিতে সেই প্রশ্নের উত্তরটা সে জানতে চাইবে।

কিন্তু আজও বলা হলো না। চন্দ্রমৌলি শুধু রাকাকে একা নেমন্তন্ন করেননি, লিফটের কাছেই দেখা হলো আর একটি দম্পতির সঙ্গে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, রাকা, আজ তোমাকে শুধু খেতেই ডাকিনি। তোমাকে এঁদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছি। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সরকার, আমার খুব ভালো বন্ধু, কলকাতায় তোমার কখনো কোনো অসুবিধে হলে এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

নিখুঁত সুট-টাই পরে এসেছেন সত্যেন সরকার, চশমার ফ্রেমটা সত্যিকারের সোনার বলেই মনে হয়। তাঁর স্ত্রী রাধিকার সাজসজ্জাও একটু বেশি রকমের, কাছে গেলেই দামি পারফিউমের ঝাপটা লাগে, দুজনের ব্যবহারেই কলকাতার বনেদী পরিবারের শিষ্টতা। সত্যেন সরকার কেনিয়াতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সেখানেই চন্দ্রমৌলির সঙ্গে তাঁদের পরিচয়। রাষ্ট্রদূতের পত্নী হিসেবে রাধিকা সরকারকে নিয়মিত পার্টি দিতে হতো বলে তিনি এই ধরনের সাজপোশাকে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। স্বামীর তুলনায় তার বয়েস অনেক কম মনে হয়, দ্বিতীয় পক্ষ হওয়াও সম্ভব, সত্যেন সরকার সদ্য রিটায়ার করেছেন।

চন্দ্রমৌলি সবাইকে নিজের ঘরে কেন ডেকেছেন, তার কারণটাও বোঝা গেল। সত্যেন সরকার স্কচ ছাড়া কিছু খান না, বারে-রেস্তোরাঁয় মদ্যপান করেন না, সেইজন্য পানীয়-পর্বটা ঘরে বসে সারা হলো, তারপর খাওয়া হলো নীচের এক রেস্তোরাঁয়।

রাকা চন্দ্রমৌলিকে আগে কখনো মদ্যপান করতে দেখেনি। তাদের বাড়িতে এসবের একেবারেই চল ছিল না। সত্যেন সরকার কেতাদুরস্ত, সাবধানী ড্রিংকার, দু' পেগের বেশি নিলেন না, চন্দ্রমৌলি তার মধ্যেই গেলাস শেষ করলেন

চারবার। রাধিকা সরকার স্কচের বদলে নিলেন জিন, রাকাকে অনেকবার অনুরোধ করা হলো, সে লজ্জায় মাথা নুইয়ে না, না বলতে লাগলো বারবার, শেষ পর্যন্ত চন্দ্রমৌলি অনেকখানি অরেঞ্জ স্কোয়াশের সঙ্গে কয়েকফোঁটা জিন মিশিয়ে দিয়ে বললেন, এটা খাও, এতে কিছু হবে না। মুখে দিয়ে দেখো, ভালো না লাগলে খেও না।

সরকার দম্পতির সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল রাকার। সত্যেন সরকারকেই পছন্দ হলো বেশি, রাধিকা সরকার দু পেগ জিন পান করার পর যেন চন্দ্রমৌলির সঙ্গে বেশি বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখাতে লাগলেন। কথা বলেন চন্দ্রমৌলির গায়ে হাত দিয়ে। তাতে রাকার একটু একটু রাগ হতে লাগলো, আবার নিজেই ভাবলো, তার রাগ করার কী আছে? চার পেগের পরেও চন্দ্রমৌলির ব্যবহারে অবশ্য কোনো পরিবর্তন নেই। সব মহিলারাই কি চন্দ্রমৌলির দিকে এইভাবে আকৃষ্ট হয়? তাতে চন্দ্রমৌলির দোষ কী!

তবু রাধিকা এক একবার চন্দ্রমৌলির বাহু চাপড়াচ্ছেন, রাকা তখন মুখটা ফিরিয়ে রাখছে অন্যদিকে।

সরকার দম্পতিই তাঁদের গাড়িতে রাকাকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

শিখা খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে দু'পা নাচাতে নাচাতে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। রাকাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে গান গেয়ে উঠলো, ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়।... পায়ে দেখছি নাচের ছন্দ, তা হলে হয়েছে একটা কিছু!

অন্যদিনের তুলনায় রাকার মাথাটা যেন অনেক ফুরফুরে আর হাল্কা লাগছে। সেকি ঐটুকু জিন পান করার জন্য! জীবনে প্রথম মদ ছোঁওয়া।

রাকা বললো, হ্যাঁ, একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই!

শিখা বললো, চন্দ্রমৌলি মাথায় তুলে নেচেছে? চন্দ্রমৌলি আর রাকা, নাম দুটো মানিয়েছে ভালো। রাকা মানে তো চাঁদ, তাই না? আর যার মাথায় চাঁদ থাকে, সে চন্দ্রমৌলি!

রাকা সিল্কের শাড়ি বদলাতে বদলাতে বললো, প্রথমটা ভুল। রাকা মানে চাঁদ নয়, পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্না।

শিখা এবার উঠে বসে বিস্মিতভাবে বললো, এই রে, তা হলে এতদিন ভুল জানতুম? ঐ যে অতুলপ্রসাদ না কার যেন একটা গান আছে, 'কেন অন্তর এত মন্থর, আগে তো তা জানিনি...' এর মধ্যে একটা লাইন আছে, 'কেন রাকা মেঘে ঢাকা...' এখানে রাকা মানে চাঁদ নয়?

রাকা বললো, কবিরা একটু-আধটু মানে বদলে দেয়। তাকে বলে পোয়েটিক লাইসেন্স। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে...' চাবি ভাঙলে সেই ঘর থেকে কি আর কারুকে বার করা যাবে!

শিখা হু হু করে হেসে উঠলো। বিছানা চাপড়ে বললো, তাই তো, এই গানটা অনেকবার গেয়েছি, তালা ভাঙার বদলে যে চাবি ভাঙা হয়ে গেছে, সেটা খেয়াল করিনি! যাক গে, আসল ব্যাপারটা বল, আজ কতদূর এগোলো?

এত ছোট ঘরে আব্রু রক্ষার কোনো প্রশ্ন নেই। রাকা তার অংশের দেওয়ালের দিকে ফিরে ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে বললো, তুমি শুনে হতাশ হবে। উনি শুধু আমাকে একা নেমন্তন্ন করেননি। আরও দুজন ছিলেন সেখানে!

শিখা বললো, হায় হায়, লোকটার দেখছি একদম সেন্স নেই। কাবাব মে হাড্ডি। আবার মাঝখানে অন্য লোক। ধুস! কী রে, তুইও হতাশ হসনি?

রাকা মুচকি হেসে বললো, তা একটু হয়েছি ঠিকই!

—যাক, এর পর যখন ডিনারে ডাকবে, দেখবি, আর কেউ থাকবে না।

—উনি কাল বম্বে চলে যাচ্ছেন।

—আহারে, তা হলে কী করবি? গালে হাত দিয়ে কাঁদবি? নাকি শুয়ে শুয়ে ঐ মধ্যবয়স্ক হীরোর কথা ধ্যান করবি!

—দুটোই একসঙ্গে করলে কেমন হয়?

চন্দ্রমৌলি সম্পর্কে এ রকম রসিকতায় রাকা বাধা দিচ্ছে না, বরং চালিয়ে যাচ্ছে, এতে নিজেই অবাক হচ্ছে রাকা। এও কি ঐ কয়েকফোঁটা জিনের প্রভাব?

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মাথায় জল দিয়ে ফিরে এসে বললো, শিখা, তুমি ঐ গানটা একটু করো না, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি....'

শিখা দু' লাইনের বেশি গায় না। অনুরোধ করলে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরে। দু' লাইনের পর থেমে গিয়ে বললো, আমাদের এক জায়গায় একটা জোর আড্ডা আছে, তোকে নিয়ে যাবো। একবার গিয়েই দ্যাখ না কেমন লাগে।

এর কয়েকদিন পর, শিখার শিক্ষা প্রথম কাজে লাগালো রাকা।

কলেজ থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে অপেক্ষা করছে রাকা, দেখতে পেলো কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে আসছে একজন পরিচিত পুরুষ, যার প্রতিটি পদক্ষেপে

আত্মবিশ্বাস, সঙ্গে একটি হাস্যমুখী যুবতী। সেদিকে তাকিয়ে রাকা একটা মুদ্রা নিয়ে হেড আর টেইল করার মতন মনে মনে প্রশ্ন করলো, ঐ যুবতীটির নাম কী, বনানী না মুকুলিকা ?

সেদিন বাস আসতে দেরি করছে, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দেখা হওয়াটা যেন পূর্ব নির্ধারিত ছিল। শুধু তাই নয়, সঙ্গের যুবতীটিকে বিদায় জানাবার পর রাস্তা পার হতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের চোখাচোখি হলো রাকার সঙ্গে, সে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের চিহ্ন দেখলো না, রাকার পাশে চলে এসে উৎফুল্ল গলায় বললো, তা হলে কলকাতাতেই পড়াশুনো করছো ?

রাকা ওর চোখে চোখ রেখে বললো, হ্যাঁ।

ইন্দ্রজিৎ বললো, গুড। সুকান্ত রাঁচি চলে যাবার পর তোমাদের আর কোনো খবর পাইনি। সুকান্ত শুনলাম নরয়োতে একটা চাকরির অফার পেয়েছে। মাই গড, নরওয়ে ! সে যে ধাদ্ধারা গোবিন্দপুর ! যাকে বলে ব্যাক অফ বিয়ন্ড ! চলো, তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিচ্ছি ! আমি ঐ দিকেই যাবো।

রাকা ভুরু তুলে বললো, ঐ দিকে মানে কোন্ দিকে ?

ইন্দ্রজিৎ সকৌতুকে হেসে বললো, তোমাদের হস্টেল যেদিকে !

রাকা দু' দিকে মাথা দুলিয়ে বললো, আমি তো এখন হস্টেলে ফিরছি না। আমি নর্থ ক্যালকাটায় সত্যেন সরকার বলে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যাবো।

ইন্দ্রজিৎ তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে রাকার দিকে চেয়ে রইলো পরিপূর্ণ চোখে। শ্লেট রঙের একটা শাড়ি পরে আছে রাকা, বাঁ হাতে একটা সাদা রঙের ঘড়ি, শিখার দেখাদেখি সে চুড়ি বা দুল কিছু পরে না, শুধু কপালে একটা টিপ, হঠাৎ বেশ লম্বা হয়ে যাওয়ায়, তার শরীরে একটা জলপ্রপাতের ভাব এসেছে।

অনেকটা আপন মনেই ইন্দ্রজিৎ বললো, তুমি যে সুন্দর তা নয়, সেটা কোনো ফ্যাক্টর নয়, তোমার চেয়েও সুন্দরী দু' একটি মেয়েকে আমি চিনি, কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার মনে একটা বিশেষ জায়গা আছে, রাকা। তোমাকে আমি একটুও ভুলিনি। তোমার সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে। কবে দেখা হচ্ছে বলো।

রাকা বললো, কাল। হ্যাঁ, কাল বিকেলে হতে পারে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, বাঃ। কোথায় বলো, আমি কিন্তু তোমাদের এই কলেজের গেটে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না। অল্প বয়সী ছেলেরা হিংসে করবে।

রাকা বললো, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের সিংহের পাশে। সওয়া পাঁচটায়।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আমি গাড়ি নিয়ে আসবো, তারপর অন্য কোথাও গিয়ে বসা যাবে। আমি পাঁচটা থেকে অপেক্ষা করবো।

এই প্রথম রাকা বেশ ভেবে চিন্তে মিথ্যে কথা বললো। ইন্দ্রজিৎকে দেখেই সে ঠিক করেছিল, এখানে দাঁড়িয়ে ছাদের পাঁচিলে পা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতন কিছু বলা যাবে না।

পরদিন রাকার ক্লাস পৌনে চারটে পর্যন্ত, তারপর দু' দিন ছুটি। কলেজ থেকেই রাকা বর্ধমানে চলে যাবে ঠিক করে রেখেছিল। ক্লাস শেষ করে হাওড়া স্টেশানে গিয়ে চারটে কুড়ির ট্রেন ধরলো রাকা। হিস্ট্রি আর ইকোনমিক্সের দুটি ছাত্রর বাড়ি শক্তিগড়ে, তাদের সঙ্গে এক কামরায় উঠে রাকা গল্প করতে লাগলো, ওদের মধ্যে একজন ওয়াল ম্যাগাজিনের সম্পাদক, রাকাকে দিয়ে কিছু লেখাবার জন্য প্রায়ই সে খুব ঝুলোঝুলি করে।

এক সময় রাকা দেখলে ঘড়িতে সওয়া পাঁচটা। ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে আছে সিংহের মূর্তির সামনে। ছটফট করবে, এদিক ওদিক তাকাবে। কতক্ষণ থাকবে, সাড়ে পাঁচটা না আরও বেশি ? রাকা খুব মজা পাচ্ছে। এত প্রবল ওর আত্মবিশ্বাস, আজ একটুখানি ক্ষয়ে যাবে নিশ্চয়ই! ইন্দ্রজিৎ তাকে চায়, কিন্তু সে ইন্দ্রজিৎকে চায় কি না তা জানার কোনো আগ্রহ নেই ইন্দ্রজিতের। নারীর প্রতি অধিকার বোধ! ইন্দ্রজিৎ কত দূর যেতে পারে, তা দেখতে চায় রাকা।

সহপাঠী দু'জন নেমে গেল শক্তিগড়ে। ট্রেনটা তবু থেমে রইলো সেখানে, সিগন্যাল পায়নি। উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে খেলা করছে তিনটে বাচ্চা মেয়ে, ওদের বয়েস বড়জোর ছ' সাত বছর, ধুলো মাখা ফ্রক পরা, মাথার চুলে জট, গালে এক পোঁচ ময়লা, তবু সোডার বোতলের ছিপি নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে মহানন্দে। রাকা এক দৃষ্টিতে দেখছে ওদের খেলা। ওদের কোনো বাড়িঘর নেই, থাকে প্ল্যাটফর্মে, কখন কী খাবে তার ঠিক নেই, তবু আনন্দ তো কম নয়!

একজন বুড়ো মতন লোক এসে তাড়না দিতেই মেয়ে তিনটি লাফিয়ে নেমে পড়লো লাইনের ওপর, তিনজন এগোলো তিনটি কামরার দিকে। একজনকেই চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে লাগলো রাকা। অতটুকু মেয়ে, একেবারে বড়দের মতন ভাবভঙ্গি, চিক চিক করে থুতু ফেলছে, লাইনের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। রাকা কোনোদিন রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটেনি, অমন ভাবে থুতুও ফেলেনি। ঐ মেয়েটার বয়েসে সবাই তাকে পুতুল বলতো!

মেয়েটা রাকাদের কামরাতেই উঠলো, এরই মধ্যে মুখখানা কী দারুণ বদলে

ফেলেছে। এক মিনিট আগে সে খেলার সময় খিল খিল করে হাসছিল, এখন চোখ দুটো কাঁদো কাঁদো, একটা হাত পেটের কাছে, একটা হাত এগিয়ে বলতে লাগলো, বাবুজী, সারাদিন খাইনি, বহুৎ ভুখ লেগেছে, মাইজী...। কী দারুণ অভিনয়! কেউ শেখায়, না নিজে নিজে শিখে যায়? মানুষ সহজাত অভিনয়-প্রতিভা নিয়ে জন্মায়!

শিখার কথাটা মনে পড়লো তার। নারী ও পুরুষেরা বিছানাতেও অভিনয় করে, সেইখান থেকেই তো জন্মায় ছেলেমেয়েরা। বিছানাটাও একটা মঞ্চ, দর্শক নেই একজনও, দু'জন অভিনেতা-অভিনেত্রী...দৃশ্যটা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে!

॥ ৭ ॥

প্রথম আলাপের সময় সুপ্রকাশ বলেছিল, আমি একজন মাছওয়ালা।

এই কয়েক বছরে সত্যেন সরকারের পরিবারের সঙ্গে রাকা অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছে, সম্পর্কটা আরও বেশি দৃঢ় হতে পারতো, কিন্তু সেটা এড়িয়ে গেছে সে। সত্যেন ও রাধিকার কোনো সন্তান নেই, একটিই মাত্র পুত্র জন্মের পর আড়াই বছর মাত্র বেঁচেছিল, গত ঊনত্রিশ বছর ধরে সেই শোক তাঁরা সযত্নে লালন করছেন, কিন্তু খুব নিভৃতে, তাঁদের সহবৎ অনুযায়ী এ কথা বাইরের লোকদের কাছে প্রকাশ করতে নেই।

উত্তর কলকাতায় তাঁদের একশো দশ বছরের পুরোনো বাড়ি, সত্যেনেরই পিতামহের নামের রাস্তার ওপর, এক সময় সামনের দিকে বাগান ছিল, ফোয়ারার মাঝখানে শ্বেত পাথরের পরী ছিল সদা হাস্যমুখী, এখন শরিকী ভাগাভাগিতে সম্পত্তি অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে, তবু সত্যেনদের অংশটি তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড়। পুরোনো চত্বরের মধ্যে সত্যেনদের বাড়িটিতে এগারোখানি ঘর, বাগান ধ্বংস হয়ে আর এক দিকে উঠেছে ফ্ল্যাট বাড়ি, অন্য শরিকরা তাদের অংশে দোকানঘর ভাড়া দিয়েছে, কেউ একটা মোটর মেরামতি গ্যারাজ খুলে ফেলেছিল, সেটা আর তোলা যাচ্ছে না, সব মিলিয়ে বিসদৃশ দেখায়।

সত্যেনদের অংশের ভেতরে এলে অবশ্য এখনো খানিকটা ওল্ড ওয়ার্লড চার্ম পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর আসবাব, খাঁটি বেলজিয়াম কাচের আয়না, ইটালিয়ান মার্বলের টেবল, বিচিত্র সব সুইস ঘড়ি, রেনেশাঁস আমলের শিল্পীদের

ছবির কপি গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো। বৈদেশিক দফতরের চাকরি নিয়ে সত্যেন বহু দেশে ঘুরেছেন, সব দেশ থেকেই রাধিকা নিয়ে এসেছেন নানা রকম টুকিটাকি পুতুল ও স্যুভেনির, সেই সব কিছুতে ঘরগুলি ঠাসা।

একতলার ঘরগুলিতে কর্মচারি ও কয়েকজন আশ্রিত থাকে, দোতলায় পাঁচখানা ঘর, তিন তলায় একটি, সত্যেন ও রাধিকা শয়নকক্ষ বদল করেন প্রায়ই।

চন্দ্রমৌলির অনুরোধেই সম্ভবত সত্যেন ও রাধিকা রাকার খোঁজ খবর নিতে শুরু করেন ঘন ঘন, রাকাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন প্রায়ই। রাধিকা একদিন রাকাদের হস্টেলের ওপর তলায় এসে রাকা ও শিখার ঘরখানি দেখে এমনই বেদনায় শিহরিত হয়েছিলেন, যেন আর একটু হলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এইটুকু ঘরে দু' জন মানুষ থাকতে পারে ?

তারপর থেকেই সত্যেন ও রাধিকা পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন রাকাকে তাঁদের বাড়িতে এসে থাকবার জন্য। অতগুলো ঘর খালি পড়ে আছে। রাকা রাজি হয়নি, হস্টেলের ঐ ছোট ঘরে তার কোনো কষ্ট হয় না, তা ছাড়া শিখাকে ছেড়ে থাকার কথা সে ভাবতেই পারে না। শিখা অবশ্য প্রস্তাবটা শুনেই বলেছিল, যা না, চলে যা, বনেদী বাড়িতে ভালো খাবি-দাবি, এক কাঁড়ি টাকা বাঁচবে, মেয়েদের খুব বেশি টাকা দরকার, এ যুগে টাকাই তো বাহুবল, তবে কিপ্টেমি ব্যাপারটা বড্ড বাজে। তা ছাড়া, একটু হেসে শিখা বলেছিল, বুড়ো-বুড়ির ছেলেপুলে নেই, তোকে পছন্দ হয়ে গেছে, তোকেই হয়তো সব সম্পত্তি দিয়ে যাবে।

রাকা তবু যায়নি।

কিন্তু কলেজ শেষ করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে এসে রাকা হস্টেল বদলাতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে শিখা এম-এসসি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে, রিসার্চ শুরু করতে করতেই আমেরিকার বোস্টন থেকে একটা স্কলারশিপ জোগাড় করে ফেললো। যাবার আগে সে রাকাকে বলে গেল, ভাবিস না আমেরিকা আমাকে খেয়ে ফেলবে, অত কাঁচা মেয়ে আমি নই, ধনতন্ত্র থেকে এক চামচ সুযোগ খেয়ে নিয়ে আবার আমি ফিরে আসছি। প্রত্যেক বছর নোবেল প্রাইজের তালিকাটার দিকে চোখ রাখিস, কেমিস্ট্রিতে শিখা সেনগুপ্তর নামটা হঠাৎ পেয়ে যেতে পারিস।

তারপর রাকাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি যদি পুরুষ হতাম, তোকে কী ভালোই যে বাসতাম, রাকা ! আশা করি গর্দভ পুরুষগুলোর মধ্যে অন্তত কেউ

একজন তোর মর্যাদা বুঝবে। তুই এত ভালোবাসা ভালোবাসা করিস, তোর পাওয়া উচিত।

শিখা চলে যাবার পর বেশ কয়েকদিন রাখার মন খারাপ ছিল। নতুন হস্টেল খুঁজতে গিয়েও সে পছন্দমতন কিছু পেল না, অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে থাকার ইচ্ছে তার আর একেবারেই নেই। সত্যেন সব খবর রাখছিলেন, এক দিন জোর করেই প্রায় রাকার জিনিসপত্র নিজেদের বাড়িতে এনে তুললেন। রাধিকা বললেন, বেশ তো, ভালো কোনো হস্টেলের রুম পেলে তুমি না হয় চলে যেও, ততদিন এখানে থাকতে তোমার আপত্তি কিসের?

তার দু' দিন পরেই এলেন চন্দ্রমৌলি।

তিনি এর মধ্যেও কয়েকবার এসেছেন, রাকা অনুভব করে যে চন্দ্রমৌলি দূর থেকে তার ওপর নজর রাখছেন। চিঠি লেখেন না বেশি, শুধু রাকার জন্মদিনটা ঠিক করে একটা কার্ড পাঠান, রাকাকে তিনি কোনো উপদেশ দেন না, কিন্তু অন্তরীক্ষ থেকে তিনি যেন তার সব গতিবিধি লক্ষ করেন। ইন্দ্রজিৎও একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, চন্দ্রমৌলি দত্ত তোমার কে হন গো?

চন্দ্রমৌলি অবশ্য সত্যেনদের বাড়িতে থাকেন না কখনো, প্রত্যেকবার এসে ওঠেন হোটেলে। সত্যেন আর রাধিকা অনেক অনুরোধ করলেও এড়িয়ে গিয়ে বলেন, আমি বছরের পর বছর জঙ্গলে কাটাই, তাই মাঝে মাঝে হোটেলে এসে বাবুগিরি করতে ইচ্ছে করে। রাত দুটোর সময়ও ফোন তুলে কফি চাইলে ঘরে এসে কফি পৌঁছে দেবে, এটাই আমার কাছে চরম বিলাসিতা।

রাধিকা খানিকটা অভিমানের সঙ্গে জানালেন, এমন একটা কথা বললেন, রাত দুটোর সময় কফি...অত কফি খাবেন না, শরীর খারাপ হবে।

চন্দ্রমৌলির স্বাস্থ্য আগেরই মতন অটুট, শুধু মুখের রংটা রোদে পুড়ে দিন দিন আরও তামাটে হয়ে যাচ্ছে।

রাকা এ বাড়িতে এসেছে বলে চন্দ্রমৌলি দৃশ্যতই খুব খুশি। তিন তলার একলা ঘরখানি সত্যিই ভারী মনোরম, এত বড় কক্ষ যে একালের তিনখানা ঘর তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, চন্দ্রমৌলি রাকাকে বললেন, ঘরে বেশি জায়গা থাকলে চোখের আরাম হয়, জানলা দিয়ে তাকালে অনেকটা দূর, দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত দেখা যায়, পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে চোখ তুলে দূরের দিকে তাকাবি, তাতে চোখের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সব সময় সামনে একটা দেয়াল দেখতে কারুর ভালো লাগে?

এ বাড়িতে রাকার কোনো রকম ব্যাঘাত নেই, সত্যেন-রাধিকা বাড়াবাড়ি রকমের খাতির যত্ন করেন না, কাজের লোকদের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে, রাকার প্রয়োজনীয় সবকিছু নিঃশব্দে এসে যায়।

দোতলা থেকে তিন তলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর রয়েছে একটা নীলাভ ফ্লাওয়ার বোল। রোজ তার মধ্যে থাকে টাটকা ফুল। প্রথম দিন ওটা দেখে রাকা চমকে উঠেছিল। তাদের বর্ধমানের বাড়িতে যে ফ্লাওয়ার বোলটি আছে, এটা যেন তারই যমজ। তফাত শুধু এই যে রাকাদেরটা খানিকটা ভাঙা, সেই ভাঙা অবস্থাতেই কেনা হয়েছিল রথের মেলা থেকে।

এই জিনিসটা দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে রাকার। সেবন্তীর বিচিত্র সব শখ ছিল। আর একবার মেলা থেকে যে ঘড়িটা কেনা হয়েছিল, তার চেয়েও আরও সুদৃশ্য পুরোনো ঘড়ি এ বাড়িতে রয়েছে তিন চারটে। মা যদি আসতেন এ বাড়িতে! সোমনাথ একবার এসে দেখে গেছেন, কিন্তু মা—। শিখার সঙ্গে আলাপ হবার আগে রাকা খানিকটা বিশ্বাস করতো যে মৃত্যুর পর মানুষ ওপরে চলে যায়, সেখান থেকে অনেক কিছু দেখতে পায়, কিন্তু এখন সে বিশ্বাস রাকার একেবারেই টলে গেছে।

সত্যেন-রাধিকার সন্তান না থাকলেও তাঁদের ম্যাচ মেকিং-এর বাতিক আছে। যে-কোনো অবিবাহিত তরুণ-তরুণীকে দেখলেই তাঁরা মনে মনে সম্বন্ধ পাতাতে শুরু করে, অমুকের সঙ্গে তমুককে ভালো মানাবে না? অনেক সময় মনে মনে নয়, বলেন প্রকাশ্যেই, যদিও তাঁদের এই চেষ্টার বিশেষ সুফল এ পর্যন্ত দেখা যায়নি, তবু তাঁদের আলস্য নেই। তাঁদের এই খেলায় রাকা একটি আদর্শ খেলনা।

সত্যেন প্রায়ই রাকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, এমন মিষ্টি মেয়েটি, যাদের বংশের বউ হবে...

সত্যেন রাধিকার ছেলেটি বেঁচে থাকলে এখন বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়েস হতো, সেই বিলীন সন্তানের বধূরূপে রাকাকে কল্পনা করে হয়তো সত্যেনের মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। রাধিকা অবশ্য আর একজনের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাছাকাছি আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে এঁদের তেমন সম্পর্ক নেই, অনেকের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ, প্রাচীন, চৌচির হয়ে যাওয়া পরিবারগুলিতে যেমন হয়। রাধিকা তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়-জ্ঞাতিদের দু' চক্ষে দেখতে পারেন না, তবে তাঁর বাপের বাড়ির দিকের কয়েকজন এ

বাড়িতে প্রায়ই আসে। তাদের মধ্যে একজন রাজেশ, রাধিকার দিদির ছোট ছেলে, কারুর কারুর ধারণা, রাজেশের নিজেরও ধারণা, এই সম্পত্তিটি সে-ই পাবে।

এই রাজেশই প্রথম ব্যক্তি, যার সঙ্গে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ইত্যাদি কিছু গড়ে ওঠার আগেই তার সঙ্গে রাকার এক বিছানায় শোওয়ার লাইসেন্সের কথা প্রকাশ্যে আলোচিত হলো। অনেক দিন আগে বুড়িমা একবার সুকান্তর কথা তুলেছিলেন বটে, কিন্তু তখন রাকা অনেক ছোট, সেটা ছিল নিতান্তই কথার কথা এবং সুকান্ত কিছুই জানতো না। রাজেশ জানে।

রাজেশকে বেশ সুপুরুষই বলা যায়, মেদহীন মাঝারি গঠন, মুখমণ্ডলে খুঁত নেই, সে দুর্গাপুরে একটি কনস্ট্রাকশান ফার্মের পার্টনার, আগে অন্য একজনের সঙ্গে কোয়ার্টার ভাগাভাগি করে থাকতো সেখানে, এখন নিজস্ব বাড়ি হয়েছে, তাই বিবাহের জন্য প্রস্তুত। প্রায়ই তাকে কলকাতায় আসতে হয়।

বিয়ের কোনো প্রশ্নই নেই, রাকা রাজেশকে একজন অনাত্মীয়, অসহপাঠী পুরুষ হিসেবে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছিল। দু' তিন দিন আলাপের পরই সে বুঝে গেল, এই রাজেশ একটি পুরোপুরি ফিলিস্টিন। এর মুখে রাকা শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা বিষয়ে একটি বাক্যও শোনেনি, যা অবধানযোগ্য। বেশ, সবাই শিল্প-সাহিত্য বোঝে না, না বুঝলেও চলে, কিন্তু কিছু একটা তো বুঝবে!

সেদিন আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ষা নামলো, বহু প্রতীক্ষিত বর্ষণ, ছুটে গিয়ে বাইরে দেখার মতন বৃষ্টি, শরীর ভিজিয়ে ছুটোছুটি করার মতন। অথচ বারান্দায় বসে সন্ধেবেলা চা খেতে খেতে, বৃষ্টির ছাঁটে সরে এসে রাজেশ মুখ বিকৃত করে বললো, ধুৎ, কী ঝঞ্ঝাট, এখন আবার বৃষ্টি নামলো, আমাকে ফিরতে হবে। এর কয়েকদিন আগে সে বলেছিল, কলকাতার রাস্তায় দুপুরে বেরুনো যায় না, এমন বিচ্ছিরি রোদ আর প্যাচপেচে ঘাম। আর একদিন সে দুর্গাপুর থেকে মীরপুর নামে একটা জায়গায় যাওয়ার প্রসঙ্গে বললো, ওখানে যাবার একটা ঝামেলা আছে, খেয়াতে একটা নদী পার হতে হয়। যে মানুষ বৃষ্টি পছন্দ করে না, রোদ পছন্দ করে না, নদী পছন্দ করে না, সে কি শুধু পূর্ণিমা রাতের জ্যোৎস্না ভালোবাসতে পারে? এই পৃথিবীটাই কি তার কাছে বাসযোগ্য?

রাধিকা তো চেষ্টা করছেনই, রাজেশেরও চেষ্টার ত্রুটি নেই। আচমকা সে ওপরের ঘরে রাকার সঙ্গে গল্প করতে চলে আসে। নিরালা ঘরে রাকা সব

সময় উপযুক্তভাবে সজ্জিত থাকে না, রাজেশ তবু গ্যাঁট হয়ে বসে। শিখার কাছে শিক্ষা বৃথা যায়নি, রাকা জানে কী করে এই ধরনের মানুষকে প্রতিহত করতে হয়।

রাকার বিছানা থেকে খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে বসে রাজেশ সিগারেট ধরালে রাকা প্রথমে তাকে একটু ছাই মেঝেতে ফেলতে দেয়, তারপর একটা চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে, এটাকে অ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহার করুন। তারপর জিজ্ঞেস করে, দুর্গাপুরে নতুন কী বানাচ্ছেন।

রাজেশের কম্পানি একটা বাজার নির্মাণে হাত দিয়েছে, সেটার বিস্তারিত পরিকল্পনা জানাতে আগ্রহী হয় রাজেশ, রাকা মন দিয়ে শোনে একটুক্ষণ, হঠাৎ মাঝপথে বাধা দিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে বলে, আপনি এই বইটা দেখেছেন, 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং পোয়েট্রি' ? খুবই উপকারি বই, বুঝলেন, কবিতা বুঝতে গেলে, এই দেখুন না, উইলিয়াম ব্লেকের কবিতা 'দা স্কফারস', আপনি ব্লেকের কবিতা ভালোবাসেন ?...এই ছোট্ট কবিতাটায় এমন কিছু আছে, 'অ্যান্ড এভরি স্যান্ড বিকাম্স আ জেম'...প্রত্যেকটা বালির কণা কী করে মুক্তো হয়ে গেল, এমন সুন্দর বুঝিয়েছে...

রাজেশ বাজার-নির্মাণ বিষয়ে জানে, সে যদি সেই বিষয়ে কথা বলতে পারে, তা হলে ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী রাকাই বা কেন উইলিয়াম ব্লেক বিষয়ে কথা বলবে না ?

রাজেশ মাঝখানে একটু বাধা দেবার চেষ্টা করলেও রাকা দ্বিগুণ উৎসাহে আরও কঠিন কঠিন কবিতার প্রসঙ্গ আনে, উইলিযাম বাটলার ইয়েটস-এর কবিতার ছন্দ-বৈচিত্র্য, জেমস জয়েসের ভাষা ব্যবহার... । যারা কাব্য-সাহিত্য একেবারেই পড়ে না, তাদের গায়ে যেন হুল ফোটায় এইসব কথা, মিনিট পাঁচেক পরেই তারা ছটফট করে, অন্যমনস্ক হতে চায়, কিন্তু কোনো সুন্দরী মেয়ের কাছে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকার জন্য তো তারা আসে না। সেই তরুণীর মুখ নিসৃত ব্লেক-জয়েস-ইয়েটসের মতন বীভৎস নামগুলো তাদের কানে হাতুড়ির ঘা মারে, একটু পরেই তারা কোনো কাজের ছুতো দেখিয়ে বিদায় নেয়। মেয়েদের মুখে বেশি জ্ঞানের কথা অধিকাংশ পুরুষই একেবারে পছন্দ করে না, নিজের চেয়ে কোনো মেয়ের বেশি পাণ্ডিত্য সহ্য করতে পারে না।

কয়েকজন নাছোড়বান্দা সহপাঠীদের ওপরেও রাকা এটা পরীক্ষা করে দেখেছে। যৌন-তাড়না নিবৃত্ত করার সবচেয়ে ভালো অস্ত্র একঘেয়ে সুরে পড়াশুনোর কথা বলে যাওয়া, কোনো তত্ত্ব সম্পর্কে জটিল প্রশ্ন তোলা।

সত্যেন আর রাধিকা তাঁদের সমশ্রেণীর মানুষজনের মধ্যে পরিচয় করাবার জন্য রাকাকে কয়েকটা পার্টিতে নিয়ে গেছেন জোর করে। নিজের পরিবারের চেয়ে উচ্চতর একটা সমাজ দেখতে পেয়েছে রাকা। কলকাতা শহরটা অবাঙালী ব্যবসায়ীরা প্রায় পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে বটে, কিন্তু কিছু বাঙালী বংশ এখনো রয়ে গেছে, যাদের পরিবারের মেয়েদের সর্বাঙ্গ এখনো সোনা দিয়ে মোড়া থাকে। সেইসব নারীদের দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে রাকা। রাস্তা ঘাটে এদের দেখা যায় না, এরা লুকিয়ে থাকে কোথায়? এখনো অন্তঃপুরবাসিনী! দুধে-আলতা রং, দুর্লভ শাড়ি-গয়নার সাজ, তাদের মুখে চোখে সুখী-সুখী ভাব, তাদের পাশে রাকাকে কত ম্লান দেখায়! রাকা কখনো সাজে না, রাধিকা দু একবার নিজের গয়না দিয়ে তাকে সাজাতে চেয়েছিলেন, সে রাজি হয়নি, কিন্তু পার্টিতে এই সব মহিলাকে দেখে রাকা নিজের রূপ সম্পর্কে লজ্জা পেয়েছে।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের দু বছর রাকা খানিকটা বোকা হয়ে গিয়েছিল, একটা অর্থহীন অহঙ্কার তার পড়াশুনোরও ক্ষতি করেছে। শিখার সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে কিছুদিনের জন্য মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। অন্তত তিনটি যুবক এবং একজন তরুণ অধ্যাপক তাকে নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করে ঘুরিয়ে দিল তার মাথা, রাকার নিজেরই ধারণা হলো অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, সে অনন্যা। সহপাঠিনীদের সঙ্গে সে বিশেষ মেশে না, পুরুষদের সঙ্গই তার বেশি কাম্য।

তরুণ অধ্যাপকটি একদিন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, The face that launched a thousand ships!

তা শুনে রাকা লজ্জা পেল না, সে রোমাঞ্চিত হলো, সে যেন সত্যিই ট্রয় নগরীর সেই রূপসী, যার জন্য এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এখানেও সোমেন-দীপঙ্কর-অতীশরা লড়াই করছে।

সবাই ইতিহাসে স্থান পায় না, কিন্তু পৃথিবীর হাজার হাজার শহরে, এমন কী গ্রামেও, ছোট ছোট কোণে একজন করে স্থানীয় হেলেন বা ক্লিয়োপাট্রা বা নূরজাহান বা দ্রৌপদী থাকে, তাদের নিয়ে পুরুষদের লড়াই চলে, সব সময় হয়তো রক্তপাত হয় না, কিন্তু হৃদয় খুন হয়, চোখ অন্ধ হয়। এই সব ক্ষুদ্র কাহিনী নিয়ে কেউ আর মহাকাব্য রচনা করে না, একজন নারীকে নিয়ে একাধিক পুরুষের দ্বন্দ্বকে একালের গল্প-উপন্যাসে তুলনা দিয়ে বলা হয়, একটুকরো মাংসখণ্ড নিয়ে কয়েকটা কুকুরের মারামারি। কুকুর তবু জীবন্ত

প্রাণী, নারী শুধুই মাংসখণ্ড। রাকা সেই সময়টায় স্বেচ্ছায় মাংসখণ্ড হয়েছিল।

স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভারসিটি এই স্তরগুলো পার হবার সময় ছেলেমেয়েদের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়। এ দেশের বাল্য-কৈশোর অনেক প্রলম্বিত, কলেজ-পর্যায়েও ছেলেমেয়েরাও অনেকটা যেন বাচ্চা থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তারা পূর্ণবয়স্ক হয়। তখন যা-খুশি করার একটা স্বাধীনতা বোধ আসে।

শিখার সঙ্গে দু একটা মিশ্রিত আড্ডায়, পিকনিকে যেতে শুরু করেছিল রাকা, এই সময়টায় ঐ দিকেই তার ঝোঁক বাড়লো। তিন-চারজনের ছোট ছোট দল মিলে কাকদ্বীপ কিংবা মুর্শিদাবাদে বেড়াতে যাওয়া, কোনো বাংলোয় রাত কাটানো, ঠিক বেলেল্লাপনা নয়, তবে ছুটকো-ছাটকা শরীরের খেলা চলে, কেউ সিগারেটে গাঁজা ভরে টানে, কেউ রামের পাঁইট সঙ্গে নিয়ে যায়, সব সময় রাকা মধ্যমণি, সবাই তার রূপের প্রচ্ছন্ন স্তুতি করে, তাকে ছুঁতে চায়, এতে রাকা অহঙ্কারের শিহরন বোধ করে। শরীরও খানিকটা আলগা করে দিয়েছিল রাকা, একটু আধটু ছোঁয়াতে আর কী দোষ, সকৌতুকে আলিঙ্গন, বাথরুমের দরজার পাশে হঠাৎ চুমু। রাকা আরও ভেসে যেতে পারতো, শেষ পর্যন্ত গেল না, তাকে বাঁচিয়ে দিলো ইন্দ্রজিৎ।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটের কাছে সিংহ মূর্তির পাশে একঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল ইন্দ্রজিৎ, তারপরেও সে নিরস্ত হয়নি। রাকা তাকে এড়িয়ে গেছে আরও দুবার, তাতেও রাগ দেখায়নি সে, নিজের ক্ষমতার ওপর তার যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস। রাকাকে দেখলেই সে রহস্যময়ভাবে হাসে। ইন্দ্রজিৎ রাকার হস্টেলের ঠিকানা জেনেও সেখানে যায়নি কখনো, কলেজ কম্পাউন্ডেও ঢোকেনি, সে যেন জানেই যে রাকার সঙ্গে তার দেখা হবে।

এক বৃষ্টির দিনে রাকা এক হাঁটু জল ভেঙে হাঁটছে কলেজ স্ট্রিট দিয়ে, একটা জিপগাড়ি চালিয়ে ইন্দ্রজিৎ তার পাশে এসে থামলো, ঢেউ দিয়ে আর একটু শাড়ি ভেজালো, তারপর তুলে নিল গাড়িতে।

সেইদিনই নয়, আর একটা বৃষ্টির দিনে রাকা ইন্দ্রজিতের সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যেতে রাজি হয়েছিল। রাকা ততদিনে আর অনাঘ্রাতা পুষ্পটি নেই, তার সহপাঠী অতীশকে সে দুবার চুমু খেয়ে ফেলেছে, চুমু খাওয়া ও না-খাওয়ার মধ্যে যে বিরাট কোনো পরিবর্তন ঘটে যায় না তাও সে বুঝে গেছে। শিখা যেমন বলেছিল।

ইন্দ্রজিৎ তাদের কারখানার একটা জিপগাড়ি চালায়, সামনের সিটে বসেছে

রাকা, সেদিন সে বেশ উচ্ছল হয়েছিল। ভালো লাগছিল গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি-ভ্রমণ, রাস্তার দু পাশের গাছগুলি যে স্নান করে সেজেগুজে আছে। পাঁচ-ছ' বছর ধরে ইন্দ্রজিৎ তার কাছে আসবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, চেষ্টা ছাড়েনি, আজ রাকা যেন দয়া করে তাকে কিছু দেবে।

ছুটন্ত গাড়িতেই রাকা বললো, ইন্দ্রজিৎদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

ইন্দ্রজিৎ তার গাঢ় ভুরু সামান্য তুলে রাকার দিকে তাকালো।

রাকা বললো, সেই যে একটা দুপুরে, তুমি আমাদের বর্ধমানের বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ আমাকে চুমু খেতে চাইলে, পাগলের মতন করছিলে, তুমি কেন একবারও জানতে চাওনি যে, আমিও চাই কি না, আমি তোমাকে পছন্দ করি কি না !

ইন্দ্রজিৎ জোরে হেসে উঠলো। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, আমি এই রকম প্রশ্ন পছন্দ করি। সোজাসুজি। উত্তরটা হচ্ছে, প্রথম কথা, আমাকে পছন্দ না করার কোনো কারণ নেই। আই অ্যাম কোয়াইট আ লাইকেবল পার্সন। আমি বাজে কথা বলি না, চেহারাটাও খুব একটা খারাপ নয়, বলো ? আর দ্বিতীয় কথা, তুমি আমাকে পছন্দ করো কি না, সেটা মুখে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন ? সেটা যদি আমি বুঝতে না পারি, তা হলে তো আমার কোনো যোগ্যতাই নেই ! শোনো আমি বলি, তোমাকে যেদিন আমি ঠিক প্রথম দেখি, সুকান্তর ঘরে, তুমি কী একটা বই নিতে এসেছিলে, দু' চারটে কথা হলো, আমি লক্ষ করেছিলাম তোমার মুখের রং বদলে গেছে, তুমি একটু একটু কাঁপছো। তুমি আমার দিকে যে-ভাবে তাকাচ্ছিলে, সেদিন যদি আমি তোমাকে শিডিউস করতাম, তোমাকে ঠিক মতন ডাকতাম, তা হলে শুধু চুমু কেন, আরও অনেককিছু হতে পারত। তখন তুমি বেশ বাচ্চা ছিলে, ঐ বয়েসে রেজিস্ট করার ক্ষমতাই থাকে না, কিন্তু তখন তো তোমার সম্পর্কে আমার তেমন ইচ্ছেটা জাগেনি, তাছাড়া অত বাচ্চা মেয়েদের ভুলিয়েভালিয়ে চুমু খাওয়া আমার স্বভাবও নয়। তারপর, বছর দুই-আড়াই বাদে আবার যখন তোমার কাছে গেলাম, ওঃ রাইট, আমি দুটি মেয়ের নাম, আমার বান্ধবীদের কথা বলেছিলাম, তাতেই তুমি শক্‌ড হয়েছিলে, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু আমি যে মিথ্যে কথা বলি না, মিথ্যে বলে নিজের জন্য কিছু চাই না। অফ কোর্স বড় বড় দু চারটে মিথ্যে কথা মানুষকে বলতেই হয় বেঁচে থাকতে গেলে, ইয়ার্কি-ঠাট্টার সময়, মিথ্যে কথা এক রকমের কল্পনাও তো বটে, কিন্তু ছোটখাটো মিথ্যে বলে নিজের জন্য কিছু আদায় করা, নাঃ সম্ভব নয় আমার

পক্ষে, এইটুকুই বোধহয় রয়ে গেছে পারিবারিক অহঙ্কার।

হঠাৎ প্রবল তোড়ে বৃষ্টি এলো, সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, দু পাশ খোলা জিপে সরু সরু শলাকার মতন বৃষ্টি এসে লাগছে গায়ে। রাস্তার ধারে এসে জিপটা দাঁড় করালো ইন্দ্রজিৎ, এক পাশের তেরপলের পর্দা ফেললো কোনোক্রমে, দুদিকে ফাঁকা মাঠ, রাস্তা জনমানব শূন্য।

অবলীলাক্রমে রাকার বুকে একটা হাত রেখে ইন্দ্রজিৎ বললো, সত্যি, তুমি ভারী সুন্দর, রাকা। আমার মনে তোমার জন্য একটা বিশেষ জায়গা আছে, সেটাকে ভালোবাসা বলা যায় কি না আমি জানি না, তবে ঐ যে বহুদিন ধরে ভালোবাসা, একজনকেই ভালোবাসা, সে ক্ষমতাই আমার নেই, আমি তোমাকে বিয়ে করার কথাও ভাবিনি, আমি ঠিক বিয়ে-করা টাইপ না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে বন্ধু হিসেবে নাও, তাও বেশ দেরি হয়ে গেছে, সামনের সপ্তাহেই আমাকে লন্ডনে যেতে হচ্ছে একটা ট্রেনিং-এ, অনেকদিন দেখা হবে না। কিন্তু আমি ফিরে আসবো, বন্ধু হিসেবে যদি তোমার কাছে আমাকে আসতে দাও, তোমার ওপর আমার কোনো দাবি নেই, তবু আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি...

আশ্চর্য ব্যাপার, যে-মানুষটি স্পষ্টাক্ষরে বললো যে সে রাকাকে একমাত্র নারী হিসেবে ভালোবাসতে পারবে না, রাকার ওপর তার কোনো দাবি নেই, যখন খুশি সে দূরে চলে যাবে, সেই লোকটির প্রতিই রাকার অদ্ভুত টান জন্মে গেল। বারবার তার মনে হতে লাগলো, যদি অন্য রকম হত, যদি ইন্দ্রজিৎ রাজি হত তার জীবনের একমাত্র পুরুষ হতে, তা হলে রাকা আর অন্য কিছু চাইতো না।

ইন্দ্রজিৎ দূরে চলে গেল, কিন্তু সেদিনের পর থেকে রাকার আর অতীশ, সোমেনদের সঙ্গ তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না। অতীশ বেশি লোভী হতে চাইলে রাকা তাকে কঠিন কথা বলে ফিরিয়ে দিলো। জীবনটাকে সে অত লঘু করে ফেলতে পারবে না।

এম. এ. পাশ করার পর ডি. ফিল. করার দিকে না গিয়ে রাকা টপ করে একটা চাকরি নিয়ে নিল বহরমপুর কলেজে। সত্যেন সরকারদের বাড়ির অত সুখ তার সহ্য হচ্ছিল না, সেখানে সে স্বাধীন ছিল না, রাধিকার ব্যবহারটাও বদলে যাচ্ছিল শেষের দিকে। বহরমপুরে সে নিজের জন্য একটা বছর সময় নিলো, এখানে সে সামান্য লেকচারারের কাজ নিয়ে জীবন কাটাবে না ঠিকই, এর মধ্যে একটা কিছু চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু বহরমপুরে দু মাসও কাটলো না, তার মধ্যেই তার পরিচয় হলো

সুপ্রকাশের সঙ্গে।

রাজেশের বিয়েতে রাকাকে আসতেই হলো কলকাতায়। সরকার-দম্পতির অনুরোধ তো ছিলই, রাজেশ নিজেও তাকে নেমন্তন্ন করেছিল, তা ছাড়া এমনই যোগাযোগ যে রাজেশের সঙ্গে বিয়ে হলো রাকার বর্ধমানের স্কুলের সহপাঠী বীথির সঙ্গে। বীথিদেরও বেশ সম্ভ্রান্ত বংশ, তাই মিল হলো ভালো।

হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটা শ্রাদ্ধও যুক্ত থাকে, টাকার শ্রাদ্ধ। দুই বাড়িতেই দেখানেপনার ব্যাপার আছে, তাই রাশি রাশি লোককে প্রচুর খাইয়ে দাইয়ে, জিনিসপত্র নষ্ট করেও তৃপ্তি হলো না, মিলিতভাবে একটা রিসেপশান হলো ক্যালকাটা ক্লাবে।

এই ধরনের ক্লাবের পার্টিতে রাকা কখনো আসেনি আগে। মস্ত বড় একটা হল, বসবার জায়গা খুব কম, হাতে একটা পানীয়ের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা বলাই রীতি। প্রায় সাড়ে চারশো জন নারী-পুরুষ, তাদের মধ্যে পাঁচ-সাত জনের বেশি চেনে না রাকা। যে-যার শ্রেষ্ঠ পোশাক পরে এসেছে, অনেক মহিলার সর্ব অঙ্গে সোনা ও হীরের দ্যুতি। রাকা এখনো গয়না না পরার প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যদিও এখন তার বেশ কিছু গয়না আছে। বাবার মৃত্যুর পর তৃণীর তার মায়ের গয়না চার ভাগ করে তিন বোনকে তিন ভাগে দিয়ে দিয়েছে, মাসতুতো বোন বলে সুরেখাকে কম দেয়নি। তৃণীরও বিয়ে করেছে সম্প্রতি।

রাকা একটা ভালো ঢাকাই শাড়ি পরে এসেছে বটে, হাতে-কানে-গলায় এক টুকরো অলঙ্কার নেই। মায়ের একজোড়া চুনী-বসানো দুল পরার ইচ্ছে হয়েছিল খুবই, শেষ পর্যন্ত দমন করেছে সেই ইচ্ছে, এই সব বনেদী বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা তার পক্ষে হাস্যকর হতো। তবে একথাও ঠিক, সব মহিলারা, কিছু কিছু পুরুষও তার দিকে যখন কৌতূহল নিয়ে তাকাচ্ছে, যেন সে একজন বহিরাগত, তখন রাকা একটু একটু হীনমন্যতায় ভুগছে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু শুধু দৃষ্টির তো উত্তর হয় না। শিখা এখানে থাকলে হয়তো অহঙ্কারে মাথা উঁচু করে রাখতে পারতো, রাকা তা পারছে না। সে মিশতে পারছে না অন্যদের সঙ্গে, মাঝে মাঝেই একা হয়ে যাচ্ছে।

একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবা, অন্যরা তার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু সে নিজের স্থান বদল করছে না, নিজে থেকে কারুর কাছে যাচ্ছে না, সাদা প্যাণ্ট ও সাদা শার্ট পরা,

হাতে হুইস্কির গেলাস, মাঝে মাঝেই গেলাস খালি ও ভর্তি হচ্ছে।

মাঝখানটা এক সময় ফাঁকা হওয়ায় রাকার সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। চোখ দিয়ে সে রাকাকে কাছে ডাকলো।

রাকা এগিয়ে যেতেই যুবকটি বললো, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, আপনি একটা জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

অনুভূতিটা প্রায় সেই রকমই, তাই রাকাও সামান্য হেসে বললো, আমি প্রায় কারুকেই চিনি না।

যুবকটি বললো, আমাকেও আগে কখনো দেখেননি নিশ্চয়ই ? অধমের নাম সুপ্রকাশ মিত্তির। আমি একজন মাছ্‌ওয়ালা।

রাকার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে সে আবার বললো, হ্যাঁ। সত্যিই মাছ্‌ওয়ালা। আমি যদি জিজ্ঞেস করি, আপনি আমাকে চেনেন ? তার উত্তরে আপনি অনায়াসে বলতে পারেন, Excellent well; you are a fishmonger.

এবারে অবিশ্বাসের চেয়েও অনেকখানি বিস্ময় ছেয়ে গেল রাকার চোখে। মাছ্‌ওয়ালাদের ভালো পোশাক, ভালো চেহারা অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু কোনো মাছ্‌ওয়ালা কি শেক্সপীয়ার কোট করে ? আবার যারা শেক্সপীয়ার জানে, তারা তো মাছ্ বিক্রি করে না ?

সুপ্রকাশ কেমন যেন একটা রহস্য সৃষ্টি করার মতন ভাব নিয়ে চেয়ে আছে রাকার দিকে।

রাকা এবার আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো : Then I would, you were so honest a man.

সুপ্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে বললো : Honest, my lord ?

রাকা বললো, Ay Sir: to be honest as this world goes, is to be one man picked out of ten thousand.

সুপ্রকাশ বললো : That's very true, my lord.

রাকা বললো : For if the sun breed ...

সুপ্রকাশ এবার হাত তুলে বাধা দিয়ে বললো, আর পারবো না, মনে নেই। এক সময় পুরো হ্যামলেট মুখস্ত ছিল ! তা হলে আপনিই সেই ইংরিজির ছাত্রী, সত্যেন সরকারের বাড়ির পেয়িং গেস্ট ?

রাকা বললো, গেস্ট ছিলাম দু' বছর। কিন্তু কিছু পে করিনি।

সুপ্রকাশ বললো, ওঁদের তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, আপনার কাছ্ থেকে আবার নেবে কি ? টাকার পুঁটুলি নিয়ে স্বর্গে যাবে ? আমি ঐ সরকারদের ভাগ্নে,

বিতাড়িত বলতে পারেন, আমি তো মাছ'য়ালা, আমার গায়ে মাছের গন্ধ, তাই আমার পরিচয় দিতেও ওরা লজ্জা পায়। নেহাত রাজেশ বিশেষ করে আসতে বলেছে।

রাকা এবার সরলভাবে জিজ্ঞেস করলো, মাছওয়ালা মানে কী ?

সুপ্রকাশ বললো, মাছ বিক্রি করি। রাজেশের বিয়ের দিনই তো দু কুইন্টাল রুই আর এক কুইন্টাল চিংড়ি সাপ্লাই করেছি। বীজ থেকে মহীরুহ জানেন তো, আমি এইটুকু এইটুকু, আলপিনের ডগার চেয়েও ছোট ডিম থেকে আট-দশ কিলো ওজনের মাছ তৈরি করি।

এক একজন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতেই ভালো লাগে, সুপ্রকাশের সেরকম, তা ছাড়া তার-সব কথার মধ্যেই একটু একটু মজার ভাব থাকে।

ওরা আর কোনো সঙ্গী খুঁজলো না, দু'জনেই গল্প করলো সারাক্ষণ।

চারদিন পরে রাকা রায়দিঘি অঞ্চলে সুপ্রকাশের মাছের ভেড়ি দেখতে গেল।

এসব দিকে রাকা আগে কখনো আসেনি, রায়দিঘি নামটা সে খবরের কাগজে পড়েছে দু' একবার, সুপ্রকাশ নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, রাকা সেখানে বাস থেকে নামবার পর দেখলো সুপ্রকাশ আগেই দাঁড়িয়ে আছে। আজ সে খাঁকি প্যান্ট ও নীল রঙের একটা হাফশার্ট পরে আছে, মাথায় একটা টোকা।

সে বললো, অনেকেই আসবে বলে আসে না, আপনি সত্যিই এলেন ? সঙ্গে আর কেউ নেই, একা ?

রাকা বললো, আর কে আসবে তা তো জানি না!

সুপ্রকাশ বললো, আপনি দেখছি ঠিক বাঙালী মেয়েদের মতন নন! আপনি কি বম্বেটম্বের দিকে মানুষ হয়েছেন ?

রাকা বললো, আমি বর্ধমানের মেয়ে।

সুপ্রকাশ বললো, হুঁ, ইন্টারেস্টিং! আমার সঙ্গে মাত্র একদিন আলাপ, তবু একা একা এতদূর চলে এলেন ?

ভাঙা জেটির পাশ দিয়ে, কাদার জন্য জুতো হাতে নিয়ে ওরা উঠলো একটা বেশ বড় নৌকোয়। তাতে মাঝি মাত্র একজন। মোটর লাগানো আছে, শুধু হাল ধরে থাকলেই বেশ জোরে চলে।

সুপ্রকাশ বললো, ভেতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা আছে, গাড়িতেও যাওয়া যায়, কিন্তু আমার ভ্যানটা আজ শহরে গেছে মাল নিয়ে ... আপনি সাঁতার

জানেন তো ?

রাকা ঘাড় নাড়লো।

সুপ্রকাশ বললো, সুন্দরবনের খাঁড়িতে সাঁতার জানলেও খুব সুবিধে হয় না। বড্ড কামটের উৎপাত—

রাকা জিজ্ঞেস করলো, এটা সুন্দরবন ?

সুপ্রকাশ বললো, আরে, এ মেয়েটি যে দেখছি কিছুই জানে না।

রাকা অবশ্য জঙ্গল দেখতে পেলো না। অনেকখানি এলাকা জুড়ে মাছের ভেড়ি। শুধু জল আর জল, এরই মধ্যে একটা বেশ ছিমছাম দোতলা বাংলো, তার বাথরুমে কমোড আছে পর্যন্ত, সামনেই আলাদা করে সাজানো একটা প্রকাণ্ড দিঘি, তার ধার দিয়ে রকমারি ফুলের গাছ, একটু দূর থেকে এই দিঘি ও বাংলোটিকে বিদেশের কোনো দৃশ্য মনে হয়, এমনই পরিচ্ছন্ন।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, সুপ্রকাশ রাকাকে নিয়ে খেতে বসে গেল বাংলোর বারান্দায়। পার্শে মাছের ঝোল ও মোটা চালের ভাত। রাকা আসবে বলে সুপ্রকাশ আলাদাভাবে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করেনি, তার কথাবার্তার মধ্যে কোনো খাতির করার ভাবও নেই।

খেতে খেতে রাকা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানেই থাকেন ? আপনার বাড়ির আর কোনো লোকজন আসেনি ?

সুপ্রকাশ বললো, আর কেউ এখানে আসতে চাইবে কেন ? আমি এখানে আছি, প্রায় সাড়ে চার বছর হয়ে গেল।

—আপনি উত্তর কলকাতার মানুষ, হঠাৎ এখানে এসে থাকার ইচ্ছে হলো কেন ?

—ইচ্ছে টিচ্ছে, কিংবা শখের ব্যাপার নয়। এটা আমার জীবিকা। জীবিকার জন্য মানুষ কত জায়গায় যায়। আপনি তো নিশ্চয়ই শুধু বইয়ের পোকা। বাইরের কোনো খবরই রাখেন না। আমার পাশের ভেড়িটার মালিক কে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একজন গুজরাতি ভদ্রলোক, তিনি মাছ খাওয়া তো দূরের কথা, হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেন না, তাঁর পদবী আবার গান্ধী ! তা হলে ভাবুন। সুদূর সুরাট থেকে এক নিরামিষাসী গুজরাতি ভদ্রলোক যদি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসে মাছের ব্যবসা করতে পারেন, তা হলে আমার মতন একজন বাঙালীর ছেলে কেন পারবে না ?

—সত্যি আমি অনেক কিছুই জানি না। আপনার কথা শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, আপনি ইংরিজিটা—

—কিছু পড়াশুনো করেছি, এই তো ? সাহিত্য পড়লেই যে স্কুল-কলেজে মাস্টারি নিতে হবে, ওঃ হো, আপনি তো কলেজে পড়াচ্ছেন, আপনি ভালোই করছেন, মেয়েরা ঐ চাকরি পছন্দ করে ... আমার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের নর্থ ক্যালকাটার ঐ পুরোনো পরিবারগুলোর কেউ চাকরি বাকরি করে না, লেখা পড়া শিখলেও বাড়িতে বসে বসে খায়, বাড়ি ভাড়া পায়, সম্পত্তি বিক্রি করে, এই সবেই তাদের চলে যায়, ঠাট-বাঁট বজায় রাখার জন্য ফাটকাও খেলে। আমি ঠিক করেছিলুম, ওভাবে বাড়িতে বসেও থাকবো না, চাকরিও করবো না। একটা কিছু প্রোডাকশানে নামবো। কল-কারখানা খোলার মতন পয়সা নেই, তাই মাছ-চাষ করছি। ধান-চাষের মতন এটাও একটা চাষ, ফসল ফলে, উৎপাদন হয়, দেশের একটা কিছু তো উৎপাদন বাড়ছে, গোটা দেশের চাহিদার তুলনায় এখনো উৎপাদন অনেক কম।

—এ কাজ শিখতে হয় না ?

—শিখতে তো হয় বটেই। হাতে-কলমে শিখতে হয়। জল-কাদায় নেমে শিখতে হয়, সাপ-ব্যাঙ, পোকা-মাকড়, সর্দি-কাশি-পেটের অসুখ এসব সহ্য করে শিখতে হয়। এর মধ্যে আমি জাপানে গিয়ে কিছুটা ট্রেইনিং নিয়ে এসেছি। আসল ব্যাপারটা কী হলো জানেন, আমার যে সম্পত্তির ভাগ পেয়েছিলুম, তা খুব বেশি নয়, সে টাকাও ওড়াচ্ছিলুম এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে, হঠাৎ কী খেয়াল হলো, কাগজে একদিন দেখলুম এদিকে একটা ভেড়ি বিক্রি হচ্ছে, কিনে ফেললুম ঝট করে। ব্যাঙ্ক লোনও পাওয়া গেল। অনেকটা এখন শোধ হয়ে গেছে। আরও হাজার পঞ্চাশেক টাকা দরকার, কিছু কিছু মডার্নাইজ করার প্ল্যান আছে। মোটামুটি বেশ ভালোই চলে যাচ্ছে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু মাছ নয়, টাকাও নয়, এখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিশে আমি বেশ মশগুল হয়ে আছি। মাইলের দূরত্ব এমন কিছু না, তবু ভাবুন তো, উত্তর কলকাতার মিত্তির বা সরকারদের বাড়ি কিংবা ক্যালকাটা ক্লাব থেকে এই জলা জায়গা কত, কত দূরে ! যেন অন্য একটা গ্রহ ! এটা যেন আমার আর একটা জন্মের জীবন !

সেই দিনটা কাটলো বেশ ভালোই, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। এরপর রাকা দু'খানা চিঠি লিখলো সুপ্রকাশকে, কোনো উত্তর নেই।

বহরমপুর কলেজে ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একদিন জানলা দিয়ে একটা শিরিষ গাছের দিকে তাকিয়ে রাকা উন্মনা হয়ে গেল। বাতাসে ওপরের ডালপালা লাফালাফি করছে, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে রাকাকে। এই সময় তার এখানে এই ক্লাস রুমে বসে থাকার কথা নয়, পড়াতে তার ভালো লাগছে

না।

প্রত্যেকদিন তার ডাক বাক্সে চিঠি থাকে, সহপাঠীরা লেখে, অত্যুৎসাহী অতীশ এরই মধ্যে একদিন এখানে দেখা করতেও এসেছিল, কিন্তু সুপ্রকাশ চিঠি লেখে না। অথচ ওর চিঠির জন্যই রাকা কলেজ থেকে ফিরেই ডাক বাক্স খোলে।

সেই ধূ ধূ করা মাছের ভেড়ির কথা ভাবলে রাকা বুঝতে পারে, সেখানে নিশ্চয়ই কাছাকাছি পোস্ট অফিস নেই। সুপ্রকাশ তার চিঠি পেয়েছে তো? পেলেও তার উত্তর দেবার সময় কোথায়, তার ব্যস্ততা দেখে এসেছে রাকা। তাছাড়া সুপ্রকাশ রাকা সম্পর্কে তেমন কোনো উৎসাহ দেখায়নি, একবারও রাকার চেহারার প্রশংসা করেনি, কোনো ছুতোয় একবারও রাকার শরীর ছোঁয়নি।

এবারে আর কোনো খবর দেওয়া হলো না। বহরমপুর থেকে কয়েকদিনের জন্য চন্দননগরে মামাবাড়িতে থাকতে এলো রাকা, তারপর সেখান থেকে পুরোনো একজন কাজের লোককে সঙ্গে নিয়ে সে এলো রায়দিঘি, তারপর ভটভটিয়া নৌকো ভাড়া করে পৌঁছে গেল মিত্রবাবুর জলকরে।

সুপ্রকাশ তখন হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে আঁতুর পুকুরের ধারে ধারে কাঁচা গোবর ছড়াচ্ছিল, সারা গায়ে তার কাদা, মুখেও কাদার ছিটে লেগেছে, সেই অবস্থায় উঠে এসে রাকাকে দেখে সে শুধু অবাকই হলো না, খানিকটা অপ্রসন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার? আবার হঠাৎ এলেন যে?

রাকা জানতো, সুপ্রকাশ এইভাবেই কথা বলবে। মনে মনে সে যে-মানুষটির ছবি তৈরি করেছে, তার সঙ্গে এ রকম ব্যবহারই মেলে।

রাকা বললো, কেন, আমি এসে কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করলাম নাকি?

সুপ্রকাশ বললো, তা খানিকটা অসুবিধের ব্যাপার তো বটেই। আমার সঙ্গে এখানে যারা কাজ করে, তারা ভাববে, এ ভদ্রমহিলা এখানে ঘন ঘন আসছেন কেন?

রাকা সঙ্গের কাজের লোকটিকে বিশ্রাম নেবার জন্য বসিয়ে রেখে একটু দূরে সরে গিয়ে বললো, আমি একটা আর্জি জানাবার জন্য আপনার এখানে এসেছি। কলেজে পড়াতে আমার ভালো লাগছে না, আমি আপনার এখানে এসে থাকতে পারি?

সুপ্রকাশ বললো, কলকাতার অনেকে দল বেঁধে এখানে পিকনিক করতে আসতে চায়, আমি কখনো অ্যালাউ করিনি। কেউ কেউ এখানে দু'এক দিন

ছুটি কাটাবার জন্য আসতে চেয়েছে, আমি রাজি হইনি। এটা আমার বাগান বাড়ি নয়, কাজের জায়গা।

—আমি এখানে এসে কাজ করতেই চাই।

—আপনি কী কাজ করবেন ?

—আপনি যা করছেন। মডার্নাইজ করে আরও প্রোডাকশান বাড়াবেন বলছিলেন। আপনার লোক লাগবে না ? মেয়েরা এ কাজ পারে না ?

—পারবে না কেন ? মেয়েরা সব কাজই পারে। কিন্তু আপনি পারবেন না। বোঝাই যাচ্ছে, এ আপনার দু' দিনের শখ। নতুন কিছু করার ঝোঁক চেপেছে। দু' দিনেই কেটে যাবে।

—আপনি আমার চিঠি পাননি ?

—হ্যাঁ পেয়েছি। উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, তাই না ? কিন্তু আমার কাছে ভালো খাম নেই। পোস্ট অফিসের খামে সব চিঠির উত্তর দেওয়া যায় না।

—দু' দিনে আমার এই ঝোঁক কেটে যাবে না, আমি কথা দিতে পারি।

—রোমান্টিক স্বপ্ন ! সভ্যতা থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাওয়া ! কিন্তু সভ্যতা যে একটু পরেই মাথার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাবে !

—আপনি আমার কথায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না ?

দু' হাতের গোবর শুকিয়ে গেছে। হাত ঘষে ঘষে সেগুলো তুলতে তুলতে সুপ্রকাশ বললো :

Have you no thought, O dreamer
that it may be all maya, illusion ?

রাকা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, এটা কার লেখা ?

সুপ্রকাশ বললো, প্রথম লাইনগুলো বলছি, তা হলে চিনতে পারবেন :

Are you the new person drawn toward me?
To begin with take warning,
I am surely far different from
What you suppose;
Do you suppose you will find in me
your ideal?

রাকা বললো, না, চিনতে পারছি না।

সুপ্রকাশ বললো, ওয়াল্ট হুইটম্যান। লীভ্‌স অফ গ্রাস।

রাকা বললো, হুইটম্যান আমি ভালো করে পড়িনি। বইটা আছে আপনার

কাছে ?

এতক্ষণ বাদে হেসে সুপ্রকাশ বললো, কী মুশকিল। হুইটম্যানের বই কলকাতার অনেক দোকানেই পাওয়া যাবে! সেটা পড়বার জন্য এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় ...

—বইটা আপনার কাছে আছে কি না জিজ্ঞেস করছি।

—না। এখানে বইপত্র কিছু আনিনি। পড়ার সময় পাই না। ভুলেও যাচ্ছি অনেক কিছু।

একটু দূরে সরে গিয়ে রাকা জলাভূমির দিকে তাকিয়ে রইলো। ফিনফিনে বাতাসে মৃদু তরঙ্গের খেলা চলছে সেখানে। ঠিক পাঁচটা বক এমন নিথরভাবে বসে আছে যেন এক সারি চীনে মাটির পুতুল। কেন যে রাকার এমন ঝোঁক চেপেছে, তা সে নিজেই যেন বুঝতে পারছে না। সুপ্রকাশ তাকে একেবারে গ্রাহ্যই করছে না, তাতে তার অহমিকায় কিছুটা আঘাত লাগছে অবশ্যই। অথচ সেদিন ক্যালকাটা ক্লাবের পার্টির অত ভিড়ের মধ্যে সুপ্রকাশের সঙ্গে কত সহজে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

মুখ ফিরিয়ে রাকা উদাসীন গলায় বললো, আপনি তা হলে আমাকে বিদায় করে দিতে চান ?

সুপ্রকাশ বললো, হুইটম্যানের ঐ কবিতার কথাগুলোই গদ্য করে বলি ? সামান্য দু'একদিনের আলাপে আপনি হয়তো আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা করেছেন। এই পরিবেশটা দেখে, আমার দু' চারটে কথা শুনে আপনি যে মন গড়া মূর্তিটা তৈরি করেছেন, আমি সে নই! নর্থ ক্যালকাটার পুরনো, ভ্যাপসা গন্ধওয়ালা বাড়িতে না থেকে আমি জীবিকার জন্য এখানে পড়ে রয়েছি, এর মধ্যে রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার কিছু নেই।

রাকা এবার বেশ রাগের সঙ্গে বলে উঠলো, আমি এখানে এসে থাকতে চাই, কিছু কাজ করতে চাই, তার মধ্যে রোমান্টিক ব্যাপারের প্রশ্ন আসছে কেন ? আপনি আমাকে রাখতে চান না, আমি মেয়ে বলে! মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই অপরাধ ?

সুপ্রকাশ বললো, আমাদের দেশে মেয়ে হয়ে জন্মাবার অনেক রকম অসুবিধে তো আছেই। তবে, আমি যদি মেয়ে হতুম, আপনার মতনই হতে চাইতুম।

রাকা এবার ঘুরে দাঁড়ালো।

কাছে এসে সুপ্রকাশ বললো, আপনি আমার অসুবিধে বুঝতে পারছেন না। এখানে অনেক স্থানীয় লোকদের নিয়ে আমার কাজ করতে হয়। গ্রামের মানুষ

শহরের মানুষদের এমনিতেই সন্দেহের চোখে দেখে। অনেক কষ্ট করে বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছে, তাও পুরোটা পেরেছি কি না জানি না। বিলেতে থাকার সময় আমার বেশ মদ্যপানের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এখানে আমি নিজেকে সামলেছি। আমার লোকজনরা দিশি মদ খায়, ওদের সঙ্গে বসে কখনো দু' একটা চুমুক দিই, বেশি খাই না। যদি খেতাম, তা হলে ওরাই বলতো, লোকটা মাতাল ! আমাকে গ্রাহ্য করতো না। অনেক মেয়েও তো কাজ করে, তাদের সঙ্গে খুব সাবধানে কথা বলি। একটু এদিক-ওদিক হলেই সবাই রটিয়ে দেবে, লোকটা দুশ্চরিত্র, তখন আর মানবে না আমাকে।

হঠাৎ রাকার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সুপ্রকাশ বললো, একমাত্র একটাই উপায় আছে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে এক মাসের নোটিস দেওয়া। তার আগে আমার সব কথা আপনাকে শুনতে হবে। তার পরেও যদি মনে করেন...

বহরমপুরের পাট চুকিয়ে দিয়ে রাকা চলে এলো বর্ধমানে।

তূণীরের খেলার নেশা চুকে গেছে অনেকদিন, এখন সে বর্ধমান শহরেই ইনকাম ট্যাক্স কনসালটেন্সি ফার্ম খুলেছে। চলছে ভালোই। তার স্ত্রী সোমা বেশ বুদ্ধিমতী, এর মধ্যেই দুটি সন্তান হয়েছে। সেই দুটি বাচ্চাকে সামলাতেই সে সদা ব্যস্ত।

বাবা নেই, রাকা আগে অনুমতি চাইবার মতন করে খবরটা জানালো বুড়িমাকে। বুড়িমা বললেন, ওমা, তুই এত লেখাপড়া শিখে শেষ পর্যন্ত মাছের ভেড়িতে গিয়ে থাকবি ? মন টিকবে সেখানে ? ছেলেটি কেমন, তাকে আগে আমরা একবার দেখবো না ?

তূণীরেরও সেই রকমই প্রতিক্রিয়া। তবে সে বললো, তুই যদি ভালো মনে করিস, তাতে আমাদের আপত্তি করার কিছু নেই, ভালো করে ভেবে দেখেছিস তো ?

অভিভাবকের ভঙ্গিতে তারপর সে বললো, তবে বউভাত এই বর্ধমানের বাড়িতেই হবে। আমি সব ব্যবস্থা করবো !

রাকা অবশ্য আগেই ঠিক করে রেখেছে, বউভাত হবে না, কোনো নেমন্তন্ন হবে না। শুধু রেজিস্ট্রি হবে।

আর বিশেষ কারুকে বলেনি রাকা, তবু খবরটা রটে যায়। অতীশ অভিমান করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলো। সত্যেন সরকার আর একটি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন, সে ছেলেটি ওয়ার্লড ব্যাঙ্কে চাকরি করে, প্রভূত উপার্জন, চেহারাও

সুন্দর, রাকার সঙ্গে তাকে মানাবে খুব।

হঠাৎ এসে হাজির হলেন চন্দ্রমৌলি। এ বিয়েতে তাঁর প্রবল আপত্তি। তিনি খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন, সুপ্রকাশ মিত্র মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, তার আগে একটি আইরিশ স্ত্রী ছিল, বিলেতেই ডিভোর্স হয়ে গেছে, অত্যধিক মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে গ্লাসগো শহরে সুপ্রকাশের একবার জেল-জরিমানা হয়েছিল। সুপ্রকাশ এর আগেও একবার সাবানের ব্যবসা করতে গিয়ে অনেক টাকা লোকসান দিয়েছে, এই ব্যবসাতেও তার কতদিন মন টিকবে তার ঠিক নেই, বাজারে তার অনেক ধার। সে নিশ্চয়ই কথার চাকচিক্যে রাকাকে ভুলিয়েছে।

সুপ্রকাশের এই সব পূর্ব ইতিহাস সবই জানে রাকা। সুপ্রকাশ তার কাছে কিছুই গোপন করেনি।

চন্দ্রমৌলি বললেন, মাছের ভেড়ি? আঁশটে গন্ধ! সেখানে দিনের পর দিন কাটাবি, তুই কি পাগল হয়েছিস খুকি? এম এ-তে অত ভালো রেজাল্ট, তোর অক্সফোর্ড যাওয়া উচিত। সোমনাথ থাকলে সেই কথাই বলতো, সোমনাথ নেই তো কী হয়েছে, আমি তোকে অক্সফোর্ড পাঠাবো!

রাকা বললো, আমার আপাতত বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছে নেই, মৌলিকাকা!

চন্দ্রমৌলি বললেন, এত কষ্ট করে লেখা পড়া শিখলি, তা এমনি এমনি নষ্ট হয়ে যাবে?

রাকা বললো, কেন নষ্ট হবে! তুমিই তো সুকান্তদাকে বলেছিলে, সব বিদ্যেই সব জায়গায় কাজে লাগানো যায়।

চন্দ্রমৌলি বললেন, সেটা এঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি বিদ্যে, বলেছিলাম, এঞ্জিনিয়ারিং-এর যে-কোনো ব্রাঞ্চ শিখলে যে-কোনো জায়গায় কাজে লাগানো যেতে পারে!

রাকা ধীর স্বরে বললো, সাহিত্য থেকে বুঝি জীবনের শিক্ষা নেওয়া যায় না?

আহত অভিমানের সঙ্গে একটুখানি নিষ্পলক চেয়ে রইলেন চন্দ্রমৌলি। রাকার শান্ত ভঙ্গিমার মধ্যেও একটা কঠিন জোর আছে, ওকে বিচলিত করা যাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্বলভাবে উঠে দাঁড়ালেন বিশাল চেহারার মানুষটি।

দেওয়ালে সোমনাথ সেবন্তীর একসঙ্গে অল্পবয়েসী একটি ছবি বাঁধানো। সেবন্তীর আনত মুখে লজ্জারুণ হাসি, সোমনাথ সোজা চেয়ে আছে। সামনের

দিকে। রাকার জন্মের আগে তোলা ফোটোগ্রাফ, তার সামনে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমৌলি আস্তে আস্তে বললেন, এখনো সময় আছে, ভালো করে ভেবে দেখিস, ভেবে দেখিস।

॥ ৮ ॥

ভেড়ির জলাভূমি ছাড়াও সুপ্রকাশের তিনটি পুকুর আছে। ছোট, মাঝারি ও বড়। এর মধ্যে বড়টা বেশ বড়, প্রায় তিন বিঘে জুড়ে, আর ছোটটি এতই ছোট যে বাচ্চাদের সুইমিং পুল বলা যেতে পারে। তিনটির আলাদা আলাদা নামও আছে। আঁতুর পুকুর, লালন পুকুর, ও পালন পুকুর।

মাছ চাষের যে এত ব্যাপার আছে তা কে জানতো! রাকার ধারণা ছিল, পুকুরে-নদীতে, খালে-বিলে মাছ পাওয়া যায়। ছোট মাছ আপনা আপনি বড় হয়, জেলেরা সেগুলো ধরে বাজারে বিক্রি করে। তা তো নয়, এর মাঝখানে অনেক কাণ্ড!

একদিন বৃষ্টির দুপুরে ওরা দু'জনে খেতে বসেছে, এই সময় ইউসুফ হন্তদন্ত হয়ে এসে কী একটা খবর দিল। খাওয়া পুরো শেষ না করেই হাত ধুয়ে সুপ্রকাশ বললো, চলো। বাঁশি আর দুর্গাপদকেও ডাকো।

রাকাও গেল ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

বাংলোর পেছন দিকের একটা ঘরে নানারকম যন্ত্রপাতি, দাঁড়ি-পাল্লা, ছুরি-কাঁচি থাকে। সেখান থেকে বার করা হলো চারখানা লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠি। স্বাভাবিকভাবেই রাকার মনে হলো, এরা কোথাও মারামারি করতে যাচ্ছে নাকি?

সবাই ছুটে গেল মাঝারি পুকুরটার দিকে। সেখানে কোনো শত্রুপক্ষ নেই, সাপ-টাপও দেখা যাচ্ছে না, নিস্তরঙ্গ জলে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

দিনের বেলায় সব সময় খাঁকি প্যান্ট পরে থাকে সুপ্রকাশ, কখনো তার সঙ্গে গেঞ্জি। কখনো খালি গা। এক হাতে বাঁশের লাঠি, এক হাত কোমরে দিয়ে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে জলের দিকে তাকিয়ে থেকে সুপ্রকাশ বললো, তুমি ঠিকই বলেছো, ইউসুফ। জলের রং বদলে গেছে, খানিকটা তামাক পাতার রং হয়েছে না?

সুপ্রকাশ একবার রাকার দিকে তাকালো, রাকার চোখে জলের রঙের তো কোনো পরিবর্তনই ধরা পড়েনি।

ইউসুফ বললো, দ্যাখো দাদা, দু' এক জায়গায় বুড়বুড়ি কাটছে।

সুপ্রকাশ বললো, হুঁ। আগে খানিকটা পেটাই করতে হবে। লাঠি হাতে চারজন নেমে পড়লো চার ধার দিয়ে, তারপর শুধু জলের ওপর জোরে জোরে ঘা মারতে লাগলো। কোনো জন্তু-জানোয়ার, এমন কী পোকা মাকড়ও দেখা যাচ্ছে না, শুধু শুধু জলের ওপর লাঠি পিটছে।

খানিকবাদে ওপরে উঠে এসে সুপ্রকাশ বললো, বাঁশি, যা তো, পাঁচশো গ্রাম পটাশ পারমাঙ্গানেট নিয়ে আয়, বালতিতে জলে গুলে আনবি।

ইউসুফ বললো, কয়েক কেজি চুন দিলে হয় না?

সুপ্রকাশ বললো, সেটা এখন নয়। দিন দু' এক পরে দিলেও চলবে।

রাকার চোখে দারুণ কৌতূহল দেখে সুপ্রকাশ বললো, আস্তে আস্তে দেখতে শেখো, জলের রং কখন কীভাবে বদলায়, যদি দেখো, পুকুরের জল হঠাৎ খয়েরি খয়েরি বা তামাক পাতার রঙের মতন, তা হলে বুঝতে হবে জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাচ্ছে। জলে অক্সিজেন মিশে থাকে, তা জানো তো?

রাকা বললো, সেটা কে না জানে।

সুপ্রকাশ বললো, অক্সিজেন কমে গেলে মাছ ছটফট করে, মরে যেতেও পারে। পুকুরের তলায় গাছের পাতা, পচা গেঁড়ি-গুগলি জমে যায়, পরপর কয়েকদিন গুমোটের পর হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে তলার দিকের সেই সব পচা জিনিসের কার্বলিক অ্যাসিড বেড়ে যায়, অক্সিজেন কমতে থাকে। বাঁশ দিয়ে পেটালে বায়ুমণ্ডলের বাতাস জলের সঙ্গে মিশে অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে যায়, তাতে অক্সিজেন সাপ্লিমেন্ট হয়। এরপর পটাশ পারমাঙ্গানেট জলে গুলে ছড়িয়ে দিলে অক্সিজেন আরও বাড়বে।...

রাকা এখন জলের গুণাগুণ মাপতেও শিখে গেছে। কাচের গেলাসে পুকুর থেকে খানিকটা জল ভরে নেয়। সুপ্রকাশ তাকে পি এইচ পেপার নামে এক ধরনের বিশেষ কাগজ দিয়েছে। গোল প্লাস্টিকের খাপে ভরা থাকে সেই কাগজ, টানলে বেরিয়ে আসে, তার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ঐ জলে ডোবালেই কাগজটায় রং ধরে। সেই রং দেখে বুঝতে হয়, জলের অম্লত্ব আর ক্ষারের ভাগ কতটা।

আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বাঁধা, মাথায় এলো খোঁপা, পায়ে রবারের চটি, পুকুরের ধারে বসে জল নিয়ে পরীক্ষা করে রাকা। খানিক দূরে সুপ্রকাশ আর ইউসুফ একটা বড় গামলায় চুন গুলছে। সুপ্রকাশ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী দেখলে রাকা, পি এইচ কত?

রাকা বললো, সিক্স পয়েন্ট ফাইভ !

—স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক ?

—একটু কম আছে। সাতের একটু বেশি হওয়া উচিত !

—চুন দিতে হবে ?

—হ্যাঁ, ভালো করে গুলে চার পাশে ছড়িয়ে দাও !

—কতটা ?

—কতটা ? দাঁড়াও বলছি, তিন বিঘের পুকুর, তিন ছয় আঠারো, অন্তত কুড়ি কেজি দিয়ে দাও !

সুপ্রকাশ মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চুন গোলার সময় সে আর ইউসুফ দু' জনেই হাতে গ্লাভ্‌স পরে নেয়। হাত থেকে গ্লাভস খুলতে খুলতে সুপ্রকাশ সকৌতুকে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী গো, ইউসুফ, আমাদের ছাত্রীটি কেমন ?

ইউসুফ বললো, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট !

সুপ্রকাশ বললো, এম এ পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল। তুমি এখানে ফার্স্ট করে দিলে ? মেয়ে বলে পক্ষপাতিত্ব করছো।

ইউসুফ বললো, না, তুমি জানো না, গতকাল মাছকে খাবার দেবার আগে রাকাদি নিজে থেকেই আমাকে বললো, আগে কাপড়ে খানিকটা চেলে নিলে না ?

সুপ্রকাশ কৃত্রিম বিস্ময়ে বললো, অ্যাঁ ?

রাকা ওদের কাছে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার সুরে বললো, মাছের খাদ্য দেবার সময় দেখতে হবে, যাতে অপচয় না হয়। তোমরা ভাবো, সরষের খোল আর চালের কুঁড়ো এক সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড পাকিয়ে জলে ছুঁড়ে দিলেই হলো। মোটেই সেটা ঠিক নয়।

সুপ্রকাশ বললো, তা হলে কী করতে হবে ?

রাকা বললো, সরষের খোল আর চালের কুঁড়ো সমান সমান পরিমাণে মিশিয়ে একটা পাতলা কাপড়ে ভালো করে চেলে নিতে হবে। ছেঁকে খানিকটা তলায় পড়বে, খানিকটা ওপরে থাকবে। ওপরে যে মোটা অংশটা থাকবে, তাকে খানিকটা জল মিশিয়ে মণ্ড পাকিয়ে নেবে, আর মিহি অংশটা এমনি ছড়িয়ে ছড়িয়ে পুকুরে ফেলবে আগে। মণ্ডগুলো ফেলবে তার পরে।

সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, এতে কী লাভ হবে ভাই ?

রাকা বললো, শুধু মণ্ড করে ফেলে দিলে সেগুলো তাড়াতাড়ি ডুবে যাবে।

তাতে হয় কী, জলের ওপরের স্তরে যে-সব মাছ থাকে, যেমন রুই-কাৎলা, তারা ভালো করে খেতে পাবে না, তলের দিকে যারা থাকে, যেমন মৃগেল, আমেরিকান পোনা, আর মাগুর মাছেরা সব খেয়ে নেবে। কিছু মিহি খাদ্য ওপরে ছড়িয়ে দিলে কিছুক্ষণ জলে ভাসবে, তাতে সবাই খাবার পাবে।

সুপ্রকাশ চোখ বড় বড় করে বললো, ওহে ইউসুফ, এ যে দেখছি গুরু মারা বিদ্যে। তোমার এই দিদিই কয়েকদিন আগেও রুই আর কাৎলার তফাত জানতো না।

ইউসুফ বললো, আমি রাকাদিকে বোঝাচ্ছিলাম যে পুকুরে কোন্ কোন্ মাছ জলের কোন্ কোন্ স্তরে থাকে। তা শুনেই রাকাদি বললো, তা হলে ওদের খাদ্যও আলাদাভাবে দিলে হয় না ? ঠিকই বলেছে কিন্তু।

সুপ্রকাশ বললো, মাছের খাদ্য নিয়ে তো অনেক ভাবনা চিন্তা হলো, এদিকে আমাদের যে খিদে পেয়ে গেছে।

সুপ্রকাশ ঘন ঘন চা খায় বলে একটা বড় ফ্লাস্কে চা তৈরি থাকে। এখানকার বাঁধা-ধরা জলখাবার হচ্ছে মুড়ি আর নারকোল। বেশ কয়েকটা নারকোল গাছ আছেই, মুড়িটা শুধু কিনে আনতে হয়।

ওরা বসেছে কদমগাছের নীচে। পাশাপাশি দুটো বড় কদমগাছ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই চলেছে, পাতা থেকে ঝরছে জলের ফোঁটা। এখানে বসে মুড়ি খাওয়া যাবে না।

একটা ট্রে-র ওপর কয়েকটা ফ্লাস্ক ও কাপ রাখা আছে। খাদ্য চিন্তা আপাতত ভুলে গিয়ে উলটে রাখা কাপগুলোতে চা ঢেলে, নিজেরটাতে চুমুক দিতে দিতে সুপ্রকাশ বললো, এই কদমগাছ দুটোকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেছি। ইউসুফ কিছুতেই গাছদুটো কাটতে দেবে না।

ইউসুফ বললো, তুমিই বলো রাকাদি, এমন সুন্দর, তেজী গাছদুটোকে মেরে ফেলার কোনো মানে হয় ?

রাকা বললো, না, না, তুমি গাছ কাটতে পারবে না। আমি আরও গাছ লাগাবো এই পুকুরের ধারে।

সুপ্রকাশ এক গাল হেসে বললো, বাঙালী মেয়ে, রোমান্টিক না হয়ে কি পারে ? তার ওপর আবার মাথা খেয়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রাকা, তুমি রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ উপন্যাসটা পড়েছো ? সে উপন্যাসের নায়ক ফুলের চাষ করে, কত রকম ফুল, অর্কিড, পরিবেশটা কত সুন্দর। আর তোমার স্বামী করে মাছ চাষ ? ফুলের সঙ্গে কি মাছের তুলনা হয় ? তাই তুমি ফুল গাছ টাছ বসিয়ে

একটু রং ফেরাতে চাইছো। তাই না?

রাকা বললো, মাছ চাষ করলে বুঝি গাছ লাগানো যায় না? তাতে দোষের কী আছে?

সুপ্রকাশ এবার রাকা ও ইউসুফ দু'জনের দিকেই তাকিয়ে বললো, লেস্‌ন নাম্বার টু। আর একটা ব্যাপার শিখে রাখো। ইউসুফকে আগে আমি অনেকবার বলেছি, তবুও বুঝতে চায় না। আমার আগে যে এই জায়গাগুলোর মালিক ছিল, সে ইডিয়েটের মতন পুকুরের পুব পাড়ে কদম গাছ লাগিয়েছে। কদমফুল দেখতে যতই সুন্দর হোক, এই গাছ পুকুরের পক্ষে ক্ষতিকর। পুব দিকটা আড়াল করে রেখেছে, সারা সকালটা জলে সূর্যের আলো পড়ে না। পুকুরের মাঝে রোদ্দুর কতটা দরকার তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। বড় বড় গাছগুলো থেকে পাতা পড়ে, সেই পাতা পচে গ্যাস হয়, জল নষ্ট হয়। এই পুকুরের দক্ষিণ ধারটায় ছিল সার সার কলা গাছ। সেগুলো আগেই আমি কেটে সাফ করে দিয়েছি। কলাগাছে কলা ফললে ভালো দেখায় বটে, কিন্তু পুকুর ধারে কলাগাছ অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাতে মাটির ক্যালসিয়াম অনেক কমে যায়। পুকুরের চারদিকটা রাখতে হয় পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, জাপানে গিয়ে আমি দেখে এসেছি। আগেকার মালিক এই পুকুর থেকে যত মাছ পেত, আমার সময়ে প্রোডাকশন হচ্ছে তার তিনগুণ। গাছের শখ থাকে, বাংলোর সামনে বাগান করো, পুকুর ধারে নয়।

রাকা বললো, সে যাই বলো না কেন, এই কদমগাছ দুটো কাটা চলবে না। অন্যান্য ঝোপঝাড়গুলো আমরা পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

সুপ্রকাশ বললো, শীতকালের রাত্তিরে যখন তোমরা খুব ঘুমোবে, আমি চুপি চুপি কুড়ুল নিয়ে এসে কেটে ফেলবো। বলবো, চোরে কেটে নিয়ে গেছে।

সারাদিন এই রকম গল্পে আর কাজে সময় কেটে যায়। বাড়ির মধ্যে বেশিক্ষণ থাকে না রাকা, তিন আকারের তিনটি পুকুরের ধারেই সে ব্যস্ত থাকে। মিষ্টি জলের মাছ চাষ নিয়ে সে অনেকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, ভেড়ির চাষের নিয়ম আবার আলাদা, সেখানে নোনা জল ঢোকাতে হয়।

প্রথম প্রথম এই জায়গাটাকে যতটা নিরালা ও শান্তিপূর্ণ মনে হয়েছিল, এখন অবশ্য রাকা বুঝে গেছে পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তিময় জায়গা বোধহয় কোথাও নেই। সব জায়গায় চলছে লড়াই। মাছ চাষের প্রধান সমস্যা চুরি-ডাকাতি, ভেড়ি দখলের আশঙ্কা, বাঁধ কেটে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। ভেড়ির দূর দূর প্রান্তে এক একটা টঙের ওপর বাঁশের মাচায় সারারাত বন্দুক নিয়ে পাহারা

দেয় কয়েকজন। মাঝে মাঝে সুপ্রকাশও সে সব জায়গা পরিদর্শনে যায়। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো খাকি প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি, পিঠে ঝোলানো বন্দুক, টর্চ হাতে নিয়ে সন্ধেবেলা সুপ্রকাশ যখন বাঁধের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, বাংলোর জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে রাকা, হঠাৎ তার গা ছমছম করে।

বিয়ের পর প্রথম যে-রাতে এখানে এলো রাকা, সেই রাতটা ছিল স্বপ্নের রাত।

পুরো এক মাসের নোটিস দিয়ে, আইনকানুন মেনে ওদের বিয়ে হল ওয়েলিংটনের মোড়ের কাছে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে, বেলা বারোটার সময়। রাকার এক মামাতো ভাই, নিজের দাদা তৃণীর আর দুজন কলেজের বান্ধবী ছিল সেখানে। শিখার কথা খুব মনে পড়ছিল। শিখা যদি উপস্থিত থাকতো, কী বলতো সে? সুপ্রকাশ তার কোনো আত্মীয়-বন্ধুকে ডাকেনি, সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কাছাকাছি এলাকার দুজন ভেড়ি মালিক এবং বৈঠকখানার একজন আড়তদারকে। সে যে সত্যি বিয়ে করছে, সেটা এদেরই বেশি জানানো দরকার।

রেজিস্ট্রারের অফিসে অনুষ্ঠান শেষ হতে কুড়ি মিনিটও লাগেনি। এরপর সবাই মিলে চীনে পাড়ার এক রেস্তোরাঁয় গেল খেতে। বিলের টাকা সমান দু ভাগ করে দিল তৃণীর আর সুপ্রকাশ। যে স্টেশান ওয়াগনটিতে সুপ্রকাশ মাঝে মাঝে মাছ সাপ্লাই দেয়, যেটাতে ড্রাইভার ও পাশের সীট ছাড়া আর কোনো সীট নেই, সেটাই ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে এনেছিল সুপ্রকাশ। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেটাতেই শুরু হল নবদম্পতির যাত্রা, শেষ মুহূর্তে রাকার বান্ধবী বিদিশা তার ব্যাগ থেকে একটা পারফিউমের শিশি বার করে খানিকটা সুগন্ধ ছড়িয়ে দিল দুজনের গায়ে। গাড়িটাতে সত্যিই আঁশটে গন্ধ ছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর তার প্রথম প্রেমালাপ হিসেবে সুপ্রকাশ গম্ভীরভাবে বলেছিল, শোনো, টালিগঞ্জের একজন কাস্টোমারের কাছে চেক পাবার কথা আছে, তেল পুড়িয়ে এতটা এসেছি যখন, কাজটা সেরে যাই, কী বলো?

রাকা বলেছিল, আমি টুথপেস্ট আনতে ভুলে গেছি। তোমরা কি ওখানে নিমডাল ব্যবহার করো?

তারপর দুজনেই জোরে হেসে উঠেছিল একসঙ্গে।

মিত্রবাবুর জলকরে সাতাশজন কর্মী, ইউসুফ তাদের মধ্যে সুপ্রকাশের ডানহাত তুল্য। ইউসুফ আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল, সেই সন্ধেবেলা

বাংলোর সামনে শামিয়ানা খাটিয়ে ভোজ হলো, বাদা অঞ্চলের মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে ফস্টি-নষ্টির গান গাইলো কয়েকখানা।

দোতলায় একখানিই ঘর। এতদিন সেখানে ছিল শুধু একলা মানুষের উপযোগী খাট, ইউসুফ জয়নগর মজিলপুরের দোকান থেকে আর একটা শস্তা দামের খাট আনিয়ে জুড়ে নিয়েছে, নিজের বিবেচনাতেই বিছানার ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে কিছু গোলাপের পাপড়ি। এক কোণে জ্বলছে একটা হ্যাজাক। এখানে ওদের ফুলশয্যা।

ঘরে ঢুকেই সুপ্রকাশ বললো, ওপরতলায় বাথরুম নেই, তোমার অসুবিধে হবে। রাত্তিরে দরকার হলে নীচে যেতে হবে, তুমি ভূতের ভয়টয় পাও না তো ?

রাকা বললো, হ্যাঁ পাই। তোমাকেও যেতে হবে সঙ্গে। তোমার খুব গাঢ় ঘুম নয় তো ?

সুপ্রকাশ বললো, প্রথম প্রথম আমাকে ডেকে তুললেও আপত্তি করবো না। পরে তোমাকে অভ্যেস করে নিতে হবে ! ভূতের ভয় আবার কী ! আরশোলা, টিকটিকি, মাকড়শা এসবেরও ভয় পাও ?

রাকা মাথা হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ।

—তা হলে যখন তখন তোমাকে ভয় পেতে হবে। ওসব এখানে প্রচুর। মাঝে মাঝে সাপও ঢুকে পড়ে।

—বাঘ টাঘ আসে না ?

—তেমন ঘন ঘন আসে না। এদিকে একটা বাঘ নদী সাঁতরে এসেছিল বটে, সেও বছর দু-এক আগে। টালির চালে মাঝে মাঝে একটা প্যাঁচা এসে বসে। মাঝরাত্তিরে ওর খ্যারখেরে ডাক শুনে চমকে উঠো না। একটা প্যাঁচা ছিল, এখন এলো একটা প্যাঁচানি। পেঁচা বলে পেঁচানি, খাসা তোর চ্যাঁচানি !

—একটা কোথায়, দুটো প্যাঁচা হলো তা হলে।

—হ্যাঁ, ঐ প্যাঁচাটা আবার তোমাকে নিয়ে নিতে না চায় !

—দেওয়ালে ওটা কী ঝুলছে ?

—রাইফেল। আগে বুঝি রাইফেল দেখোনি কখনো ? জামা পরানো রয়েছে।

তারপরই সে হেসে বললো, ইউসুফটা একটা ইডিয়েট ! ওটা আজকের মতন সরিয়ে রাখতে পারেনি ! চোখের সামনে একটা রাইফেল ঝুলতে দেখলে প্রেম হয় নাকি ?

রাইফেলটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে খাটের তলায় রেখে দিলো সুপ্রকাশ।

এ ঘরের তিনদিকে তিনটে জানলা। যে-দিকে তাকানো যায় শুধু অন্ধকারের সমুদ্র। চোখ সইয়ে নিলে দেখা যায় জলটুঙ্গির মিটমিটে আলো। আকাশে আলো নেই, এমনই মেঘলা। তবু এই দিগন্তব্যাপী শূন্যতারও একটা সৌন্দর্য আছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রাকার হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

সুপ্রকাশ তার পাশে দাঁড়িয়ে আলতোভাবে কাঁধে হাত রেখে বললো, তুমি গান জানো ?

রাকা বললো, নাঃ ! গান শিখিনি কখনো।

সুপ্রকাশ বললো, ফুলশয্যার রাতে গান শোনা আমার ভাগ্যে নেই। কোনো কবিতার লাইনও আমার মনে আসছে না। অথচ যখন তখন অনেক লাইন মনে পড়ে। এখন যেন অনেকটা আনুষ্ঠানিকভাবে কবিতা পড়া, সেটা একটু ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।

—তোমাকে কবিতা পড়তেও হবে না !

— তা হলে কী করে, মানে ঠিক কোন্ ভাষায় প্রেম করবো বলো তো ? রাকা, আমি ঠিক জানি না, আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ঠিক কীভাবে শুরু হয় ! ভয় হয়, যদি তোমাকে কোনোভাবে আঘাত দিয়ে ফেলি !

—তুমি আজ যে জামাটা পরে আছো, আগের দিন এসে তোমার গায়ে এই জামাটা দেখেছিলাম। তোমার বুঝি এই একটাই জামা ?

—না, না, আমার আরও জামা আছে। পরতে মনে থাকে না। ইস, তাই তো, আজ একটা অন্য জামা পরা উচিত ছিল।

—তোমার জামা-টামা কে কেচে দেয় ?

—বাঁশি বলে ছেলেটা আছে, ও সব কাজ করে দেয়।

—নিয়মিত কাচে না, বোঝাই যাচ্ছে। এটায় বড্ড ঘামের গন্ধ হয়েছে তো ! এখন খুলে ফেললে হয় না ?

—আমি তো রাত্তিরে খালি গায়েই শুই। কিন্তু তোমার সামনে... এখানে জামাকাপড় পরারও অসুবিধে হবে তোমার—একপাশে একটা পর্দা টাঙিয়ে দিলে খানিকটা আব্রু হতে পারে

—আপাতত হ্যাজাকটা নিভিয়ে দিলেও... এ আলোটা বড় চোখে লাগছে।

—ঠিক বলেছো। ওটার দরকার নেই। টর্চ তো আছেই।

হ্যাজাকটা একেবারে নিভিয়ে দিয়ে সুপ্রকাশ আবার রাকার পাশে এসে বললো, হ্যাঁ, একটা বেশ ভালো কথা মনে পড়েছে। সেই যে ক্যালকাটা

ক্লাবের পার্টিতে প্রথম তোমাকে দেখি, সেদিন বাড়ি ফেরার পথে আমার মনে হয়েছিল, এই রাকা নামের মেয়েটির সঙ্গে যে লোকটির বিয়ে হবে, কিংবা এই মেয়েটি যার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হবে, সেই লোকটি খুব ভাগ্যবান। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, অথচ খুব সারল্য আছে। ওর মুখখানা দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে। ওঃ, সেই ব্যাটা মহা ভাগ্যবান ! আমি নিজের কথা একবারও ভাবিনি, বিশ্বাস করো, যেন সে প্রশ্নই ওঠে না। তারপর কী সব যেন হয়ে গেল, আমিই এখন সেই লোক, অর্থাৎ আমি খুব ভাগ্যবান আমারই বিচারে। এটা একটা প্রেমের কথা হতে পারে না ?

রাকা সুপ্রকাশের দিকে পাশ ফিরে বললো, মোটামুটি চলতে পারে। আমিও একটা কথা বলবো ? তোমার কাছে এলেই আমার খুব সহজ-স্বাভাবিক মনে হয়। কোনো টেনশন ফিল করিনি। যেন তোমার কাছে যে-কোনো গোপন কথা বলে দিতে পারি। এইটাই বোধহয় প্রেম, তাই না ?

—বোধহয়।

—এখন যেমন আমার মনে হচ্ছে, তোমার জামার বোতামগুলো খুলে দিতে। এই জামাটা আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

—খুলে দাও !

—খালি গায়ে থাকবে ?

—মন্দ কী ! তুমিও ইচ্ছে করলে তোমার শাড়িটা খুলে ফেলতে পারো। অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না। এটা তো নতুন শাড়ি। নতুন শাড়ি পরলে গরম লাগে না ?

—মেয়েরা গরম সহ্য করতে পারে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কত বেশি জামাকাপড় পরে।

—আমার জামা খুলে দিয়েছো, তোমার শাড়িটা আমি খুলে দেবো ? ভাঁজ নষ্ট হবে না, চেয়ারের ওপর রেখে দিচ্ছি। আলনা-টালনা নেই। আর কিছু।

—না, না, আর কিছুর দরকার নেই।

—আমি রাত্তিরে প্যাণ্টের বদলে পা-জামা পরে শুই। সারাদিন এই প্যাণ্টটা পরে আছি। তুমি উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়াও, আমি চট করে প্যাণ্টটা বদলে পা-জামা পরে নিচ্ছি।

—হয়েছে ? এবার তুমিও উল্টো দিকে ফিরে চোখবুজে থাকো।আমি একটা রাত্তিরের পোশাক পরে নেবো। তারপর শুয়ে শুয়ে গল্প করবো !

কয়েক মুহূর্ত পরেই সুপ্রকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা টর্চ জ্বাললো।

রাকা পেছন ফিরে সবেমাত্র বুকের জামা ও বন্ধনী খুলে শায়ার দড়িতে হাত দিয়েছে, একটা আর্ত শব্দ করে দু হাতে বুক চাপা দিয়ে ছুটে গেল দেওয়ালের কাছে। সুপ্রকাশ একঝলক শুধু দেখল তার নগ্ন পিঠ।

সে বললো, কিছু দোষ করে ফেললুম ? মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হলো, মনে হলো অনেকক্ষণ না দেখে রয়েছি। তুমি লজ্জা পেয়েছো, না রাগ করেছো আমার ওপর।

রাকা বললো, টর্চটা নিভিয়ে দাও, প্লিজ।

তারপর সে কাছে এগিয়ে এসে প্রথমে সুপ্রকাশের বুকে একটা হাত ছোঁয়ালো। কিছুটা লোমশ এই পুরুষের বুক। বেশ কঠিন। কিন্তু রাকার আঙুলের ছোঁয়ায় সেখানে শিহরন জাগছে।

সুপ্রকাশের দু কাঁধে হাত রেখে রাকা বললো, এই প্রথম আমি তোমার কাঁধ ছুঁলাম।

সুপ্রকাশ রাকার কোমর দু হাতে জড়িয়ে বললো, আমিও এই প্রথম তোমার কোমর ছুঁলাম। খুব ইচ্ছে করছিল !

এরপর দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনটির জন্য কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হলো না।

প্রায় দমবন্ধ হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে ওরা পরস্পরকে ছাড়িয়ে নিলো। সুপ্রকাশ রাকার একটা হাত তার পা-জামার দড়িতে এনে বললো, তুমি এটা খুলে দাও ! অন্ধকারে এগুলো পরে থাকার দরকার নেই।

সে নিজেও রাকার সায়ার দড়ি খুলতে গিয়ে পারলো না। শক্ত গিঁট। তবু সে খুলবেই। একটানে সে সায়াটাকে নীচে নামিয়ে দিলো।

ঘরের মধ্যে রীতিমতন অন্ধকার। একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার টর্চ জ্বাললো সুপ্রকাশ। রাকা বললো, না, না, ওটা জ্বেলো না !

ঐটুকু আলোয় সব অন্ধকার ঘোচে না। সুপ্রকাশ যে নারী মূর্তিটিকে দেখলো, তার অনেকটাই যেন রহস্যময়, অলীক। অন্ধকার যেন ফুল-লতাপাতার মতন জড়িয়ে আছে তার গায়ে, যেন সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে আসা এক নারী। উর্বশী কিংবা মেদিচির ভিনাস।

সুপ্রকাশ বললো, কবিদের কাছ থেকে কোনো উপমা ধার না নিয়েই বলছি, তোমার বুক যেন রেড সী, বাংলায় কী বলে, লোহিত সাগর, সেই লোহিত সাগরের ঢেউ।

রাকা বললো, আমিও ধার না নিয়ে বলছি, তোমার বুক যেন শিলালিপি, বুকের বাইরের দিকেও কিছু লেখা আছে।

সুপ্রকাশ বললো, তোমার কোমর, তোমার কোমর যেন ডমরু, ওখানে হাত দিয়ে নিজেকে শিব মনে হয়েছিল—

রাকা বললো, আমাকে টর্চটা দাও

সুপ্রকাশ আবার কাছে এসে রাকার চোখে, নাকে, থুতনিতে, গলায়, স্তনবৃন্তে একটা আঙুল বোলাতে লাগলো। আবেশে রাকা বলে উঠলো, আঃ আঃ

হঠাৎ ঝুপ করে বসে পড়ে সুপ্রকাশ রাকার দুই উরুর সন্ধিদেশে চেপে ধরল তার মুখ।

তারপর কীভাবে রাতটা কেটে গেল রাকা জানে না। বিছানাটা যেন একটা নদী। সেখানে সাঁতার কাটলো দুজনে। একজন ডুবে গেলে আর একজন তাকে ভাসিয়ে তোলে। আবার দুজনে একসঙ্গে ডোবে, একসঙ্গে শূন্যে উঠে যায়।

একেবারে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লো সুপ্রকাশ।

রাকার তবু চোখে একছিটে ঘুম নেই। শরীরটা বিষম হালকা হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে একটু একটু নরম আলো এসে পড়েছে ঘরে, রাকা বারবার দারুণ মায়ার সঙ্গে চেয়ে দেখছে এলোমেলোভাবে শুয়ে থাকা সুপ্রকাশের দিকে। আবার ইচ্ছে করছে ওকে আদর করতে। সব ঘুমন্ত পুরুষকেই কি শিশুর মতন দেখায়!

শিখার সেই মারাত্মক কথাটা মনে পড়ে গেল। নারী পুরুষের বিছানা মানেই মঞ্চ, সেখানে দুজনে নিখুঁত অভিনয় করে যায়? কাল প্রায় সারারাত ধরে যে মধুর খেলা চললো, তা শুধু অভিনয়? হতেই পারে না! অভিনয় করছে কি না, তা অভিনেত্রী নিজেও জানবে না? সুপ্রকাশও মানুষটা খাঁটি, ওর মধ্যে একটুও মিথ্যে নেই। ওর বিদেশিনী বউ ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ওকে জিল্ট করেছিল, সেই অভিমানে ও আর অনেকদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে মন দিয়ে মেশেনি!

শিখা বলেছিল, প্রথম প্রথম যা মনে হয় ভালোবাসা, তাও আসলে মোহ, কিছুটা মন আর কিছুটা শরীরের টান। ভালোবাসা চলে যায় এক মাস সতেরো দিন পর। কিংবা বড়জোর এক দু বছর। তারপর স্নেহ-মমতা-দায়িত্ববোধ এসে যদি কাঁধ দেয়, তা হলেই সম্পর্কটা টিকে যায়। শুধু ভালোবাসা বেশিদিন দুজন মানুষকে ধরে রাখতে পারে না!

শিখার সব কথাই ধ্রুব সত্য হতে পারে না। তবে একথাও ঠিক, শিখার সংস্পর্শে না এলে রাকা এরকমভাবে, অন্য সবাইকে অস্বীকার করে সুপ্রকাশের

কাছে চলে আসতে পারত না। অধিকাংশ মেয়েই লজ্জায় কিংবা দ্বিধায় নুয়ে থাকে, নিজের ইচ্ছেটা নিজেই বুঝতে পারে না, বুঝলেও প্রকাশ করতে পারে না।

একটা বছর ঘুরে গেল, তবু সুপ্রকাশের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখতে পায়নি রাকা। সে যেন তার স্বামী নয়, বন্ধু। স্বামী শব্দটার মধ্যেই মালিক মালিক ভাব আছে। সুপ্রকাশ তার বন্ধু ও সহযোগী। রাকা তূণীরের কাছ থেকে তার সম্পত্তির ভাগ বুঝে নিয়েছে, মায়ের গয়না বিক্রি করে দিয়ে, তার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে সুপ্রকাশকে। সে টাকাটা সুপ্রকাশ প্রথমে কিছুতেই নিতে চায়নি। হাত-পা নেড়ে বলেছিল, আরে এটা কী ? এ আবার হয় নাকি ? লোকে বলবে, আমি বিয়ের সময় পণ নিয়েছি ! রাকা বলেছিল, পণ কেন হতে যাবে ! এটা তোমার ব্যবসায়ে আমার শেয়ার। আমাকে পার্টনার করে নেবে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করার চেয়ে এটা ভালো নয়।

এই জলকরের কর্মীদের সঙ্গে রাকার বেশ ভাব হয়ে গেছে। সকলের সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক হলেও সমস্যা আছে অবশ্য। সুপ্রকাশ অর্থলোভী নয়, সে তার কর্মীদের প্রত্যেকের পারিবারিক অবস্থার দিকে নজর দেয়, তারা এখানে খুব শস্তায় চাল-ডাল-তেল পায়, যাতে মাইনের টাকা কেউ নেশাভাঙ করে উড়িয়ে দিয়ে আধপেটা খেয়ে না থাকে। রুটিন কাজের মধ্যেই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রেখেছে। কাছাকাছি অন্য ভেড়ির মালিকরা এ জন্য তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। সুপ্রকাশ তার কর্মীদের বেশি সুযোগ সুবিধে দিলে অন্যরাও এরকম দাবি তোলে। এর ওপর আছে রাজনৈতিক দল। কর্মীদের কাছে কোনো মালিকের জনপ্রিয় হওয়াটা রাজনৈতিক দলগুলো পছন্দ করে না। মালিক মানেই শত্রুপক্ষ। মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অসন্তোষ না থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী হবে ? তারা মালিকের কাছ থেকে টাকা নেবে আর কর্মীদের ক্ষ্যাপাবে। তুচ্ছ কারণে, গুজব ছড়িয়ে মাঝে মাঝেই মারদাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হয়, দু একটা লাশও পড়ে, সেসব খবর শহরের সংবাদপত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না। টাটকা মাছ খাওয়ার ইচ্ছে না হলে পুলিশের ওপর মহলের কেউ বিশেষ আসে না এদিকে।

কত রকম মানুষ, অথচ কোনো মানুষই একরঙা নয়। বাঁশি নামের আঠেরো-উনিশ বছরের ছেলেটি সুপ্রকাশের ব্যক্তিগত কর্মী, তার বাংলোর কাজ দেখাশুনো করে, রান্নাও করে, সেই ছেলেটির গলাটি বেশ সুরেলা। সেই জন্যই তার আসল নাম বংশ ধর বদলে নাম রাখা হয়েছে বাঁশি। • মুকেশ,

কিশোরকুমারের গান সে অবিকল নকল করে গাইতে পারে। যখন সে হাত-পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান গায়, তখন আর তাকে একজন সাধারণ পরিচারক বলে মনেই হয় না। ইউসুফ একটু গম্ভীর ধরনের, সে এখানকার ব্যবসায় হিসেব-নিকেশ রাখে, কিন্তু তার একটা অন্য গুণ আছে। সে নীল আকাশের দিকে তাকিয়েও বলে দিতে পারে, দু ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামবে, বড়জোর আধঘণ্টার এদিক ওদিক হয়, কিন্তু মিলে যায় ঠিক। নিরাপদ আর লক্ষ্মীমণি দুজনেই কাজ করে এখানে, দুটি বাচ্চা আছে, তারা ঘরবেঁধে থাকে ভেড়ির পাশেই, ওদের মধ্যে লক্ষ্মীমণির আশ্চর্য ক্ষমতা আছে সাপ ধরার। রাকা এখনো পোকামাকড় সহ্য করতে শেখেনি, সাপ দেখলে ভয় ও ঘৃণায় তার গা গুলিয়ে ওঠে, অথচ লক্ষ্মীমণি তারই বয়েসী হয়েও অবলীলাক্রমে সাপের লেজ ধরে গর্ত থেকে টেনে বার করে। সাপ ধরা যেন তার নেশা। এখানে সাপ প্রচুর, অধিকাংশই হেলে বা ঢোঁড়া, দু চারটে বিষধরও আছে, লক্ষ্মীমণি হেলে বা কেউটে গ্রাহ্য করে না, সাপ দেখলেই তাড়া করে গিয়ে ল্যাজটা ধরে শূন্যে ঘোরায়। সাপকে এ রকম দু চারবার শুধু ঘোরালেই যে মরে যায়, তাও তো জানতো না রাকা।

সবথেকে তার ভালো লাগে দুখু মিঞাকে। ওর নাম যে দুখু রেখেছিল, তার মোটেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নেই। ওর মতন সুখী মানুষ আর দেখা যায় না। ভেড়ির দূর দূর প্রান্তে জলটুঙ্গিতে যে চারজন পাহারা দেয়, তাদের মধ্যে দুখু একজন। রাতের পর রাত জেগে একটা বাঁশের মাচায় বসে পাহারা দিতে কারুর ভালো লাগার কথা নয়। অন্য তিনজন মাঝে মাঝে ফাঁকি মারে, ওদের ডিউটি বদলে দিতে হয়, কিন্তু দুখুর কোনো অভিযোগ নেই, অন্য ডিউটি দিতে চাইলেও সে রাজি হয় না। জলটুঙ্গির ওপর একটা বর্শা হাতে নিয়ে বসে থাকে সে, মাঝে মাঝে সে চেঁচিয়ে ওঠে, হে-হে-হে-হে-হে! দূর থেকেই সেই শব্দটা শুনলে মনে হয় মহাকালের হাসি।

রাত্তিরে জাগে, দিনেরবেলা ঘুমোয়, মাঝখানে একবার উঠে সে নিজেই রান্না করে খায়। সে যেন মহানন্দে আছে। তার আর কিছু চাইবার নেই, প্রয়োজনটা এতই কমিয়ে এনেছে সে, তাই অতৃপ্তি বোধ নেই। হিমালয়ের গুহায় যে-সব যোগীরা পার্থিব সব কিছু বর্জন করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়, দুখু যেন তাদেরই একজন। সে এমন কিছু জীবন রসের সন্ধান পেয়েছে, যা অন্যারা জানে না।

বাংলোর দিকে দুখু কচিৎ আসে। কঞ্চির মতন সরু, লম্বা একজন মানুষ,

একটু নুয়ে পড়া, বয়েস বোঝা যায় না, মাথার চুল পাতলা, থুতনিতে রুখু দাড়ি, একটা লুঙ্গি আর তেল চিটচিটে গেঞ্জি পরা, তার ঠোঁটে ভারী মিষ্টি একটা হাসি। জাগতিক বিচারে একজন অতি তুচ্ছ মানুষ, তবু সে এমন হাসিটি পেল কী করে ? প্রথম যে-দিন ওকে দেখেছিল রাকা, সেদিন সে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল, বাঁশিকে বললো, ওকেও চা দিতে।

কাচের গেলাসে চা পেয়ে দুখু কী খুশি ! পরম সন্তোষের সঙ্গে সে বললো, বা-বা-বা-বা, গরম চা, আহা-হা-হা ! কী সরেশ !

তারপর ওকে যখন দুটি বিস্কুট দেওয়া হলো, তখন সে যেন বিস্ময় চেপে রাখতে পারছে না। চোখ বড় বড় করে বললো, বিস্কুট ! যেন এর মতন মহামূল্যবান জিনিস আর নেই ! সব কিছুতেই তার আনন্দ আর বিস্ময় !

খানিকবাদে সুপ্রকাশ রাকাকে বললো, একটা মজা দেখবে ?

তারপর সে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, ও দুখু মিঞা, তোমার গেঞ্জিটা তো ছিঁড়ে গেছে দেখছি। জামা নেবে ? আমার একটা জামা দিতে পারি।

দুখু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললো, না, না, ছায়েব, জামা দিয়া কী করব ! এই গেঞ্জিটাই বেশ আছে। ছেঁড়ে নাই তো ! জামা লাগবে না !

সুপ্রকাশ রাকাকে বললো, দেখলে ? ও কিছুই চায় না !

রাত্তিরবেলা রাকা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে অনেকদূরে দুখু মিঞার হা-হা-হা-হা-হা ধ্বনি শুনতে পায়। জলের ওপর বাঁশের মাচায় বসে আছে একজন একলা মানুষ, এই নিথর রাত, রাতের পর রাত। রাকা কল্পনায় ওকে দেখতে পায় আর ভাবে, কোন্ মানুষ যে কিসে খুশি হয় তা কেউ জানে না।

মাসে একদিন দু দিন সুপ্রকাশ আর রাকা শহরে যায়। অনেক কিছু কেনাকাটার থাকে, দু চারজন পরিচিতর সঙ্গে দেখা হয়, সিনেমা-থিয়েটার দেখে, কিন্তু একটা রাতও শহরে কাটাতে ইচ্ছে করে না ওদের। যত রাত হোক, তবু ফিরে আসে। এ সব অঞ্চলে বেশি রাতে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়, কিন্তু সুপ্রকাশ তা গ্রাহ্য করে না।

একদিন দুপুরবেলা আঁতুর পুকুরের ধারে বসে ডিম-পোনা দেখেই কোনটা কোন্ মাছ তা চিনতে শিখছিল রাকা। এর মধ্যেই ভালো জাতের মাছের সঙ্গে অন্য মাছের ভেজাল থাকে। তাতে চাষের ক্ষতি হয়। ত্যালাপিয়ার বাচ্চা থাকলে তারা অন্য মাছ খেয়ে নেবে।

একটা গামলায় এই পুকুর থেকে বেশ কিছু ডিম-পোনা সমেত খানিকটা জল তুলে নিল সুপ্রকাশ। ডিম-পোনাগুলোর বয়েস তিন-চারদিন মাত্র। জল

একেবারে স্থির হলে সুপ্রকাশ বললো, এবার তাকিয়ে দেখো, বাচ্চা মাছগুলো ঘুরছে। কোন্ দিকে ঘুরছে বলো তো ?

রাকা গামলাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললো, সবগুলোই তো ঘুরছে। ডানদিকে-বাঁদিকে।

সুপ্রকাশ বললো, উঁহু, ওভাবে দেখবে না। দেখো, ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে, সেই দিকে, না উল্টোদিকে। ক্লক ওয়াইজ, আর অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ! গামলাটা গোল, তোমার বুঝতে সুবিধে হবে।

রাকা বললো, বেশিরভাগ ডিম-পোনাই ঘুরছে, অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ। কিছু ঘড়ির কাঁটার দিকে।

সুপ্রকাশ বললো, যে-গুলো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরে, সেগুলোই চাষের উপযোগী মাছ, রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবাউস। আরও দেখো, এত ছোট অবস্থাতেও এদের মধ্যে কিছু আছে জলের ওপরের দিকে, কিছু মাঝখানে, কিছু তলায়, এতেও চেনা যায় এদের জাত....

ছোট্ট পুকুরটার এককোণে কাপড়ের হাপায় কিছু ডিম-পোনা রেখে জলের ছিটে দিচ্ছিল দুজন কর্মী, তাদের মধ্যে একজন মুখ তুলে বললো, কে যেন একজন এসেছে বাইরে থেকে। পুলিশের কোনো সাহেব মনে হয় !

মুখ তুলে তাকিয়ে রাকা চমকে গেল।

একজন দীর্ঘকায়, চওড়া পুরুষ প্যান্টের দু পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলোর সামনে, চোখ এদিকেই। তার খয়েরি বুশ শার্টে চারটে পকেট, গালের দু পাশে বড় জুলপি, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে সেনানায়কসুলভ ভাব।

চন্দ্রমৌলিকে দেখে সত্যিকারের খুশি হলো রাকা, শেষবার যখন দেখা হয় তখন রাকা চন্দ্রমৌলির সঙ্গে বেশ কঠিন ব্যবহার করেছিল, তখন সুপ্রকাশকে বিয়ে করার কোনো বিরুদ্ধমত সে সহ্য করতে পারছিল না। চন্দ্রমৌলি রাকার ব্যবহারে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তবু তিনি নিজে থেকেই এসেছেন। আর তো কেউ আসেনি, তূণীর পর্যন্ত দু বার আসবে বলেও আসতে পারেনি। সকলের ধারণা, এই সব বাদা অঞ্চলে কোনো সভ্য মানুষ যায় না।

রাকা এক ছুট লাগালো, দিঘির পাড় ঘুরে এসে হাসি ঝলমল মুখে বললো, মৌলিকাকা !

তারপর রাকা ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রমৌলির পায়ের ধুলো নিতে গেল। তাদের বাড়িতে পা ছুঁয়ে প্রণামের বাড়াবাড়ি ছিল না, বিজয়া দশমীর দিন ছাড়া, বাড়িতে গুরুজন এলেও মা-বাবা বলতেন না, প্রণাম করো। আজ রাকার প্রণাম করতে

ইচ্ছে হলো, চন্দ্রমৌলির পা ছোঁয়ার আগেই তিনি দু হাতে রাকাকে তুলে নিয়ে বললেন, কেমন আছো, রাকা ? রোদে পুড়ে রঙটা আমারই মতন হয়েছে দেখছি !

তুই কিংবা খুকি বললেন না চন্দ্রমৌলি, রাকার সেটা কানে লাগলো, তার মা-ও রাগ করলে রাকাকে তুমি তুমি করতেন।

সুপ্রকাশের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর চন্দ্রমৌলি তার হাত ধরে উষ্ণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তোমাদের বিয়ের সময় আমি আসতে পারিনি, বহু দূর জঙ্গলে থাকি... এ জায়গাটা কী সুন্দর, এত জল, জীবনে আমি এত জল দেখিনি, চতুর্দিকে জল... ।

বাংলোর বারান্দায় কফি খেতে বসে সুপ্রকাশ বললো, আপনার ভাইঝিটি এই এক বছরের মধ্যেই পুরোপুরি মেছুনি হয়ে গেছে। মাছ সম্পর্কে এখন আমার থেকেও বেশি জানে।

রাকা বললো, আমি মেছুনি কেন হতে যাবো, আমি মোটেই মাছ বিক্রি করি না। আমি মাছ নিয়ে গবেষণা করি। তুমি মাছওয়ালা, তুমি মাছ বিক্রি করো !

তারপর পাশ ফিরে বললো, মৌলিকাকা, তুমি কী মাছ খাবে বলো ? তুমি যে মাছের নাম করবে, সেটাই আমরা আজ তুলবো !

চন্দ্রমৌলি বললেন, আমি তো অত মাছ খেতে ভালোবাসি না। আমাদের ওখানে মাছ এত কম পাওয়া যায় যে, অভ্যেসটাই চলে গেছে। এখন বেশিরভাগ মাছেই গন্ধ লাগে। কিন্তু আমার জন্য তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি নিরামিষও দিব্যি খেতে পারি !

সুপ্রকাশ আর রাকা চোখাচোখি করলো। তারপর রাকা হেসে উঠে বললো, তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে কেন ? আমরা বুঝি রোজ মাছ খাই ! এখানে ভালো দিশি মুরগি পাওয়া যায়, চমৎকার স্বাদ

সঙ্গে একটা সুটকেস এনেছেন চন্দ্রমৌলি, তার থেকে বার করলেন রাশি রাশি প্যাকেট। চীজ, মাখন, কাজুবাদাম, মায়োনেজ, মার্মালেড ও ফ্রুটকেক। চন্দ্রমৌলি ভেবেছিলেন, রাকা যে রকম পাণ্ডববর্জিত দেশে থাকে, সেখানে নিশ্চয়ই সভ্যজগতের এই সব খাবার পাওয়া যায় না, কিন্তু রাকা-সুপ্রকাশ যে মাঝে মাঝেই কলকাতায় যায়, তা তিনি জানতেন না।

রাকা বললো, তুমি এ কী করেছো, মৌলিকাকা, এখানে ফ্রিজ নেই, এত সব মাখন-চীজ রাখবো কোথায় ?

চন্দ্রমৌলি লাজুকভাবে বললেন, সবাই খাবে !

তারপর তিনি সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জঙ্গলের মানুষ, এ রকম পরিবেশে কখনো থাকিনি, তোমাদের এখানে দু একদিন থাকতে দেবে ?

রাকা বললো, এ আবার কী রকম কথা ? বর্ধমানের বাড়িতে তুমি কখনো একথা জিজ্ঞাসা করতে ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, জংলি হয়ে গেছি একেবারে। কী করে কথা বলতে হয়, তাও ভুলে গেছি।

রাকা বললেন, একদিন দু দিন মানে কী, তোমাকে সহজে ছাড়ছি নাকি ? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

সুপ্রকাশ স্মিতমুখে তাকিয়ে আছে, সে বললো, আপনি সুন্দরবন দেখেননি তো, এখান থেকে বেশ কাছে, বেড়াতে যাওয়া যেতে পারে।

বাংলোটা যখন বানিয়েছিল সুপ্রকাশ, তখন সে ভেবেছিল এখানে একলাই থাকবে। দোতলায় একখানাই শয়নকক্ষ, একতলায় তিনটি ঘরের মধ্যে দুটিতেই মালপত্র ও সরঞ্জাম ঠাসা, সেগুলো বার করে অন্য কোথাও রাখার উপায় নেই, মাঝখানে একটা ঘর আছে বটে, সেটাতে শোওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, বাদলা দিনে কিংবা খুব শীতের সময় সুপ্রকাশ এখানে তার কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে, একপাশে লম্বা করে মাদুর পাতা, বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করতে হয় এই ঘরের মধ্য দিয়েই। মাঝে মাঝে ব্যাঙ তাড়া করে সাপ ঢুকে পড়ে, তাছাড়া আছে ইঁদুরের উৎপাত, মেঝেতে শোওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রাতের মধ্যে খাট জোগাড় হবেই বা কী করে, ইউসুফ কোথা থেকে নিয়ে এলো একটা খাটিয়া, কিন্তু চন্দ্রমৌলির অতবড় চেহারার উপযোগী খাটিয়া পাওয়া যাবে কোথায়, তাঁর পা বেরিয়ে থাকবে, তবু তিনি জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না, গাছের ডালে ঘুমোনোরও অভ্যেস আছে তাঁর।

তবু রাকার লজ্জা করতে লাগলো। মধ্যপ্রদেশ থেকে বাংলায় এলে চন্দ্রমৌলি গ্র্যান্ড হোটেলে থাকেন, কিন্তু এখানে আর কিছু ভালো ব্যবস্থা করা যে সম্ভব নয় !

পরদিন রাকা নীচে নেমে এসে বাঁশির মুখে শুনলো, চন্দ্রমৌলি অনেক ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়েছেন একলা।

তিনি পুকুরগুলো ঘুরে ভেড়ির বাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেলেন অনেকটা দূর। অভ্যেস না থাকলে বর্ষার সময় এইসব বাঁধ দিয়ে হাঁটা বেশ শক্ত,

চন্দ্রমৌলির পায়ে চামড়ার বুট, দু একবার পিছলে পড়ে গেলেও তিনি দমলেন না, চারখানা জলটুঙ্গি এবং মিত্রবাবুর জলকরের সীমানা তাঁর দেখা হয়ে গেল। চারপাশে শুধু ঢেউহীন স্থির জল, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাছের ঘাই, এক জায়গায় একটা হলদে-কালো ঢোঁড়া সাপ অলসভাবে জল কেটে যাচ্ছে, একটু দূরেই হারান আর গজু নামে দুজন কর্মী পাঁক তুলছে, তারা গ্রাহ্যও করছে না সাপটাকে, থমকে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমৌলি অভিভূত।

ফিরে এসে চা খেতে খেতে তিনি সুপ্রকাশ আর রাকার কাছ থেকে প্রশ্ন করে করে বুঝে নিতে চাইলেন এই ব্যবসার ধরন। কত একর জলকরে কত কুইন্টাল উৎপাদন। কত লগ্নী, কতটা ব্যাঙ্কের সুদ আর কতখানি মুনাফা। খানিকবাদে তিনি বললেন, বাঃ, এও তো একটা ইন্ডাস্ট্রি। আর সবচেয়ে বড় কথা, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোডাক্ট বিক্রি করা একটা সমস্যা, মার্কেটিং নিয়ে চিন্তা করতে হয়, তোমাদের সে চিন্তা নেই। মার্কেট সব সময় রেডি।

সুপ্রকাশ বললো, হ্যাঁ, সেদিকে সুবিধে আছে। আবার কতকগুলো হ্যাজার্ডও আছে।

চন্দ্রমৌলি জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম?

সুপ্রকাশ বললো, প্রথমেই ধরুন, আমাদের প্রোডাক্ট হচ্ছে পেরিশেব্ল। মাছ ঠিক সময়ে পাঠাতে না পারলে পচে যাবে। সব সময় বরফও পাওয়া যায় না। তাছাড়া বেশি বৃষ্টি বা বন্যা হলে মাছ ভেসে যায়। বাইরের লোক শত্রুতা করে বাঁধ কেটে দেয়। আমি প্রথম যখন আসি, আমার বড় পুকুরটায় কেউ বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, একদিনে সব মাছ মরে গেল। এছাড়া চুরি-টুরি তো আছেই।

চন্দ্রমৌলি বললেন, এ সবগুলোই আটকানো যায়।

দুপুরের আগেই চন্দ্রমৌলি খালি পায়ে, প্যাণ্ট গুটিয়ে কাজে লেগে গেলেন, মাঝারি আকারের লালন পুকুরটার ঝাঁঝি পরিষ্কার করা হচ্ছিল, চন্দ্রমৌলি হাত লাগালেন অন্য কর্মীদের পাশে গিয়ে। রাকা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলো, মৌলিকাকা, তুমি জলে নামছো, তুমি সাঁতার জানো?

চন্দ্রমৌলি মুখ তুলে হেসে বললেন, হ্যাঁরে, জানি। জঙ্গলের দেশে থাকি বলে কি ভেবেছিস, সেখানে নদী টদিও নেই? বড় বড় নদী আছে!

জঙ্গলের মানুষ হলেও দেখা গেল এখানে জল-কাদা ঘাঁটতে চন্দ্রমৌলির মহা উৎসাহ। এ বছর আর একটা ছোট পুকুর কাটা হয়েছে অগভীর করে, সেখানে শুধু মাগুর মাছের চাষ হচ্ছে। পাঁচ কাঠার পুকুর, তাতে ছাড়া হয়েছে দেড়

হাজার মাগুরের চারা। সাত-আট মাসের মধ্যেই মাগুর বেশ বেড়ে ওঠে, ভালো দামে বিক্রি করা যায়। সাধারণ পুকুরে মাগুর মাছ যা-তা খেয়ে বেড়ে ওঠে, সুপ্রকাশ অবশ্য মাগুরকে খাদ্য জোগানোর বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। ফিসমিল অর্থাৎ শুকনো মাছের গুঁড়োর সঙ্গে চালের গুঁড়ো, বাদাম ও সরষের খোল আর কাঁচা গোবর মিলিয়ে মিশিয়ে মেখে নিয়ে মণ্ড পাকাতে হয়। চন্দ্রমৌলি প্যান্ট নোংরা হবার তোয়াক্কা না করে মাটিতে বসে পড়ে দু হাত দিয়ে সেই খাদ্য বানাতে বসে যান। মাগুরমাছ রাত্তিরে খেতে ভালোবাসে, তাই তাদের বেশির ভাগ খাদ্য দিতে হয় সন্ধের পর। চন্দ্রমৌলি সন্ধেবেলা মাগুর-পুকুরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাবার দিচ্ছিলেন, সুপ্রকাশ এসে বললো, দাঁড়ান, ওভাবে সবটা দেবেন না। চারটে প্লাস্টিকের বালতিতে কিছুটা করে খাবার রেখে পুকুরের চার কোণে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

চন্দ্রমৌলি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ওভাবে দিয়ে কী হবে? জলে গুলে গেলেই তো হলো!

সুপ্রকাশ বললো, ঐভাবেই দিয়ে দেখুন না! সব মাছের স্বভাব তো এক নয়!

সেরকমভাবে চারটে বালতি জলে ঝুলিয়ে দেবার খানিকটা পরেই দেখা গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে মাগুর খলখল করে সেই খাবার খাচ্ছে।

পোষা কুকুর-বেড়ালের মতন মাছকেও যে এভাবে খাওয়ানো যায়, এ সম্পর্কে চন্দ্রমৌলির কোনো ধারণাই ছিল না।

এখানকার কর্মীদের সঙ্গে চন্দ্রমৌলির বেশ ভাব হয়ে গেছে, তিনি সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ওদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু রাকা লক্ষ্য করলো, সুপ্রকাশের সঙ্গে চন্দ্রমৌলির সম্পর্কটা খুব স্বাভাবিক নয়, ওরা দুজনেই হেসে হেসে কথা বলে বটে, তবু যেন অনেকটাই ফর্মাল। এই পুরুষ দুটির মধ্যে যেন একটা সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। এরা চেষ্টা করেও পরস্পরকে পুরোপুরি পছন্দ করতে পারেনি। কিছু একটা বাধা থেকে যাচ্ছে। চন্দ্রমৌলি আগেকার মতন রাকার সঙ্গেও সম্পূর্ণ সহজ হতে পারেননি, এখনো তুই বা খুকি বলেননি একবারও।

দিন দশেক বাদে, রাত্তিরে বিছানায় এসে সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, তোমার এই কাকাটি কতদিন থাকবেন?

রাকা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, কেন? কেন একথা বলছো?

সুপ্রকাশ বললো, ওঁর নিজের কাঠের ব্যবসা আছে, সেটা ছেড়ে এখানে

এতদিন রয়েছেন।

রাকা বললো, সে ব্যবসা দেখার অন্য লোক আছে। আসলে কী জানো, মৌলিকাকার আপনজন তো কেউ নেই ওখানে। ওঁর ছেলে, সুকান্তদা নরওয়েতে চলে গেল, আর ফিরবেই না।

—তোমার বাবার আপন ভাই ?

—আমার বাবার কোনো ভাই নেই। মৌলিকাকা বাবার খুব ছোটবেলার বন্ধু, ভাইয়ের থেকেও অনেক আপন। এই, তুমি কি মৌলিকাকার ওপরে কোনো কারণে বিরক্ত হয়েছো ? উনি তো আমাদের কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করছেন না। বরং সারাদিন কতরকমভাবে কাজের সাহায্য করছেন !

—আমাদের নিজস্ব কাজের লোক থাকতেও যদি বাইরে থেকে কেউ সাহায্য করতে আসে, তাতে অসুবিধেরই সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, উনি... আমি কোনো অভিযোগ করছি না, রাকা, মানুষটি খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু উনি না বুঝে একটা ব্যাপার করছেন, এখানকার ওয়ার্কারদের হাঁড়ির খবর নিচ্ছেন, কারুর কারুর ঝগড়া মেটাচ্ছেন, দু একজনকে ধমকাচ্ছেন, উনি ভালো ভেবেই করছেন, কিন্তু এরা নিজেদের ব্যাপারে বাইরের কারুর নাক গলানো পছন্দ করে না।

—বাঃ, সেটা মৌলিকাকাকে বলে দিলেই হয় !

—তুমি যদি পারো তো বলে দিও, আমার কিছু বলাটা বোধ হয় ভালো দেখায় না। আফটার অল আমার শ্বশুর হন তো !

একটু বাদে ওরা ঐ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আদর শুরু করলো। শরীরের রহস্য এখনো সব উন্মোচিত হয়নি, আনন্দের তীব্রতা যেন দিন দিনই বাড়ছে। নিবিড় স্পর্শে জাদুর ঘোর লাগে।

তবু যেন আজ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল রাকা। ঝলকে ঝলকে মনে পড়ে যাচ্ছিল চন্দ্রমৌলির কথা। শ্বশুর ! সুপ্রকাশ কেন শ্বশুর বললো ? বাবার বন্ধুও শ্বশুর হতেই পারেন !

এতদিন সুপ্রকাশ ছিল এখানে একচ্ছত্র পুরুষ। চন্দ্রমৌলির বিশাল উপস্থিতি কিছুতেই অমান্য করা যায় না। দ্বিতীয় একজন পুরুষ হিসেবেই কি চন্দ্রমৌলিকে সহ্য করতে পারছে না সুপ্রকাশ ?

সব শেষ হয়ে যাবার পর রাকা একবার শিউরে উঠলো। আজ সে কি খানিকটা অভিনয় করছে না সুপ্রকাশের সঙ্গে ? তাকে সে আজ শরীর দিয়েছে, পুরোপুরি মন দেয়নি ! এই বিছানাটা তা হলে মঞ্চ !

রাকা বললো, তুমি মৌলিকাকাকে সুন্দরবন দেখাতে বলেছিলে ?

এর উত্তরে অকারণেই শুকনোভাবে হেসে উঠলো সুপ্রকাশ।

বেশিদূর তো নয়, মোটরবোট লাগানো নৌকোয় গেলে বড়জোর দু ঘন্টা লাগবে, কিন্তু এত দিনেও রাকা যায়নি একবারও, অনেকবার কথা হয়েছে গেলেই তো হয় বলেই দিনটা আর ঠিক হয় না।

সুপ্রকাশ বললো, মোটরটা সারাতে দিয়েছি, দেখি কাল-পরশু পাওয়া যায় কি না।

তারপরের দিনই রাকা, তার মায়ের মৃত্যুর সময় থেকে যে-প্রশ্নটা তার মনে অদৃশ্য একটা পোকার মতন বারবার কামড়াত, সেটা বলে ফেললো চন্দ্রমৌলিকে। তার বুকটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল, যদি সত্যি হয়, তা হলে তার জীবনটাই বোধ হয় বদলে যাবে, এ জন্য সে অনেকটা তৈরি হয়েও ছিল। কিন্তু চন্দ্রমৌলি যখন আন্তরিক দৃঢ়তার সঙ্গে সব অস্বীকার করলেন, তখন তার মনে আর একটা প্রশ্ন জাগলো, চন্দ্রমৌলি তার কেউ নন, তা হলে মা এত যন্ত্রণা পেয়ে গেলেন কেন ? রাকার জন্য কিসের আশঙ্কা ছিল সেবন্তীর ?

সেদিনটা রাকা শুয়ে কাটালো শরীর খারাপের অজুহাতে। চন্দ্রমৌলি দোতলার ঘরে আসেন না, জানলা দিয়ে রাকা দেখতে পায়, চন্দ্রমৌলি অন্য কয়েকজনের সঙ্গে আঁতুর পুকুরে নেমে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। জঙ্গলের মানুষ হয়েও এই জলাভূমিতে তিনি বেশ মানিয়ে নিয়েছেন এর মধ্যে, পা-বেরিয়ে-থাকা খাটিয়ায় শুয়ে দিনের পর দিন কাটাতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

সুপ্রকাশকে যেতে হয়েছে আলিপুরে, পাশের ভেড়ির মালিক সাজ্জাদ হোসেন সীমানা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তর্ক তুলে একটা মামলা ঠুকে দিয়েছে। এখানে প্রায়ই মামলা হয়, এদিককার লোক মামলা ভালোবাসে। অনেকের বাঁধা উকিল আছে। সুপ্রকাশ আদালত একেবারে পছন্দ করে না, তবু তাকে যেতে হয়, এইসব দিনে তার মেজাজ খারাপ থাকে। এতদিনের মধ্যে গতকালই প্রথম সুপ্রকাশের ব্যবহারে খানিকটা রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। সুপ্রকাশ চন্দ্রমৌলিকে সহ্য করতে পারছে না। দুজন পুরুষ, দুজনেরই নিজস্ব মতামত এবং ব্যক্তিত্ব প্রবল, ওরা পাশাপাশি থাকতে পারবে না ? রাকার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'দুই বনস্পতি/মধ্যে রাখে ব্যবধান, লক্ষ লক্ষ তৃণ/একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন...'। নিজের এই এলাকার মধ্যে সুপ্রকাশ এতদিন ছিল একচ্ছত্র বনস্পতি। অথচ চন্দ্রমৌলি তো নিজের বুদ্ধি ও সামর্থ্য

দিয়ে সুপ্রকাশ-রাকাকে সাহায্য করারই চেষ্টা করেছেন।

আদালতে চোর-ছ্যাঁচোড় আর ফন্দিবাজদের ভিড়ে ব্যাজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্রকাশ, এই দৃশ্যটা ভাবতেই রাকার মনটা দ্রব হয়ে যায়। সুপ্রকাশকে ওখানে একেবারেই মানায় না। সে যে সকলের চেয়ে আলাদা, তা কেউ বুঝবে না। মেজাজ ঠিক রাখার জন্য সুপ্রকাশ হয়তো মনে মনে কোনো কবিতা আওড়াচ্ছে। এর আগে, সাজ্জাদ হোসেনকে সে দু' বিঘে নিজের জমি থেকে ছেড়ে দিয়েছে, মামলা এড়াবার জন্য, তারপরেও লোকটি আরও পাঁচ বিঘে দাবি করেছে। কোনো কারণে সুপ্রকাশের মন খারাপ হলে রাকারও বিষম কষ্ট হয়। দুজনে একসঙ্গে কষ্ট পাওয়াই কি ভালোবাসা ?

বিকেলের দিকে লক্ষ্মীমণিদের বাড়ির দিক থেকে একটা কোলাহল শোনা গেল। রাকা তা নিয়ে মাথা ঘামালো না। এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনে মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি করাটাই এদের বিনোদন। লক্ষ্মীমণি ঝগড়ার সময় যে-সব খারাপ কথা বলে, যে-সব পুরুষালি গালাগালি দেয়, তা আগে শুনলে রাকা কানে আঙুল দিত, এখানে তার কান এসব সহ্য করতে শিখে নিয়েছে।

সুপ্রকাশ ফিরলো সন্ধের পর, ঘরে বাতি জ্বালেনি। এমন অসময়ে রাকা শুয়ে আছে দেখেও সে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করলো না, গম্ভীরস্বরে বললো, আজও তোমার কাকা একটা গোলমাল পাকিয়েছেন, ভদ্রেশ্বর আর সুজন ওঁর নামে নালিশ করলো আমার কাছে। বাইরে থেকে এসেই এসব কথা শুনতে ভালো লাগে ? উনি কেন আমার লোকজনদের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন ?

রাকা বললো, তুমি ওঁকে আড়ালে ডেকে বারণ করে দাও না ! উনি নিশ্চয়ই ভালো ভেবেই ওদের ঝগড়া মেটাতে যাচ্ছেন, এখানকার ব্যাপার ঠিক বোঝেন না।

সুপ্রকাশ বললো, সাহায্য করার জন্য কে ওঁকে মাথার দিব্যি দিয়েছে ? তোমার কাকা, আমি কিছু বলতে গেলে সেটা ভালো দেখাবে না। তুমি বরং বুঝিয়ে বলে দিও—

পশ্চিমের আকাশ রাঙা হয়ে আছে, জানলা দিয়ে আসছে সেই রং-মেশানো বাতাস। এখন এই সব কথা বলতে ভালো লাগছে না, রাকা দু' হাত বাড়িয়ে বললো, তুমি আমার কাছে এসে একটু বসো। অসময়ে স্ত্রী শুয়ে থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, কী হয়েছে তোমার, তা তুমি জানো না ?

সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েছে ?

রাকা হেসে বললো, শেখানো কথাটাই বললে ? ইউ ল্যাক ওরিজিনালিটি!

সুপ্রকাশ রাকার পাশে বসতেই রাকা তার একটা হাত টেনে নিলো। সেই হাতটা যেন কাঠের, তাতে বাসনা নেই, উষ্ণতা নেই। এই প্রথম।

রাকা বললো, বাবুর দেখছি আজ খুবই মেজাজ খারাপ। এসো, আমি তোমার মেজাজ ভালো করে দিচ্ছি, এখন থেকে এক ঘন্টা, তুমি ভেড়ির মালিক নও, এখানকার কোনো কথা মনেও আনবে না, এখন তুমি আমার প্রিন্স চারমিং।

যে নিষেধের কথা সুপ্রকাশ নিজের মুখে চন্দ্রমৌলিকে বলতে পারেনি, রাকার ওপর ভার দিয়েছিল, রাকাও তা বলতে পারলো না। কিন্তু তার বলা উচিত ছিল। তা হলে হয়তো এমন একটা চূড়ান্ত পরিণতি হতো না।

দু' দিন বাদে, স্নান সেরে এসে রাকা ওপরের ঘরে শাড়ি বদলাচ্ছে, হঠাৎ সে দুজনের গর্জন শুনতে পেলো। জানলা দিয়ে দেখলো, বেশ খানিকটা দূরে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রমৌলি আর সুপ্রকাশ, রাকার মনে হলো যেন দুই রোমান গ্ল্যাডিয়েটর, তাদের হাতে রয়েছে অদৃশ্য ভল্ল, পরস্পরকে আঘাত দেবার জন্য তারা সমুদ্যত।

চন্দ্রমৌলির এমনিতেই গলার জোর বেশি, সুপ্রকাশ সচরাচর উঁচুস্বরে কথা বলে না, সেও চন্দ্রমৌলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে চিৎকার করছে। রাকা শুধু সেই স্বরই শুনতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে না কথা, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সে কেঁপে উঠলো।

রাকা তক্ষুনি ছুটে যেতে চাইলেও তার উপায় নেই, সে শুধু সায়া পরে আছে, অতি দ্রুত ব্রা পরতে গিয়ে হুক লাগাতে আরও দেরি হতে লাগলো, ব্লাউজে লাগানো মাত্র একটা বোতাম, কোনোক্রমে শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে, চুল না আঁচড়ে সে নেমে গেল। ওদের কাছে পৌঁছে সে শুনতে পেলো মাত্র তিন-চারটি বাক্য।

সৃষ্টিধর কিছু মাছ চুরি করে সরাবার মতলব করছিল, এই সময় চন্দ্রমৌলি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে একটি সপাটে চড় মেরেছেন। সেই চড় খেয়ে সৃষ্টিধর যে এখনো বেঁচে আছে, সেটাই আশ্চর্যের কথা। প্রাণটা খোয়াতে হয়নি বলেই সৃষ্টিধর নিজের অপরাধ অস্বীকার করে গালাগালির বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, তার সমর্থকও জুটেছিল কয়েকজন, যারা নিজেরাও মাঝে মাঝে মাছ চুরি করে, তারা সবাই একবাক্যে বললো যে সৃষ্টিধর চুরি করেনি। প্রায় একটা বিদ্রোহের অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েছে সুপ্রকাশ।

চন্দ্রমৌলি সরল ন্যায়বোধ থেকে বললেন, বেশ করেছি মেরেছি। চোরকে

সময়মতো শিক্ষা না দিলে সে ডাকাত হয়।

এসব অবস্থা অন্যভাবে সামলানো উচিত, তা সুপ্রকাশ জানে। সে বললো, না, ওদের গায়ে হাত তোলার কোনো অধিকার আপনার নেই! সৃষ্টিধর চুরি করেনি, আমি ওদের মাঝে মাঝে নিতে বলেছি। আপনার গায়ের জোর আছে বলেই আপনি মারবেন ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, তুমি ওদের সামনে আমাকে অপমান করেছো ?

চন্দ্রমৌলি কয়েক মুহূর্তের জন্য রুদ্রমূর্তি ধরলেন, যেন তিনি সুপ্রকাশকেও একটা প্রচণ্ড আঘাত করবেন।

সুপ্রকাশ একটুও ভয় পেলো না, সে বললো, আপনার যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকুন, কিন্তু আপনি আমার লোকজনের ব্যাপারে মাথা গলাবেন না। অলরেডি আপনি অনেক ক্ষতি করেছেন !

ততক্ষণে রাকা এসে দাঁড়িয়েছে সুপ্রকাশের পাশে। চন্দ্রমৌলির মুখখানা সম্পূর্ণ বদলে গেল, অদ্ভুত বিস্ময় আর বেদনায় রেখাঙ্কিত হলো সেই মুখ। রাকার দিকে নিষ্পলকভাবে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে তিনি এখানে অবাঞ্ছিত। সারাজীবনে যেন তাকে এমন অপমান কেউ করেনি।

কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল তাঁর, আস্তে আস্তে বললেন. আমি তোমাদের ক্ষতি করেছি ? তোমরা চাও না যে আমি...

রাকা একটি কথাও বলতে পারলো না। একবার যখন সংঘর্ষটা প্রকাশ্যে এসে গেছে, তখন আর জোড়া লাগবে না কিছুতেই। সুপ্রকাশ সহজে রাগে না, এখন তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে সে দারুণ আহত হবে। এই দুজন পুরুষের দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়াবার কোনো ভূমিকা নেই, একজনের পাশেই থাকতে হবে রাকাকে। এখনকার মতন মৌলিকাকা তাঁর স্বামীর কাছে হার স্বীকার করুন, পরে রাকা তাঁকে সান্ত্বনা দেবে।

চন্দ্রমৌলি আর সে সময় দিলেন না, হনহন করে বাংলোর মধ্যে ঢুকে গিয়ে আবার দু মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলেন তাঁর ব্যাগটা হাতে নিয়ে।

সুপ্রকাশ রাকাকে বললো, উনি রাগ করে চলে যাচ্ছেন। তুমি ওঁকে আটকাও।

রাকা যেন পাথরের মূর্তি। তার না-আঁচড়োনা খোলা চুল, ভেজা ভুরু, আধ-খসা আঁচল, খালি পা। দৃষ্টি অবনত। সে জানে. চন্দ্রমৌলিকে আটকানো যাবে না। ছেলেবেলা থেকে সে এই মানুষটির জেদের কত গল্প শুনেছে।

চন্দ্রমৌলি তার কেউ নয়। শুধুই বাবার বন্ধু। সুপ্রকাশ তার জীবনের অংশ।

রাকার দিকে একবারও তাকালেন না চন্দ্রমৌলি, ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি কথাও বললেন না।

সুপ্রকাশ এবার নিজের অহম কিছুটা ত্যাগ করে, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনি এভাবে চলে যাচ্ছেন কেন ? আমি কিন্তু সেভাবে কিছু

চন্দ্রমৌলি শান্তভাবে বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। খুব ভুল হয়ে গেছে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো...

বাঁধের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, দীর্ঘকায় মানুষটি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেলেন, অনেকদূর পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে রাকা বুঝতে পারলো, চন্দ্রমৌলির সঙ্গে এ জীবনে তার আর কোনোদিন দেখা হবে না। কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তেই হয়। সুপ্রকাশের জন্য সে অন্য আর সব কিছু ছাড়তে পারে।

কিন্তু অনুপস্থিতিতেও এক একজনের অস্তিত্ব ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে। যেমন কোনো বস্তুর চেয়ে তার ছায়া হতে পারে অনেক বড়। বাস্তব আকারের চেয়ে কল্পনায় সব কিছুই দীর্ঘ। চন্দ্রমৌলির সেই অপমানিত, মর্মাহত মুখ রাকা ভুলবে কী করে ? ইচ্ছে করলেই কি ভোলা যায় ? সেদিনের পর থেকে ওরা দুজন চন্দ্রমৌলির প্রসঙ্গ একবারও তোলেনি। কিন্তু রাকা জানে, সুপ্রকাশও খানিকটা অনুতপ্ত। চন্দ্রমৌলি আত্মম্ভরি ধরনের মানুষ, ধীরেসুস্থে বুঝিয়ে বললে তিনি ঠিকই বুঝতেন, কিন্তু অন্য কর্মীদের সামনে তাঁর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতেই তিনি অত বেশি আঘাত পেয়েছেন। সৃষ্টিধররা দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল, তারা নিজেরা তো প্রায়ই ঝগড়া করে, কিন্তু বাবুশ্রেণীর প্রকাশ্য ঝগড়া তাদের কাছে একটা মজার উপভোগ্য ব্যাপার !

এক বৃষ্টির দুপুরে সুপ্রকাশ হঠাৎ ওপরে এসে জিজ্ঞেস করলো, তোমাকে অনেকক্ষণ দেখিনি, তুমি এখানে বসে...চিঠি লিখছো ?

রাকা মুখ তুলে তাকালো। সুপ্রকাশের প্রশ্নের মধ্যে একটা অনুক্তভাব আছে। সে ধরেই নিয়েছে, রাকা যেন লুকিয়ে চিঠি লিখছে চন্দ্রমৌলিকে।

সুপ্রকাশ আবার বললো, অনেকদিন তো তোমায় চিঠি লিখতে দেখিনি।

রাকা প্যাডটা তুলে নিয়ে বললো, তুমি এটা পড়ো !

সুপ্রকাশ এক পা পিছিয়ে গেল। তার প্রশ্নের ভেতরকার সন্দেহটা যে প্রকাশ পেয়ে গেছে, তা বুঝতে পেরে সে লজ্জা পেয়েছে।

খানিকটা হেসে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে সে বললো, তোমার চিঠি আমি পড়তে যাবো কেন ?

রাকা বললো, দিদি-জামাইবাবু রাঁচি থেকে বর্ধমানে এসেছে, দিদির চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি অনেকদিন।

সুপ্রকাশ বললো, ওঁরা এখানে আসবেন ? আমার সঙ্গে তো এখনো পরিচয়ই হলো না।

রাকা বললো, না, ওঁরা আসবেন না।

সুপ্রকাশ বললো, শোনো রাকা, তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ এখানে এলে আমার কিন্তু একটুও আপত্তি নেই...

দ্রুত নিজেকে শুধরে নিয়ে সুপ্রকাশ আবার বললো, আমার আপত্তির কোনো প্রশ্নই নেই, এটা তো তোমারও জায়গা, আমাদের দুজনের

রাকা মৃদুস্বরে বললো, না, দিদি আসবে না। দিদির খুব সাপের ভয়।

সুপ্রকাশ বললো, তুমি তোমার মৌলিকাকাকে একটা চিঠি লেখো না ! উনি অমনভাবে রাগ করে চলে গেলেন, আমরা কিন্তু ওঁকে সেভাবে কিছু বলতে চাইনি

এবার রাকা দপ করে জ্বলে উঠে বললো, তুমি ভেবেছিলে, মৌলিকাকাকে চিঠি লিখতে গেলে আমি তোমাকে গোপন করে লিখবো ?

সুপ্রকাশ দৃশ্যত অপ্রস্তুত হয়ে বললো, না, আমি...

আগে কখনো হয়নি, এখন এমনভাবে মাঝে মাঝেই রাকা আর সুপ্রকাশের মাঝখানে এসে দাঁড়াচ্ছে একটা ছায়া। রাকা সেই ছায়াটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, অস্ফুটস্বরে বলে, মৌলিকাকা আমার কেউ না, আমার কেউ না ! বাবার বন্ধুর স্থান বসবার ঘরে, শয়নকক্ষে কেন তিনি উঁকি মারবেন ?

লালন পুকুরের এককোণে চারটে বাঁশের খুঁটি পোঁতা, তার ওপর খড়ের ছাউনি। ওটা মাছেদের জন্য একটা ছাতা। নিদারুণ রোদ্দুরের দিনে মাছেরা একটু একটু ছায়া চায়। ছাউনির তলায় লাগানো হয়েছে কয়েকটা পদ্মলতা, অন্য জায়গা থেকে তুলে এনে পুকুরের কিনারায় কয়েকটা লাউ গাছ লাগিয়ে তাদের ডগাগুলো টেনে দেওয়া হয়েছে খড়ের চালের উপর। চন্দ্রমৌলি এসব নিজের হাতে বানিয়েছেন। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর, ভারী সুন্দর, কয়েকদিনের মধ্যেই লাউডগায় সাদা সাদা ফুল ধরায় চন্দ্রমৌলির কী আনন্দ ! তিনি সেখানে পাঁউরুটির টুকরো ছুঁড়ে দিতেন, কাতলা মাছেরা এসে ঠুকরে ঠুকরে খেতো।

সকালবেলা রাকা এসে দেখলো, সুপ্রকাশ বাঁশিকে সঙ্গে নিয়ে, জলে নেমে বাঁশের খুঁটিগুলো তুলে দিচ্ছে। খড়ের চালটা আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে,

পাড়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে আছে লাউ গাছগুলো।

সুপ্রকাশ চন্দ্রমৌলির হাতের কোনো চিহ্ন এখানে রাখবে না।

মুখ তুলে সে কৈফিয়তের সুরে বললো, পুরোপুরি বর্ষা এসে গেছে, এখন এটার কোনো দরকার নেই। সাপের উৎপাত বাড়বে।

রাকা আস্তে আস্তে সম্মতির মাথা নাড়লো। ঠিকই তো, প্রতিদিন ওটা দেখলে একজনের কথা মনে পড়বে, তা হলে রাখার কী দরকার!

তারপরই সে বললো, চলো, আজ আমরা কলকাতায় যাই!

সুপ্রকাশ বললো, আজ? আজ তো হবে না, ভেড়ির পশ্চিমদিকের বাঁধ খানিকটা ভেঙে গেছে, মেরামত করতে হবে। কাল-পরশু যাবো এখন?

রাকা তবু অবুঝের মতন বললো, না, আজই চলো!

সুপ্রকাশ বললো, লক্ষ্মীটি, আজ হবে না। আরও কাজ আছে। এখানকার এম. এল. এ. আসবে শুনছি, আমার থাকা দরকার

রাকা বললো, তা হলে আমি একা যাই?

সুপ্রকাশকে নমিত হতেই হলো। ভ্যানটাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে বেরিয়ে পড়লো দুপুর দুপুর। রাকা যেন হঠাৎ বেশি বেশি উচ্ছল হয়ে উঠেছে। সুপ্রকাশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সন্ধেটার কথা বলতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলো, তোমার মনে আছে, তুমি আর আমি যখন হ্যামলেটের সংলাপগুলো বলছিলাম, আমাদের পাশে এক ভদ্রমহিলা কেমন গোল গোল চোখ করে তাকাচ্ছিলেন?

সুপ্রকাশ বললো, হ্যাঁ, সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি আগে কথা বলার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আমাকে পাত্তা দেননি। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলে, একা, তোমার দিকে তাকিয়ে মনে হলো, একমাত্র এই মেয়েটিই আমার ভাষা বুঝবে!

রাকা বললো, আমি অচেনা মানুষদের সঙ্গে কক্ষনো আলাপ জমাতে পারি না, কিন্তু তুমি যেন আমাকে একটা মন্ত্র দিয়ে টানলে, একবার হাতছানি দিতেই আমি এগিয়ে গেলাম

সুপ্রকাশ বললো, আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, তুমি অনেক উঁচুতলার মানুষ, আমার মতন একজন মাছওয়ালাকে পাত্তাই দেবে না!

রাকা বললো, মাছের ব্যবসা করতে গিয়ে আমাদের কিন্তু লেখাপড়া ভুলে গেলে চলবে না। বলো তো, ইট ইজ দা উইন্টার অফ ডিসকন্টেন্ট...

সুপ্রকাশ দুখানা সাইকেল ভ্যানকে পাশ কাটাতে কাটাতে বললো, তুমি বলো তো, এটা কোন্ নাটকের, আ হর্স, আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স!

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মতন ওরা দুজনে মহা উৎসাহে শেক্সপীয়ার মুখস্থ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে পেরিয়ে এলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙাচোরা রাস্তা।

নিউ মার্কেটে কেনাকাটা সেরে, পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁয় সভ্যসমাজের বাছাই করা খাদ্য খেয়ে, খানিকটা মদ্যপান করে ফুরফুরে মেজাজে ওরা ফিরলো অনেক রাত্রে। তার মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।

মাছের ব্যবসা আর শেক্সপীয়ার কি সত্যি মেলানো যায়? সাজ্জাদ হোসেন এক লাইনও শেক্সপীয়ার পড়েনি, সে এ ব্যবসায় অনেক বেশি ধুরন্ধর। মামলায় হেরে গিয়ে সে অন্য পন্থা নিয়েছে। তাদের তিনপুরুষের এই ব্যবসা, এর মধ্যে একজন শহুরে বাবু উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, কর্মীদের শস্তায় খাদ্য দিচ্ছে, মজুরির রেট বাড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে, একে তাড়াবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

প্রতিবারই বর্ষার সময় কিছু না কিছু গণ্ডগোল লাগে। জল উপছে ওঠে, বাঁধে চিড় ধরে, শত্রুপক্ষ এসে বাঁধ কেটে দিয়ে প্রচুর মাছ বার করে দেয়। এ সময় সজাগ প্রহরা রাখতে হয়, সুপ্রকাশ তার কর্মীদের ওপর ভরসা রাখে।

কলকাতা থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি, তুমুল বৃষ্টি, তার ওপর মিশমিশে অন্ধকারে পথঘাট দেখা যায় না। বেশি রাতে এসব রাস্তায় কোনো গাড়ি চলে না, ডাকাতির ভয় আছে, সে রকম কোনো বাধা পড়ল না, সুপ্রকাশ নিপুণভাবে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এলো। শেষের দিকের খানিকটা রাস্তা তার নিজের তৈরি করা।

গাড়ি থামবার আগেই হ্যাজাক হাতে নিয়ে ছুটে এলো বাঁশি। কান্না জড়ানো গলায় সে যা বলতে লাগলো, তা প্রথমটা প্রায় বোঝাই গেল না, খালি সর্বনাশ সর্বনাশ শোনা গেল বার বার।

আজ বিকেলে সাজ্জাদ হোসেন আইনের তোয়াক্কা না করে বাহুবল দেখিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক দলকে তার হাত করা আছে, পুলিশ যাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এদিকে না আসে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে, তারপর সে লোকজন নিয়ে এসে তিন জায়গায় বাঁধ কেটে দিয়েছে জোর করে। সুপ্রকাশের লোকেরা বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু সাজ্জাদের দলের অস্ত্রশস্ত্র বেশি, তিনজনকে আহত করেছে সাঙ্ঘাতিকভাবে, দুখু মিঞাকে ধরে নিয়ে গেছে জোর করে, এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কি না ঠিক নেই।

সুপ্রকাশ চিৎকার করে উঠলো, ইউসুফ! ইউসুফ!

বিকেলের ঘটনার পর অনেকেই পালিয়ে গেছে ভয়ে, সাজ্জাদের লোকজন আবার ফিরে এসে বাঁধ কাটছে বিনা বাধায়। ইউসুফ অবশ্য পালায়নি, প্রথমবারের সংঘর্ষে বাধা দিতে গিয়ে একটা বল্লম বিঁধেছে তার উরুতে, সে বাংলোর বারান্দায় শুয়ে কাতরাচ্ছে।

সুপ্রকাশ এক দৌড়ে দোতলার ঘর থেকে রাইফেলটা এনে বললো, রাকা, তুমি ইউসুফের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও, আমি আসছি।

ইউসুফ উঠে বসে ভয়ার্ত স্বরে বললো, তুমি কোথায় যাবে একা একা!

সুপ্রকাশ চেঁচিয়ে বললো, আর কেউ নেই? কেউ নেই?

এ যেন অসহায় তৃতীয় রিচার্ডের আর্তনাদ, আ হর্স, আ হর্স, মাই কিংডম ফর আ হর্স!

রাকা সুপ্রকাশের হাত চেপে ধরে বললো, কোথায় যাবে এই অন্ধকারে?

সুপ্রকাশ বললো, আমাকে যেতেই হবে, রাকা। সব শুনেও যদি আমি না যাই, এখনো ওরা বাঁধ কাটছে, একবার যদি কাপুরুষ হিসেবে আমার নাম রটে যায়, তা হলে আর কেউ কোনোদিন আমায় মানবে না!

রাকা কাঁপতে কাঁপতে বললো. না, তুমি যাবে না!

সুপ্রকাশ বললো, দুখু মিঞাকে ওরা ধরে রেখেছে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো না? ভয় নেই, আমি জানি সাজ্জাদের রাইফেল নেই, ওরা পাইপ নিয়ে লড়ে, রাইফেলের সামনে দাঁড়াবার সাহস ওদের নেই!

রাকা বললো, তুমি খুনোখুনি করতে যাবে?

সুপ্রকাশ বললো, না, আমি মানুষ মারি না। দুখু মিঞাকে ছাড়িয়ে আনবো, ওদের শুধু ভয় দেখাবো। বাঁশি, তুই যাবি আমার সঙ্গে? বড় টর্চটা নে!

রাকা বললো, আমিও যাবো!

সুপ্রকাশ ধমক দিয়ে বললো, পাগল হয়েছো নাকি? তুমি গিয়ে আরও বিপদ বাড়াবে?

এই অবস্থাতে অবধারিতভাবে রাকার মনে পড়লো চন্দ্রমৌলির কথা। তিনি যদি এখানে আজ উপস্থিত থাকতেন, তা হলে হয়তো এত সব কিছুই ঘটত না! রাইফেল হাতে চন্দ্রমৌলিকেই মানায়। তিনি প্রতিষ্ঠিত বীরযোদ্ধা, বহু চোর-ডাকাত-বাঘকে দমন করেছেন। সুপ্রকাশ যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী, এই অন্ধকারে রাইফেল হাতে নিয়ে সে কোন্ যুদ্ধে যাবে?

বাঁশির চেঁচামেচিতে আরও তিন-চারজন এসে জুটলো। বল্লম, শাবল, লাঠি যে যা পারলো নিলো হাতে। সুপ্রকাশ বললো, ইউসুফ, বউদিকে দেখো,

আমরা আসছি।

ছোট দলটি নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেছে সুপ্রকাশ, রাকা আবার ঝড়ের মতন ছুটে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, না, তুমি যাবে না, যাবে না, কিছুতেই যেতে পারবে না।

কোনো কথা না বলে, একটা ঝটকায় রাকাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল সুপ্রকাশ।

॥ ৯ ॥

রায়পুর থেকে কোণ্ডাগাঁও, সেখান থেকে জিপে আরও ছাব্বিশ মাইল দূরে ঘোর জঙ্গলের মধ্যে চন্দ্রমৌলির আস্তানা। নিজের জন্য একটা একতলা কাঠের বাড়ি, কাছাকাছি আট-দশখানা তাঁবুতে থাকে তাঁর কাজের লোকজন, সারাদিনে কয়েকখানা ট্রাক যাতায়াত করে, সেই যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া অন্য সব সময় এখানে শুধু প্রকৃতির শব্দ। কাছেই একটা নামহীন নদী, বেশ চওড়া হলেও তাতে মাত্র হাঁটু জল, খুব বর্ষাতেও এক কোমরের বেশি হয় না, কিন্তু বেশ স্রোত আছে, তার জল এমনই স্বচ্ছ যে তলার পাথর-বালি পরিষ্কার দেখা যায়, ভালোভাবে, নজর দিলে চোখে পড়ে ছোট ছোট মাছেদের চঞ্চল খেলা।

এই জঙ্গলে প্রচুর বাঁশঝাড় আছে, আপনি আপনি জন্মায়, সরকারের কাছ থেকে সেই বাঁশঝাড় ইজারা নিয়েছেন চন্দ্রমৌলি, খদ্দের খুঁজতে হয় না তাঁকে, একটি কাগজের কলের সঙ্গে দশ বছরের চুক্তি আছে। এই কাজ পরিদর্শনের জন্য স্বয়ং জঙ্গলে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন ছিল না, অনেক দিনের ব্যবসা, একটা বাঁধা ছক হয়ে আছে, অন্য একজন সাব-কন্ট্রাক্টরের লোক বাঁশ কাটে, তারাই ট্রাকে ভর্তি করে নিয়ে যায়, চুরির বিশেষ সুযোগ নেই। কিন্তু চন্দ্রমৌলি জঙ্গলে থাকতেই ভালোবাসেন।

এখানে তাঁর পরনে খাঁকি হাফপ্যান্ট, খালি গা, মাথায় একটা টোকা। অত্যন্ত রোমশ শরীর, ইদানীং তাঁর বুকের রোমও পাকতে শুরু করেছে, কিন্তু বাহুর পেশী শিথিল হয়নি। তাঁর কোমরের বেল্টের সঙ্গে থাকে খাপে ঝোলানো একটা ছুরি, হাতে একটা লাঠি। জঙ্গলে একা একা ঘুরে তিনি ছোট ছোট গাছ পরীক্ষা করে দেখেন। সম্প্রতি কোনো পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মাথায় একটা নতুন ঝোঁক চেপেছে। বস্তারের এই জঙ্গলে নাকি মাঝে মাঝে চা গাছ, পাটগাছ দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বপন করেনি, বুনো চা,

বুনো পাট। আমেরিকায় কোথাও কোথাও যেমন দেখা যায় বুনো ধানগাছ। পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, পাট ও চা চাষ করতে অনেক যত্ন নিতে হয়, পোকামাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করতে হয় নানা রকম কীটনাশক রাসায়নিক। পাট-চা-ধান-গম ইত্যাদিরা মনুষ্যপালিত আদরের গাছ। কিন্তু নিবিড় জঙ্গলে এরা বাঁচে ও বৃদ্ধি পায় কোন্ শক্তিতে ?

চন্দ্রমৌলি কয়েকটা বুনো পাটগাছের সন্ধান পেয়েছেন, পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখেন তাতে কোনো পোকা লেগেছে কি না।

অবশ্য নিজের বাড়ি থেকে দূরে, জঙ্গলের মধ্যে একটানা বেশিক্ষণ থাকেন না চন্দ্রমৌলি, মাঝে মাঝেই ফিরে আসেন রাকার খোঁজ নিতে।

বড় গাছের ছায়ায় রাকা বসে আছে ইজিচেয়ারে, হাতে কোনো বই, কিন্তু পড়ায় মন নেই, সামনে চেয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টিতে। শীর্ণ হয়ে গেছে মুখখানি, নাকটা বেশি জেগে উঠেছে, চোখ দুটি যেন আরও গভীর, তাতে ক্লান্তির কাজল মাখানো। তার পাশের মোড়ার ওপর একটা প্লেটে দেড়খানা টোস্ট আর একটা ডিমসেদ্ধ পড়ে আছে।

চন্দ্রমৌলি কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিছুই খাসনি দেখছি ! আন্ডা সেদ্ধ ভালো লাগে না ? পোচ কিংবা ওমলেট বানিয়ে দেবে ?

রাকা বললো, না, এখন আর কিচ্ছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

চন্দ্রমৌলি বললেন, ওসব কথা শুনছি না। খেতেই হবে। যা ভালো লাগে তাই-ই খাবি। খাওয়া বাদ দিলে শরীরের তাগদ বাড়ে না তো বটেই, মনের জোরও কমে যায়।

রাকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অনেকক্ষণ বসে আছি। একটু হাঁটবো ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, আলবাৎ হাঁটবি। দৌড়বি ! নদীতে নেমে ঝাঁপাঝাঁপি করবি। চল আমার সঙ্গে। তোর কী হয়েছে, কিচ্ছু হয়নি !

গায়ের ব্লাউজটা আলগা হয়ে গেছে, রাকাকে এখন বেশ লম্বা দেখায়, সে হাঁটে খানিকটা টলটলে পায়ে।

নদীর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোষ, তার পিঠে বসা একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে, সে দু'পা দিয়ে জল ছুড়ছে।

রাকা বললো, ঠিক যেন একটা ছবি।

সেদিকে তাকিয়ে চন্দ্রমৌলি বললেন, হুঁ, তুই নতুন এসেছিস, তাই ছবিটা দেখতে পেলি। আমরা তো রোজই দেখি, তাই দেখতে পাই না।

রাকা জিজ্ঞেস করলো, নদীটার কোনো নাম দাওনি ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, এখানে কেউ বিশেষ নামের পরোয়া করে না। এত ছোট নদী, ম্যাপে নেই। ঠিক আছে, আজ থেকে এই নদীর নাম দিলাম 'রাকা'।

রাকা বললো, না। আমার নাম মানাবে না। আমার মায়ের নামে রাখো। সেবন্তী নদী। ভালো শোনাচ্ছে।

চন্দ্রমৌলি কোনো মন্তব্য করলেন না। আরও খানিকটা এগিয়ে বললেন, এই যে গুলমোর গাছটা দেখছিস, এই গাছে উঠে ময়ূরটা ধরেছিলাম। তোর সেই ময়ূরটার কথা মনে আছে? তুই তখন কত ছোট খুকি ছিলি, একটা পুতুলের মতন...

রাকা গাছটার চূড়ার দিকে তাকালো। সেই ময়ূরটা তাদের বর্ধমানের বাগান থেকে উড়তে উড়তে কি শেষ পর্যন্ত বস্তারে পৌঁছতে পেরেছিল? কত বছর বাঁচে ময়ূর? এখানে নানারকম পাখির কাকলির মধ্যে মাঝে মাঝে ময়ূরের কর্কশ ডাকও শোনা যায়!

হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে রাকা বললো, মৌলিকাকা...

আর কিছু বলতে পারলো না, হু হু করে কেঁপে উঠলো, চন্দ্রমৌলি তার মাথায় হাত রাখলেন।

সুপ্রকাশ চলে যাবার পর সাড়ে তিন বছর কেটে গেছে। বেশ তাড়াতাড়িই তো সামলে নিয়েছিল রাকা। ছ' মাসের মধ্যেই সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে লোকজনের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছিল।

পুরুষরা যা পারে, মেয়েরাও তা সবই পারে। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্র আছে যা নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা। অনেকক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ প্রতিযোগিতাতেই নামে না, সেখানে হার-জিতের প্রশ্নই নেই। মানুষের সভ্যতা যে পর্যন্ত এগিয়েছে, তাতে পেশীর শক্তির বদলে মগজ দিয়েই সমাজ পরিচালিত হবার কথা, কিন্তু এখনো অনেক জায়গায় বর্বরতা হিংস্র দাঁত বার করে আছে, সেখানে মেয়েরা অসহায়।

সুপ্রকাশ যে-ভাবে মাছের ভেড়িটা চালাতো, রাকা সব কাজ শিখে নিয়েছিল, সেও বুদ্ধি দিয়ে চালাতে পারতো, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। সাজ্জাদ হোসেনের মাত্র পাঁচ বছর জেল হয়েছে, তার আরও তিন ভাই আছে, তারা থানা-পুলিশ-জেলের পরোয়া করে না। ওখানে লাঠি-বল্লম-বন্দুকের খেলা চলতেই থাকবে! তাছাড়া, সুপ্রকাশের নিজের বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না, হঠাৎ কোথা থেকে তার এক ভাইপোর উদয় হলো, সুপ্রকাশের

সম্পত্তির ভাগ দাবি করে সে মামলা ঠুকে দিলো। শেষ পর্যন্ত ভেড়িটা বিক্রি করে দিলো রাকা।

তৃণীর তাকে নিয়ে এসেছিল বর্ধমানে। বছরখানেক বাদে তৃণীরই তাকে জোর করে পাঠিয়ে দিলো অক্সফোর্ড, সেখানে লেখাপড়া করলে রাকার মন সুস্থির হবে। হয়তো মন সুস্থিরই হচ্ছিল, কিন্তু শরীর মানলো না, মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে পড়তো, অথচ ডাক্তাররা কোনো রোগ ধরতে পারেন না। তাকে আবার দেশে ফেরত পাঠালো শিখা।

আমেরিকা থেকে একবার দেশে ফেরার পথে লন্ডনে একটা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য কয়েকদিন ছিল শিখা। রাকার সঙ্গেও সে দু-চারদিন কাটিয়ে গেল। পি. এইচ. ডি. হয়ে গেছে, এখন পোস্ট ডক্টরেট করছে একজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া অধ্যাপকের কাছে, তার দুটি পেপারের বেশ নাম হয়েছে। নিজের সম্পর্কে সে অনাবিল অহঙ্কারের সঙ্গে বলে, আমার নোবেল প্রাইজ পেতে আর কতটা বাকি আছে জানি না? ঠিক সাত শো পা। এখন গুনে গুনে, একটুও ভুল না করে ঐ সাত শো পা এগোতে পারবো কি না, সেইটাই বড় কথা!

নিজের যৌনজীবন সম্পর্কেও তার কোনো রাখাঢাকা নেই। বিয়ে সে করবেই না, পুরুষ তার কাছে খেলার বস্তু, সারাজীবনের সঙ্গী হবার যোগ্য নয়। কিছুদিন সে একটি স্প্যানীশ যুবকের সঙ্গে এক অ্যাপার্টমেন্টে সহবাস করতো, কিন্তু সে ছেলেটি প্রেমের ভূমিকায় খুব সার্থক হলেও টাকাপয়সার ব্যাপারে কৃপণ, শিখার টাকায় বাবুগিরি করতো বলে শিখা তাকে দূর করে দিয়েছে। এখন তার একজন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে, প্রায়ই দেখা হয়, কিন্তু ওরা একসঙ্গে থাকে না। শিখার মতে, রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কোনো পুরুষের সাহচর্য চমৎকার, কিন্তু বাকি রাতটা, ঘুমের সময়, নিছক একটি নিরেট পুরুষ শরীরের পাশে শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। একা খাটে শুলেই শিখার ভালো ঘুম হয়।

শিখার সামনেই একবার অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল রাকা। রাকার অসুস্থতার বিবরণ শুনে শিখা চটে আগুন। এই অবস্থায় কেউ বিদেশে পড়ে থাকে? সে বলেছিল, রাকা, তোর মতন বোকা তো আমি দিখিনি! তুই এখানে একদিন বেঘোরে মরবি, ঘরের মধ্যে তোর শরীরটা পচে-গলে গেলেও কেউ টের পাবে না! একা কোনো মেয়ে, সে যদি অসুস্থ হয়, তার মতন অসহায় আর কেউ নেই। এদেশে কেউ তোকে সাহায্য করতে আসবে না। কোনো মেয়ে,

সে যতই রূপসী আর গুণবতী হোক, যদি দিনের পর দিন অসুস্থ হয়ে থাকে, তবে তার সব প্রেমিক তাকে ছেড়ে পালাবে! নেহাত মা-বাবা, দাদা-দিদির মতন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া, অন্য কোনো পুরুষ অসুস্থ মেয়েদের সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব নিতে চায় না, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানি। শরীর, রাকা, শরীর, এই পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের শরীরটাই প্রধান আকর্ষণ, শরীরটা কিছুদিনের জন্য অব্যবহার্য হয়ে গেলেই পুরুষদের আগ্রহ কমে যায়! শিগগির দেশে ফিরে যা, তোর দাদা কিংবা দিদিদের কাছে গিয়ে থাক, রোগটা সারিয়ে নে। যতদূর মনে হচ্ছে তোর রোগটা সাইকো সোমাটিক, একলা থাকলে দিন দিন বাড়বে। তাছাড়া তোর একটা স্বাভবিক সেক্স লাইফ দরকার। ধরে নিচ্ছি তোর স্বামী সুপ্রকাশ খুব চমৎকার মানুষ ছিল, কিন্তু সে যখন চলেই গেছে, তখন তুই বাকি জীবনটা নষ্ট করবি নাকি? সেটা হবে চূড়ান্ত বোকামি! একটাই তো জীবন রে, রাকা!

গায়ে খানিকটা বিলিতি পালিশ লেগেছে বলে দেশে ফিরে সহজেই লোরেটো কলেজে একটা চাকরি পেয়ে গেল রাকা। কলকাতায় তার থাকার একটা সমস্যা হয়েছিল, চন্দননগর থেকে যাতায়াত করতো, এর মধ্যে দেবিকা আর সুরঞ্জন বদলি হয়ে এলো কলকাতায়, আলিপুরে তাদের মস্ত বড় ফ্ল্যাট। দেশে ফিরে, নিকটজনের কাছাকাছি থেকে সত্যিই কমে গেল অসুখটা। তার কলেজের বন্ধুরা, যারা এখনো বিয়ে করেনি, এমন কী বিবাহিত দু-একজনও তার খোঁজ পেয়ে যোগাযোগ শুরু করলো। স্বামী নেই, নিদষ্টি কোনো প্রেমিক নেই এমন নারীদের অনেক পুরুষই সুলভ মনে করে, নানা পার্টিতে রাকার ডাক পড়ে, রাকা সব বার প্রত্যাখ্যান করে না, কারুর দিকে বিশেষ ঝোঁকেও না। শিখার মতন খিদে মেটাবার জন্য সেক্স চাই বলেই কোনো একজন পুরুষকে কাছে ডাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়, শুধু আড্ডা আর গান-বাজনার আসরে গিয়ে তার ভালোই চলে যাচ্ছিল। আবার হঠাৎ, সুপ্রকাশ চলে যাবার তিন বছর পর, রাকা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লো।

প্রথমদিকে প্রকৃতপক্ষে তেমন শোক করেনি রাকা, সে মেনে নিতে চাইছিল বাস্তবতা, কিন্তু সুপ্রকাশের জন্য তার ভালোবাসা এতদিন পরে একটা কান্নার ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইলো, অথচ বেরুতে পারে না। এবারে শয্যা নিতে হলো রাকাকে। শোকের সঙ্গে যোগ হলো অপরাধবোধ। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটার কথা যখনই মনে পড়ে, রাকা ভাবে, সেদিন সে সুপ্রকাশকে জোর করে কলকাতায় নিয়ে না গেলে হয়তো ওসব কিছুই ঘটতো না। সুপ্রকাশের

মৃত্যুর জন্য কি সে-ই তবে দায়ী ? না খেয়ে খেয়ে আধখানা হয়ে গেল রাকার শরীর। শিখার কথাগুলো আবার সত্যি বলে প্রমাণিত হলো, কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর তার পুরুষ বন্ধুরা আর কেউ খোঁজ নিতে আসে না।

এলেন শুধু চন্দ্রমৌলি। সুপ্রকাশের চলে যাবার খবর কিছুটা দেরিতে পেয়েও সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমৌলি ছুটে এসেছিলেন। রাকার তখন বুকভরা কান্না ও অভিমানের বাষ্প। চন্দ্রমৌলিকে দেখেই তার রাগ হয়েছিল, যুক্তিহীনভাবে মনে হয়েছিল, চন্দ্রমৌলি কেন আরও দু' চারদিন থেকে গেলেন না, তা হলে তিনিই বাঁচাতে পারতেন সুপ্রকাশকে। রাকা সেবার চন্দ্রমৌলির সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। চন্দ্রমৌলি চলে গিয়েছিলেন ভেড়িতে, প্রতিশোধ নেবার জন্য সাজ্জাদকে খুঁজছিলেন, কিন্তু সাজ্জাদ তখন পলাতক। চন্দ্রমৌলি সত্যেন সরকারকে ধরে পুলিশের ওপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাজ্জাদকে জেলে ভরিয়েছিলেন, নিজের হাতে তাকে শাস্তি দিতে না পারলেও এইটুকুই ছিল তাঁর সান্ত্বনা।

আবার রাকার চরম অসুখের খবর শুনে তিনি চলে এলেন। রাকার বিছানার পাশে বসে বললেন, তুই কী ভেবেছিস, খুকি ? আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইলেও আমরা ছেড়ে দেবো ?

রাকা বালিশ থেকে মাথা তুলে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি সুপ্রকাশকে পছন্দ করতে না। সে চলে যাওয়ায় তুমি খুশি হয়েছো, তাই না !

এতদিনে রাকা নিশ্চিত বুঝেছে যে, তার আর সুপ্রকাশের মাঝখানে চন্দ্রমৌলির অদৃশ্য ছায়াটা অনড় হয়ে ছিল, সেই ছায়াটাকে চুরমার করতে গিয়েই সুপ্রকাশ গোঁয়ারের মতন মৃত্যুর দিকে চলে গেল। রাকার চোখে সুপ্রকাশ নিজেকে চন্দ্রমৌলির চেয়েও বেশি সাহসী ও শক্তিশালী প্রমাণ করতে চেয়েছিল !

চন্দ্রমৌলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সেদিন সুপ্রকাশের পাশে দাঁড়িয়ে তুই একটাও কথা বলিসনি, আমাকে একবারও থাকতে বলিসনি, সেদিন তুই আমাকে যে আঘাত দিয়েছিলি, তার চেয়ে বেশি আঘাত আর কোনোদিন দিতে পারবি না। তোর যা খুশি বল। বলে বুক খালি করে নে।

রাকা বলেছিল, তুমি কেন বার বার আমার কাছে আসো ? তুমি তো আমার কেউ নয় !

চন্দ্রমৌলি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তোর কেউ নই। তবু আমি আসবো।

এবারের অসুস্থ অবস্থায় রাকা প্রত্যেকদিন চন্দ্রমৌলির কথাই বেশি ভেবেছে,

চন্দ্রমৌলির ওপর তার প্রচণ্ড রাগ আর অভিমান, তবু প্রতীক্ষা করতো, কবে আসবে সেই প্রকাণ্ড মানুষটি। তাকে ঘা দিতে হবে! তার ছায়াটা সরাতে হবে!

চন্দ্রমৌলি রাকার চিকিৎসার সমস্ত খোঁজখবর নিলেন, নতুন করে স্পেশালিস্ট দেখালেন, মোটামুটি জানা গেল যে, রাকার অসুখটা যত না শারীরিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক, আদর-যত্ন-সান্ত্বনাই এর চিকিৎসা। দেবিকা তিনটি সন্তান দিয়ে ব্যতিবস্ত, তূণীরের স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, কে রাকার সেবা করবে? কোনো বাধা, এমন কী রাকারও তীব্র আপত্তি চন্দ্রমৌলি গ্রাহ্য করলেন না, এক রকম জোর করেই রাকাকে তিনি নিয়ে এলেন জঙ্গলে।

সাত-আট দিনেই অনেকটা উন্নতি হয়েছে রাকার। এখন সে আর সব সময় শুয়ে থাকে না। নিজে নিজে হাঁটে, পাখির ডাক শোনে। খাওয়া সম্পর্কে বিতৃষ্ণা একটু একটু করে কাটছে, চন্দ্রমৌলি তাকে জোর করে কিছু না কিছু খাওয়াবেনই। চন্দ্রমৌলির সঙ্গে রাকার ঝগড়ার ঝাঁঝটাও কমে আসছে।

সেমুরিয়া নামে একটি মুরিয়া মেয়ে এখানকার গৃহস্থালি সামলায়। সে চন্দ্রমৌলির বর্তমান উপপত্নী কি না তা রাকা এখনো বুঝতে পারেনি। তার ভাষা একেবারেই বোধগম্য নয়। সেমুরিয়া থাকে আলাদা তাঁবুতে।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন চন্দ্রমৌলি বললেন, এই যে মোষের পিঠের মতন বড় পাথরটা দেখছিস, তোর মা এখানে এসে বসে থাকতেন। এখানে বসলে নদীর স্রোতের একটা ঝিরঝিরে শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

রাকা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো সেবন্তীকে। তার জন্মের আগেকার মা।

সেখানে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে রাকা জিজ্ঞেস করলো, আমার মা এখানে কতবার এসেছিলেন?

চন্দ্রমৌলি বললেন, মাত্র একবারই।

রাকা জিজ্ঞেস করলো, আর কেন আসেননি?

চন্দ্রমৌলি বললেন, কী জানি! সকলের তো আর জঙ্গল ভালো লাগে না!

রাকা বললো, তুমি কেন আমাকে আগে এখানে আসতে বলোনি? তুমি এতবার কলকাতায় গেছো, একবারও কেন আমাকে, ছোড়দাকে বা দিদিদের সঙ্গে করে আনোনি?

চন্দ্রমৌলি খানিকটা উদাসীন স্বরে বললেন, তোর মা বোধহয় পছন্দ করতেন না।

—কেন পছন্দ করতেন না?

—কী করে জানবো ! তোর মাকে বোঝ' কি সহজ কথা

—আমার না জন্মানোই উচিত ছিল, তাই না ?

—ছি ছি, এ কী কথা বলছিস, রাকা ! মানুষের জন্ম পাওয়াটা কত বড় ভাগ্যের কথা। না-জন্মানো মানে তো কিছুই না হওয়া। জন্মাবার পর দুঃখ কষ্ট পাওয়াতো একটা পাওয়া, না জন্মালে, কিংবা হঠাৎ মরে গেলে যে সব কিছুই না পাওয়া হয়ে যায় !

—মৌলিকাকা, আমি কি মায়ের মতন হয়ে যাচ্ছি ? আস্তে আস্তে পাগলামির দিকে চলে যাবো ? মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে 'আমিও মায়ের মতন

—ওসব কী অলুক্ষুণে কথা ! তোর মাকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু তোকে আমি কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেবো না !

—কেন আমার মাকে বাঁচাবার ক্ষমতা তোমার ছিল না ?

—তোর যত কাছাকাছি যেতে পারি, ততটা কি তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল ? তোর মা...ওঃ ওঃ, তোকে কি বলবো, শুধু নিজে কষ্ট পায়নি, আমাকেও শেষ করে দিয়ে গেছে !

রাকা থমকে দাঁড়ালো। চন্দ্রমৌলির একটা হাত ধরে খর কণ্ঠে বললো, তুমি তাকাও আমার দিকে। মৌলিকাকা, সেবারে আমাদের ভেড়িতে বড় দিঘিটার ধারে বসে তুমি আমাকে যা বলেছিলে, তার অনেকটাই মিথ্যে, তাই না ? আমি ঠিক জানতাম

চন্দ্রমৌলি কম্পিত আবেগের সঙ্গে বললেন, রাকা, সেদিন তোকে যা বলেছি, তার একটা বর্ণও মিথ্যে নয়। তোর কাছে কি আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি ? তবে সবটা বলিনি !

রাকা অধীরভাবে বললো, তা হলে এখন বলো, বলো, সবটা বলো !

অনেকদিন আগে, রাকার তখনও জন্ম হয়নি, দেবিকা আর তূণীর এই দুই ছেলেমেয়ের জননী ছিলেন সেবন্তী, আর তৃতীয় সন্তানের বাসনা ওঁদের ছিল না। সেবন্তী তখন বেশ তরুণী তন্বী, স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন স্বামীর বন্ধুর কাছে। ছেলেমেয়ে দুটিকে রেখে এসেছিলেন চন্দননগরে, দেবিকা আর তূণীর দু'জনেই দিদিমার খুব ভক্ত ছিল, দিদিমার কাছে থাকলে খুশি হতো।

সেইসময় কোণ্ডাগাঁওতে একটা ভাড়া বাড়ি ছিল চন্দ্রমৌলির, তিনি বিপত্নীক, ছেলে সুকান্ত থাকে রায়পুরের স্কুল-হস্টেলে। সোমনাথ আর সেবন্তীকে একটা জিপে করে নানান জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান চন্দ্রমৌলি, এই জঙ্গলের মধ্যে তখন কাঠের বাংলোটা ছিল না, ছিল কয়েকটা তাঁবু। শিকারের ব্যাপারে

সেসময় তেমন বিধিনিষেধ ছিল না, বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে জঙ্গলে এনে চন্দ্রমৌলি প্রায় ওঁদের চোখের সামনেই একটা হরিণ শিকার করলেন, কুলি-কামিনরা কাঠের আগুন জ্বেলে সেখানেই চামড়া ছাড়িয়ে মাংস ঝলসে দিলো। সেবন্তী বললেন, ইস, এই জঙ্গলের মধ্যেই যদি কয়েকটা দিন থেকে যাওয়া যেত! কাছেই এত সুন্দর একটা নদী...

সুন্দরী বন্ধুপত্নীর অভিপ্রায়কে সম্মান জানাবার জন্য পরদিনই সেখানে খাটানো হলো আর দুটি বড় তাঁবু, সুইস কটেজ ধরনের। সোমনাথ অবশ্য এতটা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় নন, পোকা-মাকড়ের ভয়ে বিব্রত, জঙ্গলের ছবি দেখতেই তাঁর ভালো লাগে, কিন্তু সভ্য মানুষের বাসযোগ্য নয়। সেবন্তীর বাসনায় অবশ্য তিনি বাধা দেন না। সেবন্তীর মুগ্ধতা ও খুশির চাঞ্চল্য দেখলে তিনি খুশি হন, কিন্তু 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে', এই গান মনে পড়ায় মাঝরাত্তিরে পানাহারের অনেক পরে যখন সেবন্তীর হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্না দেখার শখ হয়, তখন সোমনাথ ঘুম-কাতুরে হয়ে পড়েন।

সেবন্তীর স্বামী সূক্ষ্মরুচির খাঁটি একজন মানুষ, সেবন্তীকে তিনি ভালোবাসা ও সম্মান সবই দিয়েছেন এবং সেবন্তীর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেবন্তীও সেই বিশ্বাসের যোগ্য, কোনোদিন তিনি তাঁর স্বামীকে ফাঁকি দেননি। স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে গভীর রাতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার রোমাঞ্চ উপভোগ করতে দোষের কী আছে? চন্দ্রমৌলি সোমনাথের খাঁটি বন্ধু, তাঁর ব্যবহারে সব সময় সহাস্য সৌজন্য প্রকাশ পেয়েছে, কোনো রকম নীচতা নেই তাঁর চরিত্রে।

দুই বন্ধুই সমবয়েসী, তবু সোমনাথ যেন একটু আগেই স্বেচ্ছায় প্রৌঢ়ত্বকে বরণ করে নিয়েছেন, তাঁর পেশার জন্যই হয়তো, কোনো রকম হঠকারিতা তাঁর চরিত্রে মানায় না, প্রথাগত পোশাক ছাড়া বেশি রঙিন বা চক্রাবক্রা জামা-কাপড় পরার কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। আর চন্দ্রমৌলির শরীরে বেশি যৌবন, সত্যিকারের পুরুষোচিত পুরুষ, খাঁকি প্যান্টের সঙ্গে গেঞ্জি পরে থাকেন, সব সময় কোমরের বেল্টে থাকে ছোরা, কখনো কখনো কাঁধে ঝোলানো রাইফেল, তাঁর চোখ ও কান সদা সতর্ক, অথচ তাঁর ব্যবহার রুক্ষ নয়, তিনি নিয়মিত পড়াশুনো করেন, বহু বিষয়ে তাঁর আগ্রহ আছে।

কোণ্ডাগাঁও-এর বাড়ির তুলনায় জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে থাকার সময় চন্দ্রমৌলির ব্যবহারের অনেকটা বদল হয়, সেটা বুঝতে পারেন সেবন্তী। গাছ-কাটার ব্যবসা করেন যে মানুষটি, গাছ-পালার প্রতি তাঁর একটা তীব্র ভালোবাসাও আছে। নিজের হাতে গাছের চারা পোঁতেন, জল দেন, অল্প

বয়েসী গাছের পাতায় হাত বুলিয়ে আদর করেন, কেউ কোনো গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লে চটে যান। তার প্যান্টের পকেটে থাকে রামের পাঁইট, সন্ধের পর তার থেকে একটু একটু চুমুক দেন, সোমনাথ কখনো মদ্য স্পর্শ করেন না, কিন্তু কৌতুকের ছন্দে চন্দ্রমৌলি সেবন্তীকে একটুখানি জিন খাইয়ে দিয়েছিলেন লেবুর সরবতের সঙ্গে।

রাত সাড়ে বারোটার সময় নামহীন নদীটির জলে জ্যোৎস্নার খেলা দেখতে এসেছিলেন সেবন্তী, একটু একটু ভয়ে শরীরে খানিকটা শীত শীত ভাব, অথচ সেবন্তী জানেন চন্দ্রমৌলি পাশে থাকলে ভয়ের কিছু নেই। অন্ধকারের চেয়েও জ্যোৎস্না মাখা অরণ্য যেন আরও রহস্যময়, বারবার মনে হয়, কিছু যেন দেখা যাচ্ছে, কেউ যেন আসছে।

বড় পাথরটায় হেলান দিয়ে বসেছেন সেবন্তী, গান গাইছেন নিচু গলায়, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রমৌলি, মাঝে মাঝে গানে তিনি গলা মেলাচ্ছেন, এক একবার গলায় ঢালছেন নির্জলা রাম। এক সময় গলা থামিয়ে সেবন্তী বললেন, আঃ, কী ভালো লাগছে!

চন্দ্রমৌলি রামের বোতলটা নিঃশেষ করে ছুঁড়ে দিলেন নদীর জলে, তাঁর মতিভ্রম হলো, তিনি পাশ ফিরে দুই করতলে ধরলেন সেবন্তীর মুখখানি। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হলেও সেবন্তী সরে গেলেন না, তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে, দু'জনের দৃষ্টিতে সেই আলো আঁধারিতে এক সেতুর নির্মাণ হতে লাগলো, যেন সুদীর্ঘকাল সেই চেয়ে থাকা।

তারপরই চন্দ্রমৌলি সেবন্তীকে টেনে তুলে বুকে চেপে ধরে পাগলের মতন ছটফটিয়ে বললেন, তুমি কী সুন্দর, তোমাকে আমি একবার

চুম্বনের জন্য চন্দ্রমৌলি ওষ্ঠ এগিয়ে আনলেন, তখন সেবন্তী খুবই কোমল ও দৃঢ় স্বরে বললেন, না!

চন্দ্রমৌলি সেই না শুনেও বিশ্বাস করলেন না। একটা হাত আনলেন সেবন্তীর কাঁধের কাছে।

সেবন্তী হু হু করে করে কেঁদে বলে উঠলেন, না, না, আমি পারবো না, প্লীজ, আমাকে ক্ষমা করুন।

মুখের কথার চেয়েও সেই কান্না অনেক তীব্র নিষেধ। চন্দ্রমৌলি যেন একটা রূঢ় ধাক্কা খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেবন্তীকে ছেড়ে দিয়ে সরে এসে চোখ বুজলেন, মুখটা কুঁকড়ে গেল, তিনি বললেন, ছি, ছি, আমি নেশার ঝোঁকে...তুমি আমায় ক্ষমা করো, হঠাৎ মাথার ঠিক ছিল না...

পরদিন সকালবেলা একটু নিভৃতিতে আবার প্রভূত ক্ষমা চাইলেন চন্দ্রমৌলি। সেবন্তীর সঙ্গে তাঁর কতদিনের চেনা, আগে কক্ষনো তাঁর এমন মাথা খারাপ হয়নি। সোমনাথের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। লজ্জায় চন্দ্রমৌলি আর সেবন্তীর সঙ্গে ব্যবহারে স্বাভাবিক হতে পারছেন না। সেবন্তী রাগ করেননি, তিনি আগেকার মতন হাসিঠাট্টা করছেন, কিন্তু চন্দ্রমৌলি আর সেবন্তীর কাছাকাছি কখনো একা থাকেন না।

দু' দিন পর সোমনাথের ধূম জ্বর এলো। ব্যস্ত হয়ে সবাই ফিরে এলেন শহরে, সেখান থেকে কলকাতায়। সোমনাথ-সেবন্তী আর কখনো এই জঙ্গলে আসেননি।

রাকা জিজ্ঞেস করলো, ব্যাস, এইটুকুই ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, না, আর একটু আছে। সেটুকু না হয় থাক, রাকা কতদিন আগেকার কথা।

রাকা বললো, না, আমি বাকিটুকুও শুনতে চাই !

চন্দ্রমৌলি তবু ইতস্তত করে বললেন, তুই হয়তো সহ্য করতে পারবি না। তোর শরীর দুর্বল।

রাকা বললো, কেন সহ্য করতে পারবো না। যা সত্যি, তা মেনে নিতেই হয় !

চন্দ্রমৌলি বললেন, তোকে বিশ্বাস করতেই হবে যে, আমি যা বলছি, তার প্রতিটি বর্ণ সত্যি।

সোমনাথের জ্বর হয়ে যাওয়ায় চন্দ্রমৌলি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু সেবন্তীর এত তাড়াতাড়ি জঙ্গল থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সাধারণ জ্বর, তাতে এত চিন্তার কী আছে। একটু অনিয়ম করলেই সোমনাথের জ্বর হয়। ওষুধও সঙ্গে আছে। কিন্তু চন্দ্রমৌলি তা মানতে চাইলেন না। জঙ্গলে জ্বর এলে নানা রকম কুলক্ষণ হতে পারে। ডাক্তার দেখানো দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। শহর থেকে গাড়ি আনার জন্য লোক গেছে।

সেবন্তী শেষবারের মতন স্নান করতে গেলেন নদীতে। অন্যদিন চন্দ্রমৌলি তার সঙ্গে যান, আজ গেলেন না। নদীতে জল নেই বেশি, ভয়ের কিছু নেই। একটু পরেই বৃষ্টি নামলো। দারুণ বৃষ্টি। বৃষ্টিতে এখানকার নদীতে ক্ষ্যাপামি আসে, ঝোড়ো হাওয়াও বইছে সঙ্গে।

ভোরি নামে একটি মেয়েকে পাঠানো হলো সেবন্তীকে ডেকে আনার জন্য। ভোরি এসে জানালো, মাইজী আসতে চাইছেন না, আরও থাকবেন

বলছেন। সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে চন্দ্রমৌলিকে বললেন, তুমি যাও, তুমি ওকে নিয়ে এসো !

চন্দ্রমৌলি গিয়ে দেখলেন, বৃষ্টি-মেশা নদীতে মাঝখানে নেমে সেবন্তী বালিকার মতন ছুটোছুটি করছেন। চন্দ্রমৌলিকে দেখে তিনি দুষ্টুমির হাসি দিলেন। তিনি জানতেন, চন্দ্রমৌলিকে আসতেই হবে। চন্দ্রমৌলি হাঁক দিলেন। উঠে এসো সেবন্তী ! সেবন্তী দু' দিকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সরে যেতে লাগলেন আরও দূরে, এক জায়গাই ইচ্ছে করে কিংবা সত্যিই একটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন, আর উঠে দাঁড়ালেন না।

চন্দ্রমৌলি জুতো সুদ্ধু পায়ে ছুটে গেলেন জলের মধ্যে, একটু একটু স্রোতের টান রয়েছে, তবে সেবন্তীর ভেসে যাবার ভয় নেই, চন্দ্রমৌলি সেবন্তীর হাতটা ধরতেই বুঝলেন, এ সবই কৌতুক।

চন্দ্রমৌলি বললেন, এত বৃষ্টির মধ্যে...অসুখ করে যাবে যে !

সেবন্তী হাসতে হাসতে বললেন, আর আপনি যে এত বৃষ্টিতে ভেজেন ! আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, তাই না ?

চন্দ্রমৌলি বললেন, না, না। রাগ করবো কেন ? আমিই তো

সেবন্তী বললেন, হ্যাঁ রাগ করেছেন। আর আমার সঙ্গে ভালো ভাবে কথা বলেন না। আমি কিন্তু সেদিন...মানে হঠাৎ...

সম্পূর্ণ ভিজে বসনে সেবন্তী চন্দ্রমৌলির বক্ষলগ্না হলেন। তাঁদের দু'জনকে ঘিরে আছে বৃষ্টির পর্দা। নদীটা সেখানে বাঁক নিয়েছে, তীর থেকে কেউ দেখতে পাবে না। চন্দ্রমৌলির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন সেবন্তী, দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছেন কাঁধ, তাঁর চোখ ও ওষ্ঠদুটো ব্যাকুল। আজ তিনি নিজেই চাইছেন, সেদিনের রাতের ক্ষতিপূরণ। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না রাতে ছিল মাদকতা, চন্দ্রমৌলির মস্তিষ্কে ছিল নেশা, এখন এই দিনের বেলায় সেরকম কিছু জাগলো না, বরং তিনি সন্ত্রস্ত হলেন। কিন্তু বৃষ্টিতে মেয়েদের নেশা হয়, নদীর স্রোত মেয়েদের শরীরেও তরঙ্গ জাগাতে পারে, সেবন্তী ভুলে গেলেন তিনি দুটি সন্তানের জননী, ভুলে গেলেন তিনি সোমনাথের স্ত্রী, তিনি যেন চিরকালের এক নারী, তাঁর সামনে এক প্রার্থিত পুরুষ। যে-কোনো নারী, যে-কোনো পুরুষেরই এরকম বাস্তবতা-বিস্মৃতি ঘটতেই তো পারে, মানুষ মাঝে মাঝে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বলেই তো জীবন এত বর্ণময়। প্রকৃতিও এরকমই চায়।

কিন্তু দু'জনের বিস্মৃতি মিললো না। চন্দ্রমৌলির মনে হলো, সেবন্তী

ছেলেমানুষী ভুল করতে যাচ্ছেন যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হবে, সোমনাথ অপেক্ষা করছেন, এক্ষুনি শহরে যাবার গাড়ি আসবে। তিনি নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, না।

আগের রাতে চন্দ্রমৌলি আঘাত পাননি, নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এদিন দুপুরে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে সেবন্তী অপমানে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে...

জীবনে সেই প্রথম ও শেষবার চন্দ্রমৌলিকে তুমি বলে সম্বোধন করেছিলেন সেবন্তী।

চন্দ্রমৌলি চাপা ভর্ৎসনায় বললেন, চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সোমনাথের জ্বর বেড়েছে।

মুখ নিচু করে সেবন্তী উঠে এলেন নদী থেকে। আর কিছুই ঘটেনি।

রাকা শব্দ করে হেসে উঠে বললো, শুধু এই! মৌলিকাকা, তুমি ভেবেছিলে, এটা আমি শুনলে সহ্য করতে পারবো না? তোমাদের জেনারেশানে এত সেন্টিমেন্টাল ছিলে? একটা-আধটা চুমুতে কী আসে যায়? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত! আমার মা এ রকম কিছু করেছেন শুনলে কি আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম? ওই রকম পরিবেশে যদি খানিকটা দুর্বলতা এসেই পড়ে, সেটা এমন কিছু অমার্জনীয় অপরাধ নয়! এবারে সত্যি করে বলো তো এইখানেই শেষ? আর কিছু লুকিয়ে রাখছো না?

একদিন যে-পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন সেবন্তী, আজ সেখানেই বসে আছে রাকা। উনত্রিশ বছর পর। এতদিনেও চন্দ্রমৌলির যেন বিশেষ কিছু বদল হয়নি। তিনি এক দৃষ্টিতে রাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, আর কিছু ঘটেনি। তারপর থেকে আমাদের সম্পর্ক...আমরা কেউ কারুকে ছুঁইনি, যেমন স্বাভাবিক ছিল...

রাকা জিজ্ঞেস করলো, কই, আমার মা তো স্বাভাবিক হননি। আমার জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখছি, মা মাঝে মাঝেই কেমন যেন হয়ে যেতেন! সেটা কেন হতো?

চন্দ্রমৌলি ব্যাকুলভাবে বললেন, সে জন্য আমি দায়ি নই! আমি দায়ি নই। তুই বিশ্বাস কর! সবটাই তোর মায়ের মনের ভুল। আমি তাঁকে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছি...

রাকা তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, মনের ভুলটা কী ছিল? আমার জন্মটাই ভুল ছিল?

চন্দ্রমৌলি বললেন, ওঁরা এখান থেকে ফিরে গেলেন তার এক বছরের মধ্যেই তোর জন্ম হলো। তোর মা আমাকে চিঠি লিখলেন, সে চিঠি আমি এখনো রেখে দিয়েছি। তোর মায়ের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, আমিই তোর...আই স্যোয়ার অন গড, আমি তাঁর কাঁধ ও হাত ধরা ছাড়া আর কোনোভাবেই আমি তাঁকে কখনো স্পর্শ করিনি! কোনোদিন না! তোকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে!

—স্পর্শ করোনি, কিন্তু চেয়েছিলে!

—তাতে সন্তানের জন্ম হয় না। ইমাকুলেট কনসেপশনের মতন ব্যাপার আবার হয় নাকি?

চন্দ্রমৌলি আর সেবন্তী দু' জনেই দু' জনকে না বলেছিলেন এটা যেমন সত্যি, তেমনি দু' জনেই দু' জনকে চেয়েছিলেন, সেটা প্রবল সত্যি। কোন সত্যিটা বেশি জোরালো?

রাকা বললো, তোমরা দু' জনে দু' জনকে ভালো বেসেছিলে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, হ্যাঁ, আমি সেবন্তীকে ভালোবাসতাম। কিন্তু দূর থেকে। আর তার কাছে যাইনি।

রাকা বললো, তোমার সঙ্গে আমার রক্ত মাংসের সম্পর্ক না থাকলেও আমি তোমার ভালোবাসার সন্তান।

চন্দ্রমৌলি বললেন, সেবন্তীর সেটাই বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুই এত লেখাপড়া শিখেছিস, তুই নিশ্চয়ই মানবি যে

—না মানার কী আছে? দুটোই তো সত্যি। আমাকে নিয়ে মা ভয় পেতেন যে বাবা একদিন বুঝে ফেলবেন, তিনি আমার আসল বাবা নন!

—ভয় পাবারই বা কী আছে? সোমনাথই তোর বাবা, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই!

—কোনটা আসল, তা কী জোর দিয়ে বলা যায়!

—রাকা, প্লীজ, তুইও এমন কথা বলিস না। আমি তোর কেউ না!

—আচ্ছা মৌলিকাকা, আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো! তোমরা সত্যিই রোমান্টিক ছিলে? ভালোবাসার সঙ্গে শরীরের সম্পর্কে বিশ্বাস করতে না!

—তুই এখন বড় হয়েছিস। বলতে বাধা নেই। আমার লিবিডো অতি প্রবল। নারীসঙ্গ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। আমার স্ত্রী চলে যাবার পর আমি ব্রহ্মচারী হয়ে থাকিনি। ইন্দ্রিয়ের দরজা-জানলা বন্ধ করে যোগাসন করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যভিচার

করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয়! এখানকার একাধিক আদিবাসী রমণীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে। ওরা আমাকে ভালোবাসে। আমি মুরিয়া ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক টাকাপয়সা খরচ করেছি। ওদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখা, জামা-কাপড়, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। আবার যে-মেয়েটিকে আমার ভালো লেগেছে, তার সঙ্গে আমার শুতেও ইচ্ছে করেছে। এ জন্য অনেকে ঘেন্না করেছে আমাকে। আমি গ্রাহ্য করিনি। আমার ছেলে ঘেন্নায় আর আমার কাছে আসতে চায়নি। আমি চেয়েছিলাম, সেবন্তীও আমাকে ঘেন্না করুক...

—তোমাকে নিয়ে মায়ের অনেক গর্ব ছিল। বাচ্চা বয়েসে মায়ের কাছে তোমার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছি

—কিন্তু আমাকে দেখলেই কী রকম যেন হয়ে যেতেন। তুই লক্ষ করিসনি, আমি তোদের ওখানে গেলেই সেবন্তীর মধ্যে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিত। সেই জন্যেই তো আমি বেশি যেতাম না। তোর জন্মের পর ছ' সাত বছর যাইনি ইচ্ছে করে। ভেবেছিলাম, সেবন্তী এর মধ্যে সব ভুলে যাবেন। সোমনাথ চিঠি লিখে প্রায়ই ডাক পাঠাতো, তার ডাক প্রত্যাখ্যান করা যায় না, অথচ...। ওঃ, সারাজীবন আমাকে কষ্ট পেতে হয়েছে, রাকা! সুকান্তকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম যেবার আমি গেলাম, তুই খুব ছোট, তোর মনে থাকবার কথা নয়, সেবারে সেবন্তী একটু আড়াল পেয়েই আমাকে অভিযোগ করেছিলেন, আপনার মেয়েকে আপনি এতদিনে একবার চোখের দেখা দেখতেও আসেননি! আপনি এত নিষ্ঠুর! এ কী অসম্ভব কথা! আমি তোর বাবা নই, কেউ নই রাকা, তবু তোর মা দৃঢ় বিশ্বাস করে বসেছিলেন...

রাকা উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গিয়ে নদীর সামনে ঝুঁকে এক আঁজলা জল তুলে ছেটালো চোখে মুখে। তার বুকের মধ্যে কিসের যেন মাতামাতি চলছে, অথচ তার মন প্রশান্ত, সে যদি সেবন্তী আর চন্দ্রমৌলির অবৈধ সম্পর্কের সন্তান হতো, সে কথা জানলেও সে বিচলিত হতো না, রক্তের বন্ধন একটা কুসংস্কার, যিনি পালন করেন তিনিই পিতা, সোমনাথই তার বাবা, বাবার কাছ থেকে সে কত স্নেহ-আদর-প্রশ্রয় পেয়েছে

মায়ের শেষদিনের মুখখানা মনে পড়তেই তার বুক ফেটে বেরিয়ে এলো প্লাবন।

সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললো, এসব কথা আমাকে আগে বলোনি কেন? তাহলে মাকে আমি বাঁচাতে পারতাম!

ছুটে এসে সে চন্দ্রমৌলির বুকে কিল মারতে মারতে বলতে লাগলো, কেন বলোনি, কেন ? কেন ? কেন ? মা আমাকে ভয় পেতো, কিন্তু মাকে আমি এতো ভালোবাসতাম...তোমার জন্য, তোমার জন্য মা চলে গেছে, তোমার জন্যই সুপ্রকাশ চলে গেল, তুমি আমার সর্বনাশ করেছো

শুধু কিল না, চন্দ্রমৌলির মুখ খিমচে রক্ত বার করে দিলো রাকা, তবু চন্দ্রমৌলি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মূর্তির মতন।

এরপর পুরো একটা দিন চন্দ্রমৌলির সঙ্গে আর একটাও কথা বললো না রাকা। শুয়ে রইলো নিজের ঘরে। চন্দ্রমৌলিও কাছ ঘেঁষলেন না, সেমুরিয়াকে পাঠাতে লাগলেন রাকাকে জোর করে খাওয়াবার জন্য। সেমুরিয়া বিশেষ কথা বলে না, কিন্তু সে যত্ন করতে জানে ! রাকার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সে গভীর টলটলে দুটি চোখে তাকিয়ে থাকে, তাকে ফেরানো যায় না।

চন্দ্রমৌলির ওপর রাগ তার কিছুতেই যায় না। এই মানুষটি ভালো হোক বা মন্দ হোক, তার মায়ের জীবনটা নষ্ট করেছে, রাকার জীবনেও শনিগ্রহের মতন এসেছে বারবার। কলেজ জীবনে যখন ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেড়াতে যেত রাকা, একদিন চন্দ্রমৌলির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। ইন্দ্রজিৎকে একেবারেই পছন্দ করেননি চন্দ্রমৌলি, তার সঙ্গে অপমানের সুরে কথা বলেছিলেন, তাকে রাকার পাশ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রজিৎ হাসতে হাসতে রাকাকে বলেছিলেন, তোমার ঐ কাকাটির চোখের চাউনি দেখলে মনে হয়, ওঁর সঙ্গে আমাকে একদিন ডুয়েল লড়তে হবে ! সুপ্রকাশের বেলাতেও সেই একই ব্যাপার। এই বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছিলেন চন্দ্রমৌলি, তার পরেও পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি ! চন্দ্রমৌলির জন্যই তো সুপ্রকাশ চলে গেল। সেই ঝড়জলের নিদারুণ রাত্রিতে রাকা ভেবেছিল, সুপ্রকাশের বদলে চন্দ্রমৌলি উপস্থিত থাকলে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত। সুপ্রকাশ ঠিক বুঝতে পেরেছিল রাকার মনের কথা, তাই নিজের বীরত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে সে এগিয়ে গেল গোঁয়ারের মতন।

এরপর বাকি জীবনটা কী নিয়ে কাটাবে রাকা ? কিছুই মনে আসে না। তার জীবনটা তুচ্ছ হয়ে গেল ! তার জন্মটাই অস্বাভাবিক ! মা তাকে নিজের স্বামীর সন্তান হিসেবে ভাবতে পারেননি, সেই গোপনীয়তার বোঝা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গেলেন ! দুটি ছেলেমেয়ের পর সোমনাথ আর কোনো সন্তান চাননি, অথচ রাকাকেই বেশি ভালোবাসতেন সোমনাথ। দেবিকা আর

তৃণীর বলতো, রাকা বাবার আদুরে মেয়ে। দিদি আর দাদার সঙ্গে চেহারারও মিল নেই রাকার। সে তা হলে এলো কোথা থেকে। দু'জন নারী পুরুষের চরম অতৃপ্ত ভালোবাসার ফসল সে, বাকি জীবন তাকে এই বোঝা বইতে হবে ? চন্দ্রমৌলি বলেছেন, তাঁর লিবিডো প্রবল, তা হলে সেবন্তীকে প্রত্যাখ্যান করলেন কেন তিনি ? দু'-একবার গোপনে মিলন হলে কী এমন অন্যায় হতো ? বিবাহিত নারী-পুরুষেরা এরকম গোপনে একটু আধটু প্রেম করে না ? প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে পারেননি সেবন্তী, বরং চন্দ্রমৌলি তাঁকে বুকে টেনে নিলে তিনি হয়তো সুস্থ থাকতে পারতেন। খানিকটা নির্লিপ্তভাবে রাকা সেবন্তীকে তার মা নয়, একজন নারী হিসেবে দেখতে চায়। শেষ দিনে যুবতীর মতন সাজগোজ করেছিলেন সেবন্তী, যেন চন্দ্রমৌলির সঙ্গে তাঁর মিলনের চিন্তা করেই আলিঙ্গন করেছিলেন মৃত্যুকে।

চন্দ্রমৌলি, চন্দ্রমৌলি, চন্দ্রমৌলি ! রাকার জীবনের সমস্ত ঘটনা জুড়ে রয়েছে এই একজন পুরুষ। একে সরিয়ে দিতে না পারলে রাকার নিষ্কৃতি নেই। চন্দ্রমৌলির বন্দুকটা নিয়ে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেললে কী হয়।

সেই চিন্তাতেই রাকার শরীরের রক্ত প্রবাহে তরঙ্গ ওঠে, প্রতিটি আঙুলের ডগায় সঞ্চারিত হয় প্রাণ। সাড়ে তিন বছর পর রাকার শরীরে ফিরে এলো যৌবন ধর্ম, সে বিছানায় উঠে বসলো।

বাইরে ঝিমঝিম করছে মধ্য রাত। ঘরে শুয়ে শুয়েই রাকা টের পেয়েছিল, সন্ধে থেকে চন্দ্রমৌলি কুলি-কামিনদের সঙ্গে হৈ হৈ করেছেন, রামের নেশায় গান গেয়েছেন জড়িত গলায়, কয়েকটি মেয়ে নেচেছিল। এখন চতুর্দিক নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে দু'-একটা রাত-চরা পাখির ডাক, এই সময় অরণ্যের পশুরা জাগে, মানুষ ঘুমোয়।

অন্ধকারের মধ্যে টর্চ না নিয়েই রাকা দেয়াল ছুঁয়েছুঁয়ে চলে এলো চন্দ্রমৌলির ঘরের সামনে। দরজায় খিল নেই। একটা পাল্লা ঠেলে রাকা দেখলো, খাটের ওপর এক পাশ ফিরে ঘুমিয়ে আছেন চন্দ্রমৌলি, একটু একটু নাক ডাকছে। সারা ঘরে পুরুষ-পুরুষ গন্ধ।

কাছে গিয়ে, চন্দ্রমৌলির বাহু স্পর্শ করে রাকা দু'বার ডাকলো, মৌলিকাকা ! মৌলিকাকা !

সতর্ক ঘুম চন্দ্রমৌলির, সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসে উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, কী রে, কী হয়েছে !

রাকা বললো, আমার ভয় করছে !

চন্দ্রমৌলি বললেন, ভয় কী ! এখানে তো কোনো ভয় নেই।

রাকা বললো, আমার ঘুম আসছে না কিছুতেই। মাথায় যত রাজ্যের উদ্ভট চিন্তা আসছে। আমি তোমার কাছে থাকবো।

চন্দ্রমৌলি বললেন, ঠিক আছে, এখানে বোস। আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বসলো না। বিছানায় চন্দ্রমৌলির পাশে শুয়ে পড়লো রাকা। চন্দ্রমৌলি তার মাথায় হাত রাখলেন, রাকা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বাচ্চা মেয়ের মতন আদুরে গলায় বললো, মৌলিকাকা, আমার খুব ইচ্ছে করছিল তোমাকে মেরে ফেলতে !

চন্দ্রমৌলি হেসে বললেন, সে কী ! কেন আমাকে মারবি কেন ? কালকে অত কিল মেরেও তোর রাগ যায়নি ?

রাকা বললো, না রাগ যায়নি ! তোমাকে একেবারে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে।

চন্দ্রমৌলি বললেন, কেন রে, এত রাগ কেন ? আমি কী দোষ করেছি ?

রাকা বললো, তুমি যে আমার শত্রু ! তুমি আমার মাকে মেরেছো, তুমি সুপ্রকাশকে মেরেছো। তুমি একটা অক্টোপাসের মতন আমাকে ঘিরে আছো।

চন্দ্রমৌলি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন, রাকার মাথায় তাঁর হাত থেমে গেল। তারপর কাতর গলায় বললেন, তুই যদি তাই মনে করিস, তা হলে আমাকে তোর যে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয় দে !

রাকা বললো, আমি আর কোথাও যাবো না। এখানেই থাকবো।

চন্দ্রমৌলি কোনো উত্তর দিলেন না।

রাকা হঠাৎ উঠে বসে পাগলাটে গলায় বললো, চন্দ্রমৌলি দত্ত, শুনতে পেয়েছো ? আমি আর কোথাও যাবো না। তুমি আর আমি, আমাদের মাঝখানে আর কেউ থাকবে না !

চন্দ্রমৌলি এক দৃষ্টিতে রাকার দিকে চেয়ে রইলেন।

রাকা দু'হাত বাড়িয়ে বললো, শুনতে পাচ্ছো না ? এখন থেকে আমি শুধু তোমার। তুমি আমাকে নাও !

চন্দ্রমৌলি একলাফে খাট থেকে নেমে পড়ে ধরা গলায় বললেন, তুই এসব কী বলছিস রে, রাকা !

রাকা স্পষ্ট গলায় বললো, এখনো ভয় পাচ্ছো ? এসো—

ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলো। তাতেই দেখা যায়, জ্বলজ্বল করছে রাকার

চোখ, আলুলায়িত চুল, খসে গেছে আঁচল, যেন রা॰, নয়, তার ওপর ভর করেছে সেবন্তী, ফিরে এসেছে সেই তৃষ্ণার্ত হৃদয়, তার এক জীবনের অপূর্ণতাকে সে রাকার মধ্যে দিয়ে পূর্ণ করতে চায়।

চন্দ্রমৌলি আর্ত গলায় বললেন, না, না, এমন কথা বলিস না, খুকী ! আর কক্ষনো বলবি না ! তুই যে আমার মেয়ে। তোর মাকে আমি স্পর্শ করিনি, তবু তুই আমার মেয়ে। তোর মায়ের কাছে অস্বীকার ক রেছি, তোর বাবা কিছু জানতে পারেনি, তবু বাচ্চা বয়েসে তোকে যখন প্রথম দেখি, আমার বুকটা ধক করে উঠেছিল, তোর মুখে আমার মুখের আদল ! সবাই বলবে, এমন হয় না। কিন্তু আমি জানি, আমার ইচ্ছে থেকেই তোর জন্ম ! আমার চোখে তুই এখনো সেই ছ'সাত বছরের প্রথম দেখা রাকা। পৃথিবীতে যেখানে যত বাচ্চা মেয়ে দেখি, অমনি মনে পড়ে, আমারও একটা মেয়ে আছে...রাকা, রাকা

এত বড় মানুষটাকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখেনি। চন্দ্রমৌলি শিশুর মতন কাঁদতে লাগলেন, সেখানে আর থাকতে পারলেন না, দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে, তারপর মিলিয়ে গেলেন অন্ধকার জঙ্গলে।

॥ ১০ ॥

প্রমিতা দেবী ঘরের ভেতর থেকে ফাইলটা নিয়ে এসে, পাতলা হাসি মাখানো গলায় বললেন, হ্যাঁ, পড়লাম তো, কয়েকটা জায়গা দু'তিনবারও পড়েছি, কিন্তু আমার পক্ষে মতামত দেওয়া শক্ত।

আমি বললাম, মতামত নাই বা দিলেন, কিন্তু আপনার আপত্তি করার মতন কিছু নেই তো !

প্রমিতা একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, আপত্তি... না, সে রকম কিছু মনে হয়নি। এ কী, আপনি মিষ্টি খেলেন না ?

আমি বললাম, চা খেয়েছি। মিষ্টি আমি ভালোবাসি না।

ছিমছাম একখানা ঘরের বাংলো। সামনে ছোট বারান্দা, চেয়ার নেই, কয়েকখানা মোড়া ও একটা নিচু টেবিল। একটা প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি ও একটা চায়ের কাপ। অ্যাশট্রে নেই, সিগারেট ধরানো যায় কি না তা নিয়ে আমি ইতস্তত করছিলাম।

প্রমিতা বললেন, আপনি রাকাকে বড় বেশি সুন্দরী করেছেন। অত সুন্দর সে মোটেই না। বাচ্চা বয়েসে খানিকটা ফুটফুটে ছিল ঠিকই।

আমি বললাম, আমি তো এখনো তাকে খুবই সুন্দর মনে করি।

প্রমিতা হেসে বললেন, সুনীলবাবু, আমি আপনার কয়েকখানা বই পড়েছি। প্রায় সব গল্পেই দেখি, আপনার নায়িকারা খুব সুন্দর হয়। অন্য মেয়েদের নিয়ে বুঝি আপনি কিছু লিখতে পারেন না ?

আমি বললাম, আমার তো ধারণা আমি সব রকম মেয়েদের নিয়েই লিখি, তবে এমন হতে পারে, আমি কোনো মেয়েকেই অসুন্দর দেখি না।

—শুধু সুন্দর নয়, আপনার নায়িকারা সবাই খুব সরল আর সৎ, আপনি বুঝি ইভ্‌ল দেখেননি কখনো ?

—মানুষের মধ্যে ইভ্‌ল আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চোখে পড়ে না। এটা আমার অক্ষমতা। আমি খুব খারাপ পুরুষ চরিত্রও তো তৈরি করতে পারি না!

—লেখকদের তো উচিত জীবনের সব দিকগুলোই দেখা।

—বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ভালো কিংবা মন্দ হয়। আমি সব দিকগুলো দেখাই না।

—ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর চরিত্রটা আপনি পেলেন কোথায় ? ও রকম কেউ তো ছিল না ঠিক!

—কিছু কিছু তো বানাতেই হয়েছে।

—প্রথম চুম্বনের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে অতখানি লেখা

—ওটা আমার একটা দুর্বলতা। কোনো উপন্যাস লিখতে গিয়ে আমি যখন নায়িকার চরিত্র তৈরি করি, চরিত্রটা যখন রক্ত-মাংসে অনেকটা জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন আমিও তার প্রেমে পড়ে যাই। কাহিনীর নায়ক যখন নায়িকাকে আদর করে তখন আমিও নায়কের শরীরের মধ্যে দু'একবার ঢুকে পড়ি, আমিও তাকে আদর করি!

—খুব মজার ব্যাপার তো! সব লেখকদেরই ওরকম হয় ?

—তা জানি না। আমার হয়।

—ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীকে আপনি পুরোপুরি বানিয়েছেন ? নাকি এরকম পুরুষ হয় ?

—এরকম হয়, আমি দেখেছি। ইন্দ্রজিতের ব্যক্তিত্ব খুব প্রবল, চন্দ্রমৌলি আর ইন্দ্রজিৎ এই দু'জনকে এক সঙ্গে সামলানো যেত না। এক অরণ্যে যেমন বাঘ আর সিংহ থাকে না। সেই জন্যই এই কাহিনীতে ইন্দ্রজিতের ভূমিকাটা

ছোট। তবে ইন্দ্রজিতের মতন ঠিক না হলেও রাকার প্রথম জীবনে একজন প্রেমিক ছিল ঠিকই, তাই না ?

—প্রেমিক ? কী জানি !

—রাকা যখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছয়, তখন অনেকে মিলে তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার যে উপদ্রব শুরু হয়েছিল, অনেক গুরুজন, শ্রদ্ধেয়রাও লোভের দাঁত বার করেছিল, সে সব সম্পর্কে আমি বেশি কিছু লিখিনি ইচ্ছে করেই। আমার কাহিনীটা এক মুখী !

—রাকার মতন মেয়ে তো আরও কত আছে। হঠাৎ ওকে নিয়েই আপনার লিখতে ইচ্ছে হলো কেন ?

—কেন যে কোন্ বিষয়টা নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হয় তা বলা শক্ত।. হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন এক একটা চিন্তা মাথায় আসে। রাকাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এর জীবন নিয়ে কিছু লিখতে হবে।

প্রমিতার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো কৌতুকের হাসি। তিনি বললেন, প্রথমবার দেখেই। অতীশের সঙ্গে যখন আপনি এলেন, রাকা তো আপনার সঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলেনি !

আমি বললাম, সব সময় কথার দরকার হয় না। এক ঝলক দৃষ্টিই যথেষ্ট।

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করে হাতে ধরে আছি দেখে প্রমিতা বললেন, আপনি সিগারেট খেতে পারেন, চায়ের কাপটাতেই ছাই ফেলুন !

আমার থেকে অল্প দূরত্বে একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন প্রমিতা। লালচে ধরনের পাড় একটা টাঙাইল শাড়ি পরা,-পায়ের পাতা দুটো বেরিয়ে আছে, পায়ের নোখে উনি রং লাগান না। কিন্তু রক্তিম আভা দেখে বোঝা যায়, ওঁর স্বাস্থ্য ভালো। সারা শরীরেই প্রসাধনের কোনো চিহ্ন নেই, তবু যে-কোনো সম্মিলনে এই মহিলার দিকে চোখ পড়বে। বয়েস পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু মুখখানি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত।

বছর চারেক আগে আমি ট্রেনে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছিলাম, বর্ধমান স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে এক প্রবল সোরগোলের মধ্যে দেখেছিলাম একটি অদ্ভুত দৃশ্য। একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন ব্যক্তিকে ঘিরে ধরেছে অনেকে, বিশেষত স্টেশানের কুলি ও ভিখিরিরা, তারা সেই ব্যক্তিটিকে ঘুঁষি ও লাথি মারছে আর লোকটি চিৎকার করছে তারস্বরে। শোনা গেল, লোকটি নাকি একটি বাচ্চা মেয়েকে চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে অথচ তাকে দেখে ছেলে-মেয়ে ধরা বলে

মনেই হয় না, মুখে আভিজাত্যের অহংকারের ছাপ আছে। কিন্তু চেহারা দেখে তো বোঝা যায় না। আমি বাধা দিতে যাইনি। লোকটিকে সবাই মিলে মারছিল, রক্ত ঝরছিল তার গা দিয়ে, রেল পুলিশ এসে না পড়লে আরও সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারতো।

সেই মানুষটিই চন্দ্রমৌলি দত্ত।

আসল ঘটনাটা ছিল এই যে একটি ভিখিরি পরিবারের একটি ছ'সাত বছরের বাচ্চা মেয়েকে তার বাবা নির্দয়ভাবে মারছিল, চন্দ্রমৌলি তা দেখতে পেয়ে মেজাজ সামলাতে পারেনি, বাবাটিকে থাপ্পড় কষিয়ে বলেছিলেন, তোরা শুধু জন্ম দিতে পারিস, ভালোবাসতে পারিস না, দে, মেয়েটাকে আমি মানুষ করবো! চন্দ্রমৌলি মেয়েটার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই রটে গেল যে উনি একটি মেয়ে-ধরা!

বর্ধমান স্টেশানের সেই ঘটনা ভুলে যেতে পারতাম। কিন্তু চন্দ্রমৌলির সেই ঘটনা কাগজে উঠেছিল, তাঁকে আদালত থেকে জামিন নিতে হয়েছিল। কাগজের খবরটি দেখে আমার বন্ধু অতীশ খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অতীশ শান্তিনিকেতনে ইংরেজি পড়ায়। কালোদার দোকানে বসে চা খেতে খেতে অতীশ বললো, এই চন্দ্রমৌলি দত্তকে আমি চিনি, অসাধারণ মানুষ। এম এ পড়ার সময় রাকা নামে একটি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী ছিল আমাদের সহপাঠিনী, সেই রাকা আর চন্দ্রমৌলি দত্ত দু'জনে মিলে দারুণ একটা কাজ করছে।

অতীশের কাছেই আমি প্রথম রাকা ও চন্দ্রমৌলির কাহিনী কিছুটা শুনি। তারপর একদিন ওর সঙ্গে বেহালার দিকে সখের বাজারে 'মহিলা মুক্তি কেন্দ্র' দেখতে গেলাম। রাকা এই কেন্দ্রটির পরিচালিকা আর চন্দ্রমৌলি সত্যিই একজন মেয়ে-ধরা, বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি বাচ্চা মেয়েদের ধরে ধরে আনেন, অবশ্য সব গায়ের জোরে নয়। অনাথা-দুঃখী মেয়েদের নিয়ে আশ্রম-টাশ্রম অনেক আছে, রাকাদের কেন্দ্রটি ঠিক সে রকম নয়। এখানকার মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয় না। হাতের কাজ কিংবা পুতুল বানাতেও শেখানো হয় না। সারাদিনে মাত্র এক ঘন্টা পড়াশুনো করে আর বাকি সময় সবাই খেলাধুলো করে। এরা ক্রিকেট-ফুটবল খেলে, হাই জাম্প-লং জাম্প দেয়, যুযুৎসু ও তীর ধনুক চালাতে শেখে। পরপর দু'বছর অল বেঙ্গল মেয়েদের স্পোর্টসে এখানকার মেয়েরা অনেকগুলো প্রাইজ নিয়ে এসেছে। এ রকম সব স্বাস্থ্যবতী মেয়ে আমি আর কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখিনি। তারা এক রকমের ইউনিফর্মও পরে না। এখানকার মেয়েদের দেখে

বোঝাই যায় না, তারা দুঃস্থ অসহায় পরিবার থেকে এসেছে। তাদের স্বাস্থ্যই তাদের সম্মান ও স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করছে।

অতীশ যখন রাকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়, সে আমাকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। গম্ভীর হয়ে ছিল। দ্বিতীয়বার আমি একা গেলাম, সে মাত্র দু'একটা কথা বলে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু এত সহজে আমার ধৈর্যচ্যুতি হয় না। চতুর্থবার আসবার পর রাকা খানিকটা কঠোরভাবে বললো, আপনি ব্যস্ত মানুষ, আপনি শুধু শুধু আমাদের এখানে এসে সময় নষ্ট করেন কেন ?

আমি বলেছিলাম, তার কারণ একটাই। আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি ! আপনি পুরুষ-বর্জিত মহিলা মুক্তি কেন্দ্র খুলেছেন, তা বলে পুরুষরা যে আপনাদের ভালোবাসবে না, তার কি কোনো মানে আছে ? পুরুষদেরও প্রেমে পড়ার অধিকার আছে।

সেই প্রথম রাকা আমার সামনে হেসেছিল।

তারপর বলেছিল, এখানে মাত্র একজনই পুরুষ আছেন। তাঁর নাম চন্দ্রমৌলি দত্ত। তিনি আপনার এ কথা শুনলে আপনার মাথায় ডাণ্ডা মারবেন।

আমি বলেছিলাম, উনি মারলেও আমার লাগবে না একটুও। কারণ আমি তো অলীক। লেখকের শরীর থাকে না। চন্দ্রমৌলি কি মধ্যপ্রদেশের সব পাট চুকিয়ে দিয়ে এসেছেন ?

রাকা বলেছিল, আমরা দু'জনে অবিচ্ছেদ্য। ওঁর পক্ষে দূরে থাকা সম্ভব নয়।

সেই থেকে কাহিনীর শুরু। নাম-ধাম অনেকটা বদলে আমি প্রমিতাকে পড়তে দিয়েছিলাম পাণ্ডুলিপি। ওঁর কোনো আপত্তি থাকলে ছাপা সম্ভব নয়। বেশ কয়েদিন আলাপ-আলোচনার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, প্রমিতার মনটা এখনো আধুনিক আছে, সত্যকে স্বীকার করতে কোনো সঙ্কোচ নেই। চন্দ্রমৌলি রাকার পিতা ও প্রেমিক দুই-ই, অথচ ওদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো কালিমা লাগেনি।

আট থেকে এগারো বছরের সাত আটটি মেয়ে একটু দূরে দূরে ধনুকে তীর জুড়ে লক্ষ্যভেদের খেলা খেলছে। খেলনার তীর-ধনুক নয়, বেশ বড়। চিত্রাঙ্গদার হাতে যেমন মানাতো। একটা তীব আচমকা এসে পড়লো ওই বারান্দায়। ছুটে এলো বছর দশেকের একটি বালিকা, কুচি দেওয়া লাল রঙের

ফ্রক পরা, ঝকঝক করছে চোখ-মুখ, হরিণীর মতন গতি। এই কি বর্ধমান স্টেশানের সেই ভিখিরি পরিবারের মেয়েটি ?

তীরটা কুড়িয়ে নিয়ে প্রমিতা জিজ্ঞেস করলেন, কার টিপ ভুল হয়েছে রে, মণি ? এত দূরে চলে এলো ?

মণি লজ্জায় শরীর কুঁকড়ে বললো, আমার। হঠাৎ হাত ফস্কে গেল !

প্রমিতা মৃদু বকুনি দিয়ে বললেন, এতটা ভুল হবে কেন ? যদি আমাদের গায়ে লাগতো ? অর্জুনের গল্প বলেছিলাম মনে নেই ? অর্জুন যা পারতো, মেয়ে হয়েও তুই তা পারলি না কেন ?

আদর করে মণির পিঠে চাপড়া মেরে প্রমিতা বললেন, যা, খেলতে যা !

মণির ছুটে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রমিতা আমাকে বললেন, এই মেয়েটি কী অবস্থায় এসেছিল, আপনি ভাবতে পারবেন না। আপনি রাকার মতন একটি মেয়েকে নিয়ে এতটা লিখলেন, আসলে এই মেয়েগুলোকে নিয়ে লেখা উচিত ছিল। এখানে যে কটি মেয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়েই অনেক কিছু লেখা যায়।

আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই লেখা যায়। কিন্তু সেটা অন্য গল্প। হয়তো পরে লিখবো। দুটো দু'রকম বিষয়। এবারে আমি লিখেছি সেবন্তী-চন্দ্রমৌলি-রাকা-সুপ্রকাশের ভালোবাসার গল্প। এবং আমার।

খানিকটা বাদে বিদায় নেবার জন্য আমি পাণ্ডুলিপির ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। প্রমিতা আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে বললেন, আমাদের নিয়ে লেখা হয়ে গেল, এরপর তো আপনি আর এখানে আসবেন না, তাই না ? একটা সাবজেক্ট শেষ হয়ে গেল !

আমি বললাম, ডাক পাঠালেই আসবো। সাবজেক্ট তো ফুরোয়নি। এই যে ছোট ছোট মেয়েরা রয়েছে। আপনি তো বললেন...

দুটি মেয়ে ছুটে এসে প্রমিতার হাত ধরে ঝুলোঝুলি করতে লাগলো। কী একটা ব্যাপারে ওরা প্রমিতাকে ডাকতে এসেছে, এক্ষুনি যেতে হবে।

প্রমিতা বললেন, তা হলে আর যাচ্ছি না—

আমি এগিয়ে গেলাম গেটের দিকে। সমস্ত জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গেটের সামনেই দু'পাশে বাগান। একটা শাবল নিয়ে বাগান-সেবা করছেন চন্দ্রমৌলি। ওঁর সঙ্গে আমার সরাসরি কোনো কথা হয়নি কখনো।

বর্ধমান স্টেশানে সেই মার খাওয়ার পর থেকেই চন্দ্রমৌলির শরীরটা ভেঙে গেছে। একজন কেউ লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পায়ে মেরেছিল, সেটা আর সারেনি,

পা-টা টেনে টেনে চলেন, মেরুদণ্ডও নুয়ে গেছে খানিকটা। তবু তাঁর বিশালত্ব অনুভব করা যায়। যেন এক অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কাঠামো।

ওঁর চোখের দিকে চোখ ফেলে আমি বললাম, নমস্কার। আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারি ?

চন্দ্রমৌলি আমার দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো অবিশ্বাস ও অপছন্দের ভাব। প্রমিতার কাছে আমাকে যাওয়া-আসা করতে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, আমি এখানকার দারোয়ান, আমার সঙ্গে তো কথা বলার কিছু নেই।

তারপর তিনি আবার ফুল গাছের মাটি কোপানোতো মন দিলেন।
